# বিভাগোত্তর বাংলা কথা-সাহিত্যে প্রতিফলিত সামাজিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতা

**তত্ত্বাবধায়ক**
ডক্টর এস.এম. লুৎফর রহমান
অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

448925
Dhaka University Library
448925

**গবেষক**
নজরুল ইসলাম
এম.ফিল. গবেষক, বাংলা বিভাগ
রোল নং-১৩৭, শিক্ষাবর্ষ-২০০৩-২০০৪
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-২০০৯

Dhaka University Institutional Repository

# বিভাগোত্তর বাংলা কথা-সাহিত্যে প্রতিফলিত সামাজিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতা

৪৪৪৭৭৫

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

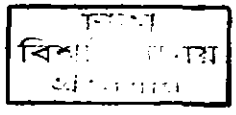

*Dhaka University Institutional Repository*

# প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, নজরুল ইসলাম, এম.ফিল গবেষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এম.ফিল ডিগ্রী লাভের নিমিত্তে 'বিভাগোত্তর বাংলা কথা-সাহিত্যে প্রতিফলিত সামাজিক অর্থনৈতিক বাস্তবতা' -শীর্ষক অভিসন্দর্ভটির কাজ আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছে। আমার জানা মতে, গবেষকের উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ কিংবা অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী/ডিপ্লোমা লাভের জন্য কিংবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। সুতরাং এম.ফিল ডিগ্রী প্রদানের নিমিত্তে অভিসন্দর্ভটি পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য জমা নেয়ার সুপারিশ করছি।

১৯.৭.০৭

(ডক্টর এস.এম. লুৎফর রহমান)
অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

*Dhaka University Institutional Repository*

# অঙ্গীকারনামা

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম.ফিল ডিগ্রী অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপিত 'বিভাগোত্তর বাংলা কথা-সাহিত্যে প্রতিফলিত সামাজিক অর্থনৈতিক বাস্তবতা'-শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক ডক্টর এস.এম. লুৎফর রহমান, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছি এটা আমার মৌলিক গবেষণা কর্ম। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটির সম্পূর্ণ কিংবা অংশ বিশেষ উপস্থাপন করিনি।

নজরুল ইসলাম
এম.ফিল গবেষক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

# কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পরম করুণাময় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অশেষ মেহেরবানীতে 'বিভাগোত্তর বাংলা কথা-সাহিত্যে প্রতিফলিত সামাজিক অর্থনৈতিক বাস্তবতা'-শীর্ষক এম.ফিল অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করলাম। যথা সময়ে বিধি মোতাবেক অভিসন্দর্ভটি লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপন করতে পেরে আমি আল্লাহ্ রাব্বুল আল-আমিন এর নামে শুকরিয়া আদায় করছি।

গবেষণা কর্মে আমার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর এস.এম. লুৎফর রহমান। আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অত্যন্ত কর্মব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি আমার এই গবেষণা কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহ ও উদ্দীপনা যুগিয়েছেন। তাঁর নিরন্তর উৎসাহ, অণুপ্রেরণা ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের ফলেই আমার গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। আমার গবেষণাপত্র প্রস্তুতের কাজ দেখা ও সময়োচিত উপদেশ প্রদানের জন্য তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাই এবং গভীর শ্রদ্ধা জানাই বিভাগীয় শিক্ষকদের প্রতি। সেই সাথে আমি তাঁদের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

আমার গবেষণার কাজে আমাকে অনেকেই নানাভাবে সহযোগিতা ও উৎসাহিত করেছেন এবং অনেকের দ্বারাই আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি। তাঁদের মধ্যে ডক্টর আলাউদ্দিন আল আজাদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর রফিকউল্লাহ খান অন্যতম। এ ছাড়া গবেষণা কাজের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যিনি আমাকে সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন তিনি হলেন নজরুল ইনস্টিটিউটের সাবেক নির্বাহী পরিচালক কবি আবদুল হাই শিকদার। সেই সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাই পরম শ্রদ্ধেয় বড় ভাই বিপাশ আনোয়ার, বিশিষ্ট কথা-সাহিত্যিক ও সাংবাদিক জনাব ইউসুফ শরীফ ও 'দৈনিক ডেসটিনি'র সহযোগী সম্পাদক ডক্টর অনু হোসেনকে।

আমি গভীর চিত্তে কৃতজ্ঞতা জানাই আমার মা-রাবেয়া বেগম, শাশুড়ী-ফিরোজা বেগম, সহধর্মিনী-ওয়াহিদা পারভীন–যারা বিভিন্নভাবে আমার গবেষণা কর্মের সাহায্য সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করেছেন।

সর্বপরি যিনি আমার এ গবেষণা পাণ্ডুলিপি টাইপ-কম্পোজ করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন হাসিবুল হোসেন পলাশ। আমি তাকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবান জানাই।

নজরুল ইসলাম
এম.ফিল গবেষক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository



# ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারায় আধুনিক যুগে কথা-সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ। উনিশ শতকের মধ্যভাগে বাংলা কথা-সাহিত্যের উদ্ভব হলেও বিশ শতকে তা ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি লাভ করে। কিন্তু গোটা বাংলা সাহিত্যে কথা-সাহিত্যের বিকাশের ধারা অভিন্ন রূপে অব্যাহত থাকেনি। ১৯৪৭ সালে বিভাগোত্তর বাংলাদেশের কথা-সাহিত্যে বিকল্প ধারার সৃষ্টি হয়। তার ফলে কথা সাহিত্য যে গতি প্রকৃতি লাভ করে তা এখনও চলমান রয়েছে। এ সময়ে বাংলাদেশের বিশিষ্ট কথা-সাহিত্য যে গতি-প্রকৃতি লাভ করে তা এখনো চলমান রয়েছে। এ সময়ে বাংলাদেশের বিশিষ্ট কথা-সাহিত্যিকগণ বাংলা কথা-সাহিত্যকে নতুন চেতনায় সমৃদ্ধ করেন। এই সমৃদ্ধির স্পর্শ বিশেষভাবে বিশিষ্ট কথা-সাহিত্যিকগণ বাংলা কথা-সাহিত্যকে নতুন চেতনায় সমৃদ্ধ করেন। এই সমৃদ্ধির স্পর্শ বিশেষভাবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, আলাউদ্দীন আল আজাদ, শওকত ওসমান, শাহেদ আলী, আবু ইসহাক প্রমুখের রচিত গল্প-উপন্যাসে লক্ষণীয়। তাঁর তখনকার পটভূমিতে বাংলা কথা-সাহিত্যকে সমকালীন সামাজিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে রচনা করেন। তাদের রচনায় বিভাগোত্তর পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আজও কোন গবেষণা কার্য্য পরিচালিত হয়নি। অথচ তা হওয়া একান্ত আবশ্যক ছিলো। কারণ সে সময়ের কথা-সাহিত্য কতটা জীবন ঘনিষ্ঠ ছিল, তা জানার জন্য এ রকম গবেষণার বিকল্প নেই। এ অভাব পূরণের উদ্দেশ্যেই আলোচ্য গবেষণার অবতারণা।

সমাজ-জীবন ও বৃহত্তর অর্থে রাষ্ট্রকে নিয়েই উপন্যাস ও ছোট গল্পের অর্থাৎ কথা-সাহিত্যের কারবার। জীবনের রূপ তাতে অন্তঃসলিল রূপে প্রবাহিত। প্রকৃতপক্ষে নিছক রসসৃষ্টি কথা-সাহিত্যের প্রধান বিবেচ্য বিষয় নয়। কেননা, কথাশিল্পের যে মূল বিষয় সমাজ-জীবন ও বৃহত্তর অর্থে রাষ্ট্র ও মানুষ সেই বিষয়টি অত্যন্ত বাস্তবতার বিষয়টি বাস্তব বলেই জীবনদীপক সাহিত্যে তার আশ্রয় অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। তবে বাস্তবতার পরিচর্যাকে সাহিত্যের সার্বভৌম বিষয় মনে করাও সঙ্গত নয়। অবশ্য বিষয়টি যে কথা শিল্পের একটি অপরিহার্য বাহন তা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। শিল্প কলার সঙ্গে বাস্তবতার সংযোগে প্রায়াস সাহিত্য কতখানি ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয় তার সন্ধান করতে গিয়ে সমালোচকগণ সাহিত্য বিচারে বিভিন্ন তত্ত্ব, মতবাদ বা ইজমের ব্যবহার স্বীকার করেন। সে জন্যে সমালোচকগণ মনে করেন, সাহিত্যে তথ্যগত সত্যের সঙ্গে যখন তত্ত্ব গত বিষয়ের বন্ধন অনিবার্য হয়, তখন উভয়ের মধ্যে যাতে সৌহার্দের সম্ভ্রমটুকু বিরাজ করে, সেদিকে সাহিত্যিকের দৃষ্টি থাকা বাঞ্ছনীয়।

বিভাগোত্তর কালে বাংলাদেশের উপন্যাস ও গল্প সাহিত্যে বাস্তবতার যে অভিক্ষেপ লক্ষ্য করা যায় তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, আলাউদ্দিন আল আজাদ ও শওকত ওসমান-তিনজনেরই রচনায় মুখ্যত সমাজই প্রধান ভূমিকা পালন করে। সমাজ বাস্তবতা তার নেপথ্যে

Dhaka University Institutional Repository


লেখককে জীবনবাদের তথ্য প্রদানে সহায়তা করে। এই সূত্রে মন্বন্তর, দুর্ভিক্ষ, ক্ষুধা আর বঞ্চনার দিকগুলো কথা-সাহিত্যের কাহিনীতে শিল্পসমৃদ্ধ সচেতনতায় বিশ্লেষিত হয়েছে। চরিত্র বিশেষের উপর মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণও লক্ষ্য করা যায়। তবে তাতে মানুষের অন্তর্জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটনে তেমন সাফল্য নেই। তাদের অধিকাংশ রচনায় পল্লীজীবনের সুখদুঃখের চিত্রায়ণে বাস্তবতার স্পর্শ বেশ নিবিড়। সমকালীন মানুষ তার মধ্যে খুঁজে পেয়েছে নিজেদের সমাজ ও জীবনের প্রতিচ্ছবি। তাঁরা নিজস্ব শিল্পকৌশলে নিজ নিজ গল্প-উপন্যাসের বিষয়বস্তু গড়ে নিয়েছেন, সেই সূত্রে সমাজ ও জীবনের রূপায়ণে পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য ও বিভিন্নতাও সৃষ্টি করেছেন।

বাংলা কথা-সাহিত্যের বিচারের বিষয়গুলোকে মনে রেখে এ আলোচনায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র তিনটি উপন্যাস 'লালসালু' 'চাঁদের অমাবস্যা' ও 'কাদো নদী কাদো', দুইটি গল্পগ্রন্থ 'নয়ন চারা' এবং 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প, আলাউদ্দিন আল আজাদের তিনটি উপন্যাস 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র', 'কর্ণফুলী' ও 'ক্ষুধা ও আশা'-তিনটি ছোটগল্প গ্রন্থ 'জেগে আছি', 'ধানকন্যা' ও 'উজান তরঙ্গে'; শওকত ওসমানের তিনটি উপন্যাস 'জননী', 'বনী আদম' ও 'ক্রীতদাসের হাসি' তিনটি গল্পগ্রন্থ 'জুনু আপাও অন্যান্য গল্প' 'সাবেক কাহিনী' ও 'প্রস্তরফলক' – এ গল্পগুলোর চরিত্রসমূহ ও কাহিনীতে নিহিত সামাজিক অর্থনৈতিক বাস্তবতা কোথায় কতটুকু কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে। মোট পাঁচটি অধ্যায়ে আমাদের আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম 'সমকালীন কথা-সাহিত্য বিচারের প্রচলিত ও ব্যতিক্রম ধারা'। এ অধ্যায়ে কথা-সাহিত্য বিচারের বিভিন্ন পণ্ডিত, গবেষকদের অভিমতের সঙ্গে নিজের অভিমতের একটি তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে কথা-সাহিত্য প্রচলিত ধারা ও ব্যতিক্রম ধারা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'বিভাগোত্তর বাংলা কথা-সাহিত্যের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি'- সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে তিনজন কথা-সাহিত্যিকের গল্প উপন্যাস সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম 'বিভাগোত্তর বাংলা কথা-সাহিত্যে তিনজন কথা-সাহিত্যিকের রচনায় নিহিত চরিত্র ও ঘটনাবলীর বাস্তবতা-অবাস্তবতা নির্ণয়' সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম বিভাগোত্তর বাংলা কথা-সাহিত্যে তিনজন লেখকের রচনায় সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার বাস্তব প্রতিফলন পরীক্ষা' করা হয়েছে। উপসংহারে তিনজন কথা-সাহিত্যিকের রচনার সার্বিক মূল্যায়ন সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository



# সূচী


প্রথম অধ্যায় ঃ সমকালীন কথা-সাহিত্য বিচারের প্রচলিত ও ব্যতিক্রমী ধারা ৯

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ বিভাগোত্তর বাংলা কথা-সাহিত্যের পটভূমি ঃ ১৫

ক. রাজনৈতিক পটভূমি
খ. অর্থনৈতিক পটভূমি
গ. সামাজিক পটভূমি
ঘ. সাংস্কৃতিক পটভূমি

তৃতীয় অধ্যায় ঃ বিভাগোত্তর বাংলা কথা-সাহিত্যে তিনজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও তাদের রচিত গল্প-উপন্যাস ঃ ৩৭

১. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্
২. আলাউদ্দিন আল আজাদ
৩. শওকত ওসমান

চতুর্থ অধ্যায় ঃ তিনজন কথা-সাহিত্যিকের রচনায় নিহিত চরিত্র ও ঘটনাবলীর বাস্তবতা-অবাস্তবতা নির্ণয় ৫৬

পঞ্চম অধ্যায় ঃ বিভাগোত্তর বাংলা কথা-সাহিত্যে তিনজন লেখকের রচনায় সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার বাস্তব প্রতিফলন ১২৩

উপসংহার ঃ ১৭০

আলোচিত গ্রন্থঃ ১৭৪

সহায়ক গ্রন্থ ঃ ১৭৫

Dhaka University Institutional Repository



# প্রথম অধ্যায়

## সমকালীন কথা-সাহিত্য বিচারের প্রচলিত ও ব্যতিক্রমী ধারা

Dhaka University Institutional Repository



সাহিত্যের আধুনিক সংজ্ঞার উল্লেখ করতে গিয়ে গুরুদাস ভট্টাচার্য লিখেছেন-''বহিঃপ্রকৃতি এবং মানব-চরিত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষণ যে আকার ধারণ করিতেছে, যে সংগীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, ভাষা রচিত সেই চিত্র এবং সেই গান-ই সাহিত্য অর্থাৎ বহির্জগৎ ও মানুষের অন্ত র্জগতের যে সব ঘটনা, ভাবনা, সমস্যা প্রবণতা মানব জীবনের সহিত ওতঃপ্রোত তা সব-ই সাহিত্যের বিষয় ও সাহিত্যের উপকরণ। আর এ সবের শিল্প সম্মত রসময় ভাষা প্রকাশই সাহিত্য।''[১]

শ্রীশ চন্দ্র দাস সাহিত্যের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন ''বিশ্ব-প্রকৃতি, মানব ও জীব-জগৎ সকলেই সাহিত্যের সামগ্রী যখন সাহিত্যিকের কল্পনা রঞ্জিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করে-ভাবে নয়, ভাবময় রূপে তখনই উহা সাহিত্য।''

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-''অন্তরের জিনিসকে বাহিরের, ভাবের জিনিসকে ভাষার, নিজের জিনিসকে বিশ্বমানের ও ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।''সাহিত্য জগৎ ও জীবনকে সুন্দর করে এবং কোন কোন সময় সত্যকে আমাদের গোচর বা প্রত্যক্ষ করে আনন্দ দান করে।

প্রকাশরূপে সাহিত্য দু'রকম। গাঁথা-সাহিত্য ও গদ্য-সাহিত্য। কবিতাকারে রচিত সাহিত্য গাঁথা-সাহিত্য ও গদ্যে রচিত সাহিত্য গদ্য-সাহিত্য। সাহিত্যের এই উভয় রূপের মধ্যে গাঁথা রূপ-ই-আদিমতম, এ দু'জনের সাহিত্যকে আবার লিখিত ও অলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়। অলিখিত সাহিত্য অশিক্ষিত জনসাধারণের মুখে মুখে রচিত। এই সাহিত্য মুখে মুখেই প্রচলিত থাকে। লিখিত সাহিত্য শিক্ষিত মানুষের দ্বারা কলমে রচিত ও বর্তমান কালে তা মুদ্রিত হয়ে প্রচার লাভ করে। আদিম মানুষের সাহিত্য অলিখিত রূপে রচিত হয়েছিল। লিখিত ও অলিখিত সাহিত্যের মধ্যে লিখিত বিভাগের গদ্যরূপে রচিত সাহিত্য এখানে বিশেষভাবে আলোচ্য। গদ্য-সাহিত্য প্রধানতঃ তিনটি শাখায় বিভক্ত প্রবন্ধ সাহিত্য, নাট্য-সাহিত্য ও কথা-সাহিত্য। এই তিনটি শাখার মধ্যে কথা-সাহিত্য শাখার আবির্ভাব আধুনিককালে। কথা-সাহিত্য আবার উপন্যাস, ছোটগল্প ও রস রচনা রূপে শ্রেণী বিভাজ্য। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে উপন্যাস ও ছোটগল্প সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

কথা-সাহিত্য রচনায় লেখকের অভিজ্ঞতা আহরণের সংগ্রাম কিভাবে চলে সে সম্পর্কে শেষ কথা বলা সম্ভব নয়, তা নিঃসন্দেহে বহুচিত্রিত ও জটিল ; তবে এ কথা সত্য যে, পৃথিবীর সকল রচনা কোনো না কোনভাবে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মূলে নিহিত। এ প্রসঙ্গে ডক্টর আলাউদ্দিন আল আজাদ বলেছেন-''কেবল একান্ত কল্পনায় ও তথ্য সংগ্রহে সামূহিক অভিজ্ঞতা

Dhaka University Institutional Repository


শৈল্পিক অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত হতে পারে না। লেখকের ব্যক্তিগত জীবনাচারণের সঙ্গে সংলগ্ন হয়েই আহরিত অভিজ্ঞতার পরিপক্কতা সম্ভব। কাজেই আজকের লেখক জাতীয় ঘটনাধারায় নিস্পৃহ দর্শক হয়ে থাকতে পারে না। নিজের সৃষ্টির জন্যই তাকে উৎসমূলে যেতে হবে। তাতে অবগাহন করতে হবে ; হতে হবে জাতির আত্মার সঙ্গে একাত্ম। তার ব্যক্তি সত্তা জাতিসত্তা নিমজ্জিত হয়েই হবে নৈর্ব্যক্তিক। সে জন্য তার কাজ এক দুরূহ সাধনা। মানব জীবন, সমাজ ও শিল্পগত সর্বাত্মক এক তাত্ত্বিক প্রস্তুতি অনেকের পক্ষে সহজাত, আর অনেকের পক্ষে অর্জনের জিনিস। লেখক যদি মানব সমাজ ও জীবনের চরম গন্তব্য সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে পারেন এবং সে পরণতিতে থাকে তার বিশ্বাস, তাহলে এক সময়ে কোন আন্দোলনের অনুপস্থিতি কিংবা ব্যর্থতা তার সৃষ্টিধারাকে ব্যহত করতে পারে না।"[২]

সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে মূলনীতি, তা হবে লেখকের সর্বাধিক স্বাধীনতা, যদিও জাতি বিরোধী ও গণবিরোধী ন্যুনতম প্রয়াসও চলতে দেওয়া হবে না। কবি কবিতা লিখুন, হোক তা অন্তর্মুখী স্বগতোক্তি, এমন কি ভাষার জটিলতম আবহ, তবু তা গ্রহণীয়, যদি কোন না কোনভাবে তা আমাদের চেতনাকে প্রসারিত করে, আত্মাকে করে উজ্জীবিত, কিংবা বিষণ্ন ঔপন্যাসিক ও নাট্যকারকে কেবল অগ্রগামী সংগ্রামের চিত্রই আঁকতে হবে এমন কোন কথা নেই। যদিও সেই দুর্লভ শিল্প খণ্ড যিনি আমাদের তিনি হবেন আমাদের গৌরবের পাত্র। এই নতুন দশকের যিনি লেখক তিনি আত্মতৃপ্ত শোভন এক রূপকার মাত্র হবেন তা আমরা চাই না। আমরা চাই তিনি দুর্জয়ের সাধনা করুন। তিনি হোন অসন্তুষ্ট, বিরক্ত, রক্তাক্ত, তার মধ্যে একে সম্মিলিত হোক সাধকের অবিরাম আত্মত্যাগ ও শিল্পীর সৃজনশীল কারুশীলতা। "আত্ম-উৎসরণে কি নৈর্ব্যক্তিক উচ্চারণে তার বক্তব্য হোক বিশ্বের কেন্দ্রে সূর্যের নীচে সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতার অবিরাম স্রোতধারায়, প্রবাহে প্রবাহে এক তৃষ্ণার্ত ক্ষুধার্ত অপরাজেয় মানবতার।"[৩]

সামাজিক জীবন জটিলতা থেকে আধুনিক কথা-সাহিত্যের উদ্ভব। এ প্রসঙ্গে ডক্টর এস.এম.লুৎফর রহমান বলেছেন- "আধুনিক কথা-সাহিত্য, আধুনিক জীবন ও সভ্যতার নানা সমস্যা, ভাব-ভাবনা ও দ্বন্দ্ব জটিলতাকে আত্মস্থ করে বিকাশ লাভ করেছে। রেনেসাঁ-উত্তর ইউরোপে শিল্প-বিপ্লব ও যন্ত্রবিজ্ঞান বিকাশের ফলে সমাজ-ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক অবস্থার সূচনা হয়। সমাজ-জীবনে বহু রকম নতুন শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে ও শ্রেণী দ্বন্দ্ব পূর্বাপেক্ষা গভীরতর, জটিলতর ও ব্যপকতর রূপ লাভ করে। এ সময়ে মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের ফলে সাহিত্য প্রচারের বিপুল সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই সময় সুর ও ছন্দের পরিবর্তে স্বর ও ধ্বনি আশ্রয়ী গদ্য-সাহিত্যের প্রবর্তন হয়। প্রধানতঃ নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আবির্ভাবের ফলে, সামাজিক বিপর্যয় দেখা দেয়। ক্রমে ক্রমে নতুনতর

Dhaka University Institutional Repository


সাংস্কৃতিক জীবন ও মুল্যবোধের সূচনা হয়। পুরাতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের পুরাতন রীতি ; পুরাতন সংস্কৃতি ও জীবনের পুরাতন মূল্যবোধ ও গুরুত্ব হারায়। কবিতাকে অতিক্রম করে গদ্যের আবির্ভাব হয় এবং ধীরে ধীরে গদ্য, প্রবন্ধ, নাটক ও কথা-সাহিত্যে আপন

শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। আধুনিক কালের উপযোগী আধুনিক সাহিত্যের আবির্ভাব ঘটে। এই সাহিত্যে গদ্যের সর্বাধিক চারু ও রসময় রূপকথা সাহিত্য নামে প্রকাশ পায়।

কথা-সাহিত্যে উপন্যাসের স্থান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষের সামাজিক জীবনের সমস্যা ও জটিলতাকে রূপায়ণ করার এমন শক্তিশালী সাহিত্য উপকরণ আর নেই। কল্পনা ও আবেগের বিশেষ সাহায্য ব্যতীত সাধারণ কথায় সাধারণ মানুষের মনোভাব ও বক্তব্য এবং তাদের জীবনচিত্র সর্বতোভাবে উপন্যাসের মাধ্যমে তুলে ধরা যায়। এ জন্য তাদের জীবনচিত্র সর্বতোভাবে উপন্যাসের মাধ্যমে তুলে ধরা যায়। এ জন্য উপন্যাসের যেমন আয়তনগত কোন ধরা-বাঁধা সীমা নেই, তেমনি তার কল্যাণ সাধনকারী সম্ভাবনা ও সীমাহীন। মানব জীবন ও মানব সমাজের সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি, দুঃখ- দুর্দশা, বিক্ষোভ ও বিপ্লবকে আত্মস্থ করে উপন্যাস সুগ্রথিত হ'য়ে ওঠে। এ-জন্য তা জীবনকে খণ্ডিতভাবে চিত্রিত করে না বরং সমগ্রভাবে, অখণ্ড আঁধারে তুলে ধরে। তুলে ধরে এই জীবনের সকল গ্লানি, কুশ্রীতা, বিষাদ, আনন্দ, সৌন্দর্য, হাসি, কৌতুক সবকিছু এক সঙ্গে। এই ক্ষমতা সাহিত্যের অন্য কোন শাখার নেই। উপন্যাস সমাজের প্রচলিত এসব কিছুই একসঙ্গে সম্পাদন করতে সমর্থ হয়। একটি উপন্যাসের মধ্যে কবির অনুভূতি ও ভাবাবেগ, নাট্যাকারে ঘটনা-সংঘাত এবং প্রবন্ধিকের বিশ্লেষণ নৈপুণ্য লাভ করা যায়। কথা-সাহিত্য ব্যতীত সাহিত্যের অপর কোন শাখায় এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের একত্র উপস্থিত সুলভ নয়। এজন্য উপন্যাসকে আধুনিক জীবনের মহাকাব্য বলা যায়। বস্তুত, উপন্যাস আধুনিক গদ্য সাহিত্যের একটি বিশেষ অবদান। কথা সাহিত্যের উচ্চতর বিজয় পতাকা। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করলে তার এ গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়।

উপন্যাস ও কবিতা যে একই জিনিস নয় তা সহজেই বোঝা যায়। উপন্যাস ও কবিতার ভাষা পৃথক। কবিতার ভাষা সাধারণ ভাষা নয়। তা দ্যুতিময়, ব্যঞ্জনধর্মী ; রহস্য বিজড়িত, আধো উচ্চারিত, আধো অনুচ্চারিত ভাষা। সে ভাষা ইঙ্গিতে কথা বলে। সব কথা স্পষ্ট করে বলে না। আমার সব কথাও বলে না। অনেক কথা অনুক্ত থেকে যায়। কিন্তু উপন্যাসের ভাষা এমন ইঙ্গিতাত্মক, রহস্যময় ও অস্পষ্ট নয়। তা সাধারণ ভাষা। উপন্যাসে অস্পষ্টতার বা উহ্য কথার কোন স্থান নেই। উপন্যাস প্রয়োজনীয় কোন কথাই ত্যাগ করে না। একটি বিশেষ ভাবকে, একটি

Dhaka University Institutional Repository


বিষয়ের দ্বারাও প্রকাশ কার যায় কবিতায়। কিন্তু উপন্যাসে ভাব প্রধান নয়। বিষয়বস্তুই গুরুত্বপূর্ণ। উপন্যাস ভাব অপেক্ষা বিষয়কে বা মানব জীবনের বিশেষ বিশেষ সমস্যাকে তুলে ধরে বলে তার ক্ষেত্র কবিতা অপেক্ষা অনেক ব্যাপক এবং আয়তনও কাব্য অপেক্ষা দীর্ঘতর। কবিকে সাধারণতঃ কাহিনী বলতে হয় না। কিন্তু ঔপন্যাসিক কাহিনী ও ঘটনার মাধ্যমেই অগ্রসর হ'তে হয়। কবিতা তাই মানুষের অনুভূতিকে নাড়া দেয় আর উপন্যাস সরাসরি তার হৃদয়ে আলোড়ন তোলে। কবিতা বাস্তব হলেও উপন্যাস বাস্তবতার এবং অধিক জীবন ঘনিষ্ঠ।

অপর দিকে ছোটগল্প উপন্যাসের মত সম্পূর্ণ জীবনকে রূপায়ণ করে না। জীবনবোধ অসম্ভবভাবে গ্রহণ না করে বরং জীবনের একটি খণ্ডাংশের সমস্যা, অভিজ্ঞতা কিংবা স্মৃতিকে অবলম্বন করেই তা রচিত। একটি মাত্র ঘটনার মধ্যে ছোটগল্পের অবয়ব নির্মিত হয়। উপন্যাসের মত ছোট গল্প প্রথম থেকে শুরু না হয় এবং সমাপ্তিতে গিয়েও পৌছে না। ছোটগল্পের আরম্ভ ও সমাপ্তি আকস্মিক। এ জন্য ছোট গল্পের পাঠক অতৃপ্ত থেকে যায়। কিন্তু উপন্যাসের শেষ পাঠক অতৃপ্ত অনুভব করে না।

লেখকের দায়িত্ব কঠিন। তিনি একটি অখণ্ড আঁধারে-ঘটনা, চরিত্র বিশ্লেষণ প্রভৃতির সহযোগে মনোরম আখ্যান নির্মাণ করেন ও তার সুষ্ঠ পরিণতি আনয়ন করেন। একটি দীর্ঘ কাল্পনিক কাহিনী তাকে তৈরী করতে হয়। কিন্তু সে কাহিনী আকর্ষণীয় করার জন্য তা বিশ্বাস্য, সংঘাতময় করে তুলতে হয়। সর্বপরি তাকে শিল্পগুণ বজায় রাখতে হয়। কাহিনীকার তার রচনার ঘটনাসমূহের প্রত্যক্ষ চরিত্রবলীর সর্বক্ষণের সঙ্গী। সে জন্য উপন্যাসের যে কোন ঘটনার ব্যাখ্যাও যে কোন চরিত্রের মনের অতি গোপন ভাবটিও তার অজানা থাকার কথা নয়। ঔপন্যাসিক স্বীয় বিশ্লেষণী শক্তির সাহায্যে প্রত্যেকটি ঘটনার মূল কারণ ও প্রত্যেকটি চরিত্রের মানসিক স্বাতন্ত্র্য, আচার-আচরণ প্রভৃতির যথার্থতা পাঠকদের জ্ঞাপন করেন। তিনি এ জন্য অনেক তুচ্ছ ঘটনাকেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণরূপে চিত্রায়ণ করতে পারেন। তাই "আমরা তার রচনায় সেই মানুষ পাই যে মানুষ নিজের প্রবৃত্তি, চিন্তা-ভাবনা, সাহস ও দুর্বলতা, পাপ ও পুণ্য এবং দৈনন্দিন কার্যবলীর সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে মিশে আছে। তাই ঔপন্যাসিক তার উপন্যাসে যে সমাজ-জীবনের ইতিহাস দান করেন তার মধ্যে মানুষের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসটুকুও খুঁজে পাওয়া যায়।"[৪]

আবার তিনি যেহেতু সমাজের শিল্পী-সে জন্য সমাজ বিজ্ঞানীর মত তাঁকে প্রতিটি কার্যের কারণ ও উদ্‌ঘাটন ক'রে দেখাতে হয়। এ-ভাবেই কাহিনী বাস্তব হয়ে ওঠে এবং যে ঔপন্যাসিক যতটুকু দক্ষতার সঙ্গে এই দায়িত্ব পালন করতে পারেন-শিল্পী হিসেবে তার কৃতিত্ব এতটুকু।

Dhaka University Institutional Repository


কথা-সাহিত্যের শিল্পরূপ বিচারে তাই ঔপন্যাসিকের দক্ষতা-অদক্ষতার বিচার করতে এবং তার সমালোচনা করতে হয়। কাহিনী, ঘটনা ও চরিত্রের যে যে অংশ অবিশ্বাস্য সঙ্গতিহীন ও অবাস্তব উপন্যাসের শিল্পধর্ম সেই সেই স্থানে ক্ষুণ্ন ও ব্যাহত হয়েছে বলা যায়। আর সেই সেই অংশ ঔপন্যাসিকের শিল্প কৃতিত্বেরও ব্যর্থতার নজির বটে। ঔপন্যাসিক যেহেতু সমগ্রভাবে মানব জীবনের উপকার সে জন্য তাকে আখ্যানের অন্তর্গত প্রতিচরিত্রের ঘটনার ও সমগ্র কাহিনীর বাস্তব বিকাশ, বিবর্তন ও পরিণতিগুলো ক্রমে ক্রমে ফুটিয়ে তুলতে হয়।

## তথ্য নির্দেশ ঃ

১। উদ্ধৃত-দেখুন, ডক্টর এস.এম. লুৎফর রহমান-এর বাঙলাদেশী কথা-সাহিত্যের তিন আমল, ধারণী সাহিত্য সংসদ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-২০০৫।

২। ডক্টর আলাউদ্দিন আল আজাদ, সাহিত্যের আগন্তুক ঋতু ; গতিধারা, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-২০০১, পৃষ্ঠা-১০।

৩। ডক্টর আলাউদ্দিন আল আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১২।

৪। ডক্টর এস.এম. লুৎফর রহমান, বাঙলাদেশী কথা-সাহিত্যের তিন আমল, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬৭।

Dhaka University Institutional Repository



# দ্বিতীয় অধ্যায়

## বিভাগোত্তর বাংলা কথা-সাহিত্যের পটভূমি

Dhaka University Institutional Repository


বর্তমান গবেষণার কাল পরিধি ১৯৪৭-১৯৬৫। এ সময়ের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা দেশ-বিভাগ ও নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা। প্রায় ছ'শ' বছরের অবিভক্ত (১৪৫০-১৯৪৭) বাঙালাদেশ বিভক্ত হ'য়ে একাংশে (পশ্চিমবাংলা) হ'ল-'ভারতরাষ্ট্র' ও বাকী অংশ হ'ল পূর্ব পাকিস্তান নামে-পাকিস্তান রাষ্ট্র (পূর্ব পাকিস্তান)। কিন্তু দেশ-বিভাগ শুধু রাজনৈতিক মুক্তি অর্জনের ইতিহাস নয়, শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে অর্থনৈতিক অধিকার আদায়েরও ইতিহাস। সেই সঙ্গে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির ও ইতিহাস। পাকিস্তানের অর্থনীতির বিকাশের ধারায় বিদেশী পুঁজির প্রয়োগে যে সাম্রাজ্যের বিস্তার ও বিকাশ সম্ভবপর হয়েছিল, সেই সাম্রাজ্যের পতনের পূর্ব মুহূর্তে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে কৃষক ও শ্রমিক-শ্রেণীর অগ্রগতির ইতিহাসকে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অভিধায় চিহ্নিত করা যায়। ভারতের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে কৃষক ও শ্রমিক স্বার্থ বিজড়িত তথাকথিত প্রগতিশীল ও বামপন্থী রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয়ও তাতে ব্যক্ত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই বিভিন্ন সংগঠনের শ্রেণী সচেতনতার মাধ্যমে পাকিস্তানের রাজনীতিতে কংগ্রেস ও মুসলিমলীগ ব্যতীত তৃতীয় একটি রাজনৈতিক শক্তিরূপে কমিউনিষ্ট পার্টির দ্রুত বিস্তার ঘটে। এবং যুদ্ধকালীন সময়ে শ্রমিক শ্রেণীর সচেতন কর্মপদ্ধতির মধ্যদিয়ে পাকিস্তানের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়। এ-ক্ষেত্রে এক-টি সক্রিয় ভূমিকা পালনে সম্মত ছিল বলে পরিবর্তিত পটভূমিকায় কমিউনিষ্ট পার্টি কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণেও দ্বিধাবোধ করেনি।[১] যুদ্ধ পরবর্তীকালের জাতীয় ও জনগণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকাও ছিল প্রশংসাযোগ্য। বিভাগোত্তর কালে কমিউনিষ্ট পার্টি তার সাংগঠনিক ভূমিকাকে আরও বিস্তৃত করে দেয় এবং তারই পরিণতিতে কমিউনিষ্ট আন্দোলনে সাময়িকভাবে ভাঁটা পড়লেও পরবর্তীকালে সর্বভারতীয় সাধারণ নির্বাচনে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সংসদে কমিউনিষ্ট পার্টির কিছু সংখ্যক সদস্যও নির্বাচিত হয়।[২]

পরবর্তী পর্যায়ে ভারত ও বাংদেশের রাজনীতিতে কমিউনিস্ট আন্দোলন দু'টি ধারায় বিভক্ত হয়ে যায় এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের কর্মধারাকে কেন্দ্র করে এই দ্বিধা-বিভক্তি অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। ফলে, দশকের উত্তর পর্বে যার চূড়ান্তরূপ রুশ ও চীনাপন্থী বলে জনসাধারণের কাছে পরিগণিত হয়।[৩] এ সময় অর্থনৈতিক কার্যক্রম তরান্বিত করার লক্ষ্যে শিল্পোদ্যোগের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগেরও উৎসাহ দানের ব্যবস্থা থাকে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুই প্রেক্ষিতেই সমাজ মানসে ও সাংস্কৃতিক জীবন ধারায় পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে ওঠে। সামাজিক-অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতিক বিকাশের ধারায় গ্রামের মানুষ শহরের দিকে যাত্রা করে। জীবিকার নতুন পথের সন্ধানে পঞ্চাশের মনন্তর মানুষকে একদিন শহরমুখী করে তুলেছিল। ফলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে দেশীয় নাগরিকতায় এই নতুন বিন্যাসকে মূলত উদ্বাস্তুকেন্দ্রিক নগরায়ন বলে আখ্যায়িত হয়ে থাকে।[৪] সমকালীন সাধারণ গ্রামীণ ও শহরের নাগরিক জীবনে মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও অনিবার্য

Dhaka University Institutional Repository


এক পরিবর্তনের সূচনা ঘটে। রাজনীতি সচেতন মানুষ সুযোগ সন্ধানী হয়ে ওঠে এবং সামাজিক জীবনের গভীরে প্রভাব বিস্তার করে। ফলে, সকল প্রকৃতির নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধকে বিসর্জন দিতেও আর দ্বিধা করে না। অবশ্য এই অবক্ষয়ের মধ্যে নতুন জীবন-চেতনার প্রকাশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাংলাদেশের ভৌগলিক পরিবেশ ও জনজীবনের গভীরে ব্যাপকভাবে আঘাত হানে। যুদ্ধের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনও হয়ে ওঠে আলোড়িত। যুদ্ধের অভিঘাতে পূর্ববর্তী প্রচলিত সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ধ্যানধারণা এবং মূল্যবোধ প্রবলভাবে নাড়া দেয়। মানুষ যথার্থভাবে হয়ে পড়ে নিঃসঙ্গ, নিবলম্বন, প্রবল প্রতাবান্বিত। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিনাশী প্রকাশ ভারতবর্ষীয় জীবনধারায় আনে অপ্রতিরোধ অমঙ্গল। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এই যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন শুধু ভৌগলিক মানচিত্রেরই পরিবর্তন সাধন করেনি, মানুষের সাহিত্য-শিল্প ও সংস্কৃতি ইতিহাসেও এনেছে অপ্রতিরোধ্য পরিবর্তনের কালস্রোত। সেই স্রোতধারায় বাংলা সাহিত্যেও প্রকাশিত হয়েছে এক পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি ও নতুন জীবনদর্শন।[৫]

## ক. রাজনৈতিক পটভূমি

স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনীতির প্রাবাল্যের মুখে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কিছুকাল পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত প্রধানত পশ্চিমাঞ্চলের আমলা সামরিক চক্র ও উদীয়মান পুঁজিপতিদের অপতৎপরতার ফলে জ হিন্দু বিত্তবান ও মধ্যবিত্তের বৃহদাংশ জন্মভূমি পরিত্যাগে বাধ্য হয়।[৬] তাদের স্থান পূরণের জন্য ভারতীয় বাংলা, বিহার ও অন্যান্য ভারতীয় প্রদেশ এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অবাঙালীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে আসে। ফলে নবাগতরা স্থানীয় বাঙালী মধ্যবিত্তের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়। পশ্চিমাঞ্চলের নেতৃবৃন্দ তথা কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠী নিজেদের ক্ষমতা, প্রতিপত্তি নিরঙ্কুশ করার স্বার্থে নবাগতদের ও স্থানীয় ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত শ্রেণীর উপর নির্ভরশীল হয়।[৭] পরিণতিতে চাকুরী, ব্যবসায় সর্বক্ষেত্রেই স্থানীয় মধ্যবিত্তরা শক্তিশালী নতুন প্রতিদ্বন্দ্বীদের ডিঙিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভে অনেকাংশে ব্যর্থ হয় এবং আক্রান্ত হয় হতাশা ও বঞ্চনার বোধে। সে কারণে কয়েক বছরের মধ্যে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী, পাকিস্তান সম্পর্কে আশা বা স্বপ্নভঙ্গের সম্মুখীন হয়। নিজেদের বিকাশের অনুকূলে তারা উনিশ শতকের হিন্দু মধ্যবিত্তের অনুরূপ স্থায়ী কোন ভিত্তিভূমিও খুঁজে পায়নি। কাঙ্খিত বিকাশের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অভাব এবং শাসক গোষ্ঠী অনুসৃত জাতি-

Dhaka University Institutional Repository


বৈষম্যমূলক নীতি ও পদক্ষেপের [৮] ফলে এদেশের মধ্যবিত্তরা নিজেদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবার সম্ভাবনায় উৎকণ্ঠিত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে থাকে।

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় শাসনক্ষমতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখার উপায় হিসেবে শাসক গোষ্ঠী ধারাবাহিক আক্রমণ চালায়, তার প্রথম আঘাত নেমে আসে মাতৃভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির উপর। পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলের শিক্ষিত পাঞ্জাবী, সিন্ধী, পুশতু, উর্দু, বেলুচী প্রভৃতি ভাষাভাষী মিলিতভাবে বাংলা ভাষাভাষীদের তুলনায় ছিল সংখ্যা লঘিষ্ঠ। বাংলা ছিল পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ মানুষের মাতৃভাষা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এশিয়ার অন্যতম সমৃদ্ধ ভাষা হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানী শাসকরা এ ভাষার মূল্য স্বীকার না করে তাদের জাতীয় অস্তিত্বকেই অস্বীকার করেন। ফলে ভাষা আন্দোলন-এদেশের মধ্যবিত্তকে সত্যিকার অর্থে আন্দোলনমুখী করে তোলে। প্রতিবাদী ছাত্র তরুণ মধ্যবিত্তের এ ঐতিহাসিক আন্দোলন, সামাজিক-রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সুদুর প্রসারী তাৎপর্য ও প্রভাব সঞ্চারী হয়ে দেখা দেয়। এ আন্দোলনের প্রভাবে উদার গণতান্ত্রিক চেতনা দেশব্যাপী সঞ্চারিত। ফলে ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে স্বাতন্ত্র্যবাদী মুসলিম লীগের পরাজয় ও যুক্ত ফ্রন্টের ২১ দফার নিরঙ্কুশ বিজয় ঘটে। এ ঘটনা এ দেশের সর্বাত্মক সরকার বিরোধী ভূমিকারও বহিঃপ্রকাশ। যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচীতে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক ও মুদ্রা এ তিনটি বিষয়টি ফেডারেল সরকারের আওতায় রাখার প্রশ্নটি অন্তর্ভুক্ত থাকায় আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের অধীনে পাকিস্তানে একটি ফেডারেশন গড়ে তুলতে প্রয়াসী হলেও এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা ও সংখ্যা সাম্যের নীতি গৃহীত হওয়ায় তা প্রকৃত স্বায়ত্বশাসনের দাবী থেকে অনেক দূরবর্তী ছিল।[৯] এমন কি ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে নির্দিষ্ট আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসনও পূর্ব পাকিস্তানীরা ভোগ করতে পারেনি। আইউব প্রবর্তিত ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন ও তার প্রদত্ত ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র আমাদের স্বায়ত্বশাসনের দাবী সম্পূর্ণ অস্বীকার করে চাপিয়ে দেয় এককেন্দ্রিক শাসন।[১০]

দেশ-বিভাগের পর থেকেই শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানীদের দেশ প্রেমের প্রতি কটাক্ষ করেছিল। উত্তরাঞ্চলের তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী ইলা মিত্র এবং সাঁওতালদের প্রতি যে পুলিশি নির্যাতন চালানো হয়েছিল তা নজীরবিহীন।[১১] পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তানের উদীয়মান রাজনৈতিক শক্তিকে 'পঞ্চম বাহিনী', 'কমিউনিস্ট', 'ভারতের দালাল', 'দেশের দুশমন' ইত্যাদি বলে গালমন্দ করতেন।[১২] বস্তুত, সরকারের আচরণ ছিল নিষ্ঠুর। তবু সরকারের অত্যাচারকে উপেক্ষা করে পূর্বাঞ্চলে নানকার, হাজং ও টংক আন্দোলন, নাচোল কৃষক আন্দোলন, যশোর ও খুলনার কৃষক আন্দোলন ও কৃষক বিদ্রোহ ঘটেছিল।[১৩]

Dhaka University Institutional Repository


সরকার চেয়েছিল সবাই মিলে মুসলিম লীগকে শক্তিশালী করুক - অন্য কোন রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন নেই। কিন্তু অনেক রাজনৈতিক দল গড়ে উঠতে লাগল। ১৯৪৯ সালে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ জন্ম নেয়। শের-ই-বাংলা ফজলুল হক 'কৃষক শ্রমিক পার্টি' নামে একটি দল গঠন করেছিলেন। মুসলিম লীগ সরকার এতকাল দলীয় একনায়কত্ব চালিয়ে যাচ্ছিল। অবস্থার চাপে ১৯৫৪ সালে সরকার পূর্বপাকিস্তানের প্রাদেশিক পরষদের নির্বাচন দেয়। এতে যুক্তফ্রন্ট অর্থাৎ হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর যুক্তফ্রন্ট ২৩৭ টি মুসলিম আসনের মধ্যে ২২৮ টিতে বিজয়ী হয়। তারা প্রাদেশিক সরকার গঠন করে। কিন্ত কেন্দ্রীয় মুসলীম লীগ সরকার শের-ই-বাংলা ফজলুল হককে দেশদ্রোহী আখ্যা দেয় এবং মন্ত্রীসভা ভেঙে দেয় ও ৯২ (ক) ধারা জারী করে। শেখ মুজিবসহ বহু মন্ত্রী এবং প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মীকে কারারুদ্ধ করা হয়। ১৯৫৬ সালে সরকার পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র অনুমোদন করে। শাসনতন্ত্রে পূর্ববাংলাকে বলা হয় পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশ বিলুপ্ত করে সেখানে গঠন করা হয় এক ইউনিট। পূর্ব পাকিস্তানকে আর একটি ইউনিট গণ্য করা হয়। শাসনতন্ত্রের অধীনে কোন সাধারণ নির্বাচন হতে পারেনি। ১৯৫৮ সালের ৬ অক্টোবর প্রধান সেনাপতি আইউব খান সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন। তিনি শাসনতন্ত্র বাতিল করে দিয়ে একনায়কত্ব চালাতে থাকেন। প্রথমতঃ সামরিক জান্তার নির্যাতনে মানুষ তেমন প্রতিবাদ করতে পারেনি। কিন্তু বছর তিনেকের মধ্যে আইউব-বিরোধী আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। রাষ্ট্র-পরিচালনায় অক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য 'মৌলিক গণতন্ত্র' নামক এক অদ্ভুত পদ্ধতি চালু করেন।[১৪]

আইউবী উন্নয়নের দশকে ঢাকা নিনাদকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করলো। তখন গণঅভ্যুত্থান হলো অবশ্যম্ভাবী। আইউবের পতন হলো, এবার রাজনৈতিক মঞ্চে এলেন নতুন নায়ক জেনারেল ইয়াহিয়া খান। তিনি সাধারণ নির্বাচন দিলেন সত্তরের এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অর্জন করলো নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা। কিন্তু সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা না দিয়ে শুরু করা হলো নির্মম দমন-পীড়ন-নির্যাতন। তাই অনিবার্যভাবেই স্বায়ত্বশাসনের দাবী বলিষ্ঠ হতে লাগলো। ক্রমশঃ বাঙালী জাতিসত্ত্বার প্রতি দেশবাসী সচেতন হয়ে উঠল। "১৯৪৭- এর পরে বাঙালী মুসলিম মানসে এক বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। বর্তমান বাংলাদেশ ভূখন্ডে এক অভূতপূর্ব দেশপ্রেমের উদ্ভব হয়েছিল। স্বদেশ প্রেম হলো একান্ত একটি ধর্ম নিরপেক্ষ চেতনা। দেশের প্রতি ভালোবাসা, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে দেশের মানুষের প্রতি মমত্ববোধ এবং দেশের ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ, এগুলিই হলো আমাদের নয়া বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি প্রস্তর।"[১৫]

পূর্ব পাকিস্তান কৃষক আন্দোলন দমন করতে গিয়ে পাকিস্তানী শাসকদের বর্বর ব্যবস্থা ; বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাদানের দাবির বিরুদ্ধে ঢাকায় গুলি বর্ষণ ও ছাত্রহত্যা (১৯৫২), যুক্তফ্রন্টের

Dhaka University Institutional Repository


নির্বাচনের (১৯৫৪) পর, বাঙালী গভর্নর সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা শের-ই-বাংলা ফজলুল হককে দেশদ্রোহী বলে নজরবন্দি করা এবং প্রাদেশিক পরিষদ ভেঙে দিয়ে সামরিক আইন জারি ইত্যাকার ঘটনা পূর্ব পাকিস্তানীদের করেছিল বেদনার্ত। মুসলমান শাসনে নির্মমভাবে মুসলমানদের রক্তপাত, সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ সৃষ্টি এ-অঞ্চলের মানুষের মনে সৃষ্টি করেছিল পুঞ্জীভূত ক্ষোভ।"[১৬]

পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসনের দাবী কখনই সরকার স্বীকার করেনি। উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান দমন করার জন্য সরকার যতই কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে জনগণ এবং ছাত্র সমাজ ততই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। জানুয়ারী মাসে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা এবং আওয়ামী লীগের ৬ দফার প্রতি অভূতপূর্ব গণসমর্থন দেখে সেনাবাহিনী তলব করা হয় এবং জনতার উপর গুলি বর্ষণ করা হয়। আন্দোলনের প্রচণ্ডতায় বেসামাল প্রেসিডেন্ট সেনাবাহিনীর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ১৯৭০-পর জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে সমগ্র পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনী আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু নাটকীয়ভাবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়। ফলে, ঢাকা নগরী মিছিলের নগরীতে পরিণত হয়।[১৭]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে ব্যাপক বিপর্যয় সাধিত হয়, তার ফলে প্রথমতঃ সমাজ কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গে বিধ্বস্ত হয় মানুষের মূল্যবোধ, প্রাক্তন ধ্যান-ধারণা-সংস্কার বিশ্বাস। ব্রিটিশ কলোনি-সৃজিত আধা সামন্তবাদী সমাজের উপর থেকে আস্থা উঠে যায় জনগণের। পঞ্চাশের দশকের মন্বন্তর সীমাহীন দুর্ভাগ্যের সঙ্গে সমাজ মানসে জন্ম দেয় রাজনীতি চেতনা। সংবেদনশীল শিক্ষিত মধ্যবিত্তের চেতনায় রাজনীতির তাৎপর্য ইতিবাচক অর্থে গৃহীত হয়। নব্যশিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায়ও সামন্তবাদী, সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ সৃষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি হয়ে পড়ে বীতশ্রদ্ধ। কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক সচেতন শিক্ষিত মানসে আগ্রহ সৃষ্টিতে সমর্থ হয়।

'প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘে'র মাধ্যমে বুর্জোয়া মানবতাবাদী ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মার্কসবাদী জীবনদর্শন ও সাহিত্য শিল্প ভাবনায় অনুশীলনচক্র গড়ে ওঠে।[১৮] ফলে, এই নতুন সামাজিক ও রাজনৈতিক মেরুকরণের ফলে সেখানে ইতিবাচক তাৎপর্য সঞ্চারিত হয়।

বৃটিশ-ভারতীয় রাজনীতির এক জটিল ও দ্বিধাবিভক্ত পটভূমিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে। ফ্যাসিষ্ট শক্তিবর্গের সঙ্গে যুদ্ধে মিত্রবাহিনীর বিজয়ে যে নতুন বিশ্বপরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তার ফলে ভারতের মুক্তির প্রশ্ন বিশ্ব-রাজনীতির পুরোভাগে এসে হাজির হয়।[১৯] কিন্তু ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল মুক্তির এই সর্বভারতীয়, আয়োজন বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে জটিল ও নাটকীয় রূপ গ্রহণ করে। সুদীর্ঘকালের শোষণ বঞ্চনা বাঙালী মুসলিম মানসে যে স্বাজাত্যবোধ ও সাম্প্রদায়িক ঐক্যচেতনার জন্ম দিয়েছিল, তাকে সুকৌশলে

Dhaka University Institutional Repository


ব্যবহার করে মুসলিম নেতৃবৃন্দ ১৯৪৫ সালে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ নির্বাচন এবং ১৯৪৬ এর প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া সামন্তবাদী প্রভূদের স্বার্থের অনুকূলে বিভক্ত হলো ভারত বাংলাভাষী ভূখণ্ড বিভক্ত হলো এবং জন্ম নিলো ভারত ও পাকিস্তান।"[২০] ইতিহাসের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অসঙ্গতি বিধানে পাকিস্তান-প্রশাসন যন্ত্রের সমর্থনপুষ্ট সামন্ত মূল্যোবোধ আক্রান্ত সুবিধাভোগী মধ্যবিত্তের সর্ববিধ প্রয়াস সত্ত্বেও নবজাগ্রত সচেতন মধ্যবিত্তের গতিশীল কর্মকাণ্ড বৃহত্তর সমাজজীবনেও আলোড়ন সৃষ্টি করে।

সমাজ জীবনের উল্লেখিত দ্বন্দ্ব গতি সংকট ও সংঘর্ষের অন্তর্ময় রূপায়ণ বিভাগোত্তর বাংলা কথা-সাহিত্যকে করেছে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। মধ্যবিত্তের প্রত্যাশাপ্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, সংগ্রাম, স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গ এ পর্যায়ে রচিত কথাসাহিত্যের মৌল উপজীব্য। বিকাশশীল মধ্যবিত্তের অশক্ত, অপরিণত ভিত্তি উপকরণের প্রশ্নে কথা সহিত্যকদেরকে করেছে উজ্জীবিত ও বাস্তবানুগ। বিষয়ভাবনায় অনিবার্য হয়ে উঠেছে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বময় প্রকাশ। একদিকে সামন্ত আর্থ-উৎপাদন কাঠামোর পিছুটান, অন্যদিকে বিকাশকামী মধ্যবিত্তের কর্মদ্যোগ, সংগ্রাম-স্বাবলম্বন ও প্রত্যাশা– এ দু'য়ের অনিবার্য দ্বন্দ্ব কথা সাহিত্যের বিষয় ও শিল্পরূপকে প্রভাবিত করেছে।

## খ. অর্থনৈতিক পটভূমি

বিভাগোত্তর কালে অর্থনৈতিক শ্রেণী বিকাশের দিক থেকে পাকিস্তান শাসিত বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের কোন সাদৃশ্য ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক কাঠামো পুরোপুরি মধ্যযুগীয় আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর দাঁড়িয়েছিল। অথচ, পূর্ব পাকনিস্তানের মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী গোড়া থেকেই ঔপনিবেশিক শক্তি কর্তৃক ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে তাদের উপর আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা আরোপের বিরোধিতা করে আসছিল। এর দরুণ পূর্ব পাকিস্তানের ভূমিব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় সব সময়ই অগ্রবর্তী থেকেছে।[২১] দেশ-বিভাগকালে এ ভূখণ্ড ছিলো শিল্পায়নে ক্রমাগ্রসর ও বৃদ্ধিশীল কৃষিপ্রধান অঞ্চল। অপর পক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ভিত্তি মূলত প্রতিষ্ঠিত ছিলো পশুচারণ ও পশুপালনের উপর। উৎপাদিত পণ্যের মানদণ্ডেও বাংলাদেশ ছিলো পশ্চিম পাকিস্তান অপেক্ষা সমৃদ্ধ। বহুকাল ব্যাপী পৃথিবীর একমাত্র পাট রপ্তানীকারক অঞ্চলের অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য ছিলো ধান এবং চা। অর্থনৈতিক কাঠামো এবং উৎপাদিত পণ্যের বৈষম্য পাকিস্তানের দুই অংশের চারিত্রকে গোড়া থেকেই করে রেখেছিল স্বতন্ত্র।[২২] ফলে, দুই খণ্ডের রাষ্ট্রীয় একীকরণ পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যই লাভজনক হয় এবং তাদের

Dhaka University Institutional Repository


বশংবদ হিসেবে এ অঞ্চলে যারা নেতৃত্ব দেয় তারা ছিলো আধুনিক শিক্ষা বিবর্জিত, সামন্ত মূল্যবোধ ও অর্থনৈতিক বিন্যাসের সুযোগপ্রাপ্ত ঢাকার নবাব পরিবার ও তাদের কতিপয় অনুসারী।[২৩]

দেশ-বিভাগোত্তর অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অস্থিরতা, জাতি-শোষণ, শ্রেণী-শোষণ এবং ভাষা আন্দোলনের গতিশীল চেতনা সমাজজীবনের সর্বস্তরে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ক্ষোভকে করে তুলেছিল অনিবার্য। ফলে, ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তানী বেনিয়া পুঁজি ও প্রতিক্রিয়াশীল সামন্তশক্তির ধারক মুসলিমলীগ সর্ববিধ প্রয়াস সত্ত্বেও অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল শক্তি যুক্তফ্রন্ট বিজয়লাভে সমর্থ হলো।[২৪] ফলে, বাংলাদেশে অবস্থানকারী অবাঙালী আমলা ও শিল্পপতিরা হয়ে ওঠে উদ্বিগ্ন। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টতে সায়ত্বশাসনের প্রসঙ্গে থাকায় পাকিস্তানী পুঁজির একচেটিয়া স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবার আশঙ্কা দেখা দিল। যুক্ত ফ্রন্টের মন্ত্রিসভা গঠিত হলেও কেন্দ্রীয় প্রশাসনের চক্রান্তে বাংলাদেশের খাদ্য পরিস্থিতির অবনতি ও বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে দাঙ্গার সৃষ্টি করে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পটভূমি তৈরী করা হয়। ১৯৫৪ সালের মে মাসে যুক্ত ফ্রন্টের মন্ত্রীসভা বাতিল করা হয়। এটা ছিল বাংলাদেশের সামন্ত প্রথা ভিত্তিক গণতন্ত্রের উপর পুঁজিবাদের প্রথম আঘাত, কিন্তু মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করলেও ১৯৫৯ এর পূর্বে পুঁজিবাদ এখানে জয়যুক্ত হতে পারেনি।[২৫] এ সময় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় প্রশাসনের পরিকল্পনাহীন কার্যক্রমের ফলে বাংলাদেশের খাদ্য পরিস্থিতি মারাত্মক রূপ ধারণ করে। প্রতিশ্রুতি ও কর্মের মধ্যকার অসামঞ্জস্য জনজীবনের মোহভঙ্গকে করে তুললো অনিবার্য। পাকিস্তানি পুঁজি ও সামন্ত শক্তির সঙ্গে বাংলাদেশের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাশী পুঁজির সংঘাত হয়ে ওঠে তীব্রতর। ফলে, বিভিন্ন প্রকার অসঙ্গতির কারণে জনসাধারণের জীবন যাত্রা হয়ে উঠলো বিষময়। ফলে খাজা নাজিমুদ্দীনের মন্ত্রীসভা কেন্দ্রেরও বিরাগ ভাজন হলো।[২৬] গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ কর্তৃক খাজা নাজিমুদ্দীনের বরখাস্ত ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনকেই কেবল অনিবার্য করে তোলেনি, পশ্চিম পাকিস্তানী সামন্ত আশ্রয়বাদী অর্থনীতির পরিবর্তে পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশের প্রয়োজনকেও সুস্পষ্ট করে তুলেছিল।[২৭]

১৯৫২ পরবর্তীকালে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জীবনের তাৎপর্যপূর্ণ রূপান্তর সাধিত হয়। বাঙালী বেনিয়া পুঁজি গড়ে উঠতে থাকে পাকিস্তানী পুঁজির সহযোগী হিসেবে।[২৮] পাকিস্তানে বিদেশী মুদ্রার শতকরা ৬০ থেকে ৮০ ভাগ লাভের উৎস ছিলো বাংলাদেশের রপ্তানী কারবার। কিন্তু এই লাভের অধিকাংশই নির্দিষ্ট ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানের কালকারখানার প্রয়োজন মেটানোর জন্য। দেশের পূর্বাঞ্চলের ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ মুদ্রা বর্জন, আমদানী ও রপ্তানী লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে সমতা দাবি করে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রাধনমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হলে আমদানী বাণিজ্যে পূর্ব পাকিস্তানের নবাগতদের অংশ গ্রহণের পক্ষে অনুকূল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং বৈদেশিক মুদ্রাবন্টনের ক্ষেত্রেও দুই প্রদেশের মধ্যে সমতা রক্ষার ব্যবস্থা নেয়া হয়। এভাবেই গড়ে ওঠে বাঙালীর জাতীয় পুঁজি বিকাশের পটভূমি।[২৯]

Dhaka University Institutional Repository


১৯৬১ সালের ২২ সেপ্টেম্বর বাঙালী অর্থনীতিবিদরা পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনীতির অসামঞ্জস্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন। ফলে, দেশের দুই অংশের অর্থনৈতিক বৈষম্যের ব্যাপারটি তাত্ত্বিক ভিত্তি লাভ করে। পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিমাংশের মধ্যে বিরাজমান অর্থনৈতিক বৈষম্য সম্পর্কে জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করেন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাবিদ ডঃ এম.এ. হুদা (ডিসেম্বর-১৯৬২)। পরিকল্পনা কমিশনের একজন সদস্যদের কণ্ঠে উচ্চারিত হবার ফলে অর্থনৈতিক বৈষম্য পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রধান ইস্যুতে পরিণত হয়।

পাকিস্তানের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কাঁচামাল ও অন্যান্য উপকরণের ৮০ ভাগই যোগান দিতো পূর্ব পাকিস্তান। অথচ নাগরায়ণ, শিল্পায়ন ও আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে পূর্বাঞ্চলকে রাখা হয়েছি পশ্চাৎপদ করে। পঞ্চাশের মনন্তর ও দেশ বিভাগজনিত কারণে যে ছিন্নমূল জনস্রোতে নগরমুখী হয়েছিল, ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তনহীনতা এবং এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ঔদাসিন্যের ফলে সেই জনস্রোত গ্রামে প্রত্যাবর্তনে আর উৎসাহ বোধ করেনি। বরং কর্মসংকটের পাশাপাশি কলকারখানায় শ্রমিকের সংখ্যাও ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু, সেখানেও স্বাধীন পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের সমগ্র জনগোষ্ঠীকে যখন শিল্পায়ন ও আধুনিকীকরণের পূর্ণ সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। তখন বাঙালী মুসলমানকে ধর্মীয় অনুশাসনে বিশ্বস্ত হতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানী শাসক চিহ্ন নিজেদেরকে প্রয়োগ ও প্রকৌশলিক বিদায় পারদর্শী করতে তৎপর হয়েছে। আর ইসলামী শিক্ষা ও জীবনযাত্রার স্থবিরতায় উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে তরুণ সমাজকে।[৩০] বাংলা বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের একটি অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট লাভ করে। অর্থনৈতিক স্বাধীকারের প্রশ্নে ভাষা আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে যখন বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃত হয়, তখন এদেশের অর্থনীতিবিদরা মাতৃভাষার মাধ্যমে অথনীতি চর্চার একটি ঐতিহ্য গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন।[৩১]

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার পেছনেও বাঙালী অর্থনীতিবিদদের ভূমিকা কম ছিল না। সে সময়ে যুক্ত ফ্রন্টের নির্বাচনী ঘোষণাপত্রে সঠিক অর্থনৈতিক কর্মসূচী চিহ্নিত করে অন্তর্ভূক্ত করা, বিভিন্ন দেয়াল পত্রের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৈষম্যের ব্যাপারটি আরও বড় করে তোলা এবং এদেশের অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক বিকল্প কাঠামো চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে তদানীন্তন বাঙালী অর্থনীতিবিদগণের অবদান ছিল অসামান্য।[৩২]

ষাটের দশকের প্রথম থেকেই বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদেরা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলেন যে, পাকিস্তানের দুই অংশের অর্থনীতির মধ্যে একটি দ্বিমত আছে। যার বেশির ভাগই কোন অন্তর্নিহিত আপেক্ষিক দুর্বলতা থেকে উদ্ভূত নয় বরং তা দীর্ঘদিনের বৈষম্যমূলক নীতিমালা অনুসরণের ফলাফল। তখন থেকে দুই অর্থনীতিতত্ত্বের জন্ম যার মূল কথা ছিল যে, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের অর্থনীতির মধ্যে মৌলিক

Dhaka University Institutional Repository


পার্থক্য বিদ্যমান। দীর্ঘদিন শাসনের ফলে পাকিস্তানের অর্থনীতির বর্ধিষ্ণু ও বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্ষয়িষ্ণু রূপে পরিগ্রহ করেছে এবং অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য এ দুটো অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ দুটো আলাদা সত্তা হিসেবে বিবেচনা করে তাদের জন্য পৃথক নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে। বলা বাহুল্য, এই অর্থনীতিতত্ত্বই মধ্যষাট দশক ও তার পরবর্তীকাল থেকে বাংলাদেশের স্বায়ত্ত্ব শাসন ও ৬ দফা দাবীর ভিত্তি রচনা করেছিল।[৩৩] এ সময়ে প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেখা গেছে বাংলাদেশের উন্নয়নে মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ যেখানে ৮২০ টাকা ও ১৯০ টাকা, যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের মাথা পিছু ব্যয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ২০৫ ও ২৯০ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ১৯৬০-৬১ থেকে ১৯৬৪-৬৫ সালে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেখানে ব্যয় হয়েছে ৯৭০ কোটি টাকা, সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ২০,১৫০ কোটি টাকা। অথচ, প্রথম দশ বছরে পূর্ব পাকিস্তান বহির্বাণিজ্যে যেখানে ৪৬৮০৯ কোটি টাকা আয়ের ভারসাম্য বাজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের ঋণগ্রস্থ হতে হয় ৪০৭০৬ কোটি টাকা আর এই ঋণ পরিশোধ করতে হয় পূর্বপাকিস্তানের আয় থেকে। শুধু তাই নয় পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ পাচারের মধ্যেই তথ্য এ পরিলক্ষিত হয়।[৩৪] অবশ্য ১৯৬৫ সালের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ চলাকালে বাঙালীরা পাকিস্তানের দু'অংশের মধ্যকার ব্যবধান সম্পর্কিত প্রকৃত বাস্তবতাকে উপলব্ধি করেন এবং ভোটের মাধ্যমে পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণে রাখার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত বুঝতে পেরে পূর্ণ অর্থনৈতিক স্বায়ত্ত্বশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অগ্রসর হতে উদ্বুদ্ধ হন।[৩৫] ১৯৬৬ সালের ৬ দফা কর্মসূচী জাতির সামনে পেশ করেন, পূর্ণ-অর্থনৈতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে।[৩৬] বিশ বছরের একটানা বৈষম্যমূলক আচরণ, শোষণ বঞ্চনার তিক্ত অভিজ্ঞতাই বাঙালীদেরকে এমন বিশ্বাসে দৃঢ় করে যে, আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ ও সম্পদ পাচার প্রতিরোধ এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে পাকিস্তানী ক্ষমতা চক্র গালভরা প্রতিশ্রুতি প্রদান ছাড়া বাস্তবে আর কিছুই করবেন না। অন্য দিকে এ সময়ে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে তৎকালীন বাম-মধ্য-দক্ষিণ পন্থী সকল বিরোধী রাজনৈতিক দলই অংশ নেয়। তারা গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি গঠন করে ৮ দফার গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নামেন। ছাত্র সমাজ ও তাদের ঐতিহাসিক ১১ দফায় ও ৮ দফার অতিরিক্ত অর্থনৈতিক ও শ্রমজীবী শ্রেণী স্বার্থ ভিত্তিক প্রগতীশীল দাবী দাওয়া অন্তর্ভূক্ত করে আন্দোলনে প্রবল তরঙ্গ তোলে। তারা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বক্তব্যও এর মাধ্যমে জনসমক্ষে তুলে ধরে।[৩৭]

বিভাগোত্তর এক দশকে বাংলাদেশের আর্থ-উৎপাদনে কাঠামোতে প্রত্যাশিত গতি সঞ্চারিত না হলেও ভূমি নির্ভর বৃহত্তর জনগোষ্ঠী নিজ সম্পদের স্থবিরতা ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। ভূমি নির্ভর জনশ্রেণীর বৃহৎ অংশ আশ্রয় ও খাদ্যের সন্ধানে হয় নগরমুখী। পাকিস্তানের নব্য উপনিবেশবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক শাসন কাঠামো যে পুঁজিতন্ত্রের গোড়াপত্তন করে। অস্বাভাবিকতা সত্ত্বেও বৃহত্তর সমাজ পরিসরে তার আবেদন হয় সুদূরপ্রসারী। নতুন এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিজ্ঞানভিত্তিক হওয়ায় ধর্মীয় আবেদনও সেখানে হয়ে পড়ে গৌণ।[৩৮]

Dhaka University Institutional Repository



# গ. সামাজিক পটভূমি

বিভাগোত্তরকালে ভারত ও পাকিস্তানের হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং জনমানুষের মাঝে সামাজিক বিপর্যয় ঘটে। এ সময়ে উভয় দেশে প্রায় এক কোটিরও অধিক উদ্বাস্তুর আগমণ ঘটে। মানবতার এই অবস্থাকে একজন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে ব্যাপক ও দুঃখজনক অমানবীয় ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন।[৩৯]

১৯৪৯ সালের শেষে উদ্বাস্তুদের পশ্চিম বঙ্গে আগমণের হার কমে এলেও ১৯৫০ সালের শেষ দিকে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের কমিউনিস্টবিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে এ বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভবের ফলে খুলনা ও অন্যান্য জেলা থেকে ব্যাপকভাবে সশঙ্ক বাস্তুত্যাগীরা ভারতে এসে উপস্থিত হয়। অপর পক্ষে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে মুসলমান বাস্তুত্যাগীগণ নিরাপদ আশ্রয় লাভের উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানের দিকে যাত্রা করে। নদীয়া ও চব্বিশ পরগণা অঞ্চলের মুসলমানদের এই ব্যাপক বাস্তুত্যাগ ও পূর্ব পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট গুরুত্ব লাভ করে। এই সমস্যার সমাধান সূত্র হিসাবে পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তানের আশ্রয় গ্রহণকারী বাস্তুত্যাগীদের স্ব স্ব দেশে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু (১৮৮৯-১৯৬৪) ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের (১৮৯৫-১৯৫১) মধ্যে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্বাস্তুদের প্রত্যাবর্তন ও পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুনর্বাসনের চুক্তি সম্পাদন করে এবং ৮ এপ্রিল ১৯৫০ তারিখে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়।[৪০] উল্লেখিত সময়ে আসাম, বিহার, উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেক বাস্তুত্যাগী মুসলমান পূর্ব পাকিস্তানের বসবাসের উদ্দেশ্যে আগমন করে। তবে তাদের সংখ্যা কোনক্রমেই পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গের আগত উদ্বাস্তুদের সংখ্যাকে অতিক্রম করেনি।

পশ্চিমবঙ্গ বাস্তুত্যাগীদের পুনর্বাসন প্রয়াসকে সরকারী উদ্যোগ নিঃসন্দেহে সমস্যার গুরুত্ব অনুযায়ী ব্যাপক ও বিস্তারিত কর্মসূচীতে রূপান্তরিত হয়নি। সেহেতু বাস্তুত্যাগীদের নিজেদের প্রয়োজনেই কোলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে জীবিকার প্রয়োজনে, কখনো বা আশ্রয় লাভের উদ্দেশ্যে সমাধানের নিজস্ব পথ সৃষ্টি করে নিতে হয়েছে। বস্তুত, কলকাতার নাগরিক জীবনে এই বিপুল জনসমাবেশের ফলে বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব ঘটে ও তার সমাধান প্রয়াসে ব্যক্তি মানুষের মহিমা ক্ষুণ্ন হয়ে পড়ে। সামাজিক জীবনে টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়। কখনো কখনো পতিত জমিতে নতুন বসতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভূমি দখল, কখনো বা বিভিন্ন কারণে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। সর্বপরি জীবিকা নির্বাহে অনিশ্চয়তা এবং সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতার অপ্রতুলতায় অসামাজিক জীবন যাপনেও বাধ্য হয়েছে অনেকে। নারীত্বের অবমাননা, মানবিক সততার অবলোপ এবং মূল্যবোধের অবক্ষয়জনিত কারণে সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্ক শিথিল হয়ে

Dhaka University Institutional Repository


পড়ে। স্বাধীনতা উত্তরকালে অন্যান্য সমস্যার সঙ্গে দেশ-বিভাগজনিত এই পরিবেশে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনের বিকাশ নিদারুণভাবে ব্যাহত হয়েছে।[৪১]

বিভাগোত্তরকালে দেশ-বিভাগজনিত কারণে পূর্ববর্তী পরিবর্তনের ধারা বিশেষ গতিলাভ করে এবং ফলশ্রুতি স্বরূপ কলকাতা সমস্যাদীর্ণ এক নগরীতে রূপান্তরিত হয়। সমকালীন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, লেখক ও সমাজতত্ত্ববিদদের রচনা ও গবেষণাকর্মে তারই বিচিত্র প্রকাশ অবশ্য লক্ষণীয়। এ বিষয়ে অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়ের দৃষ্টিতে বিধৃত কলকাতার সমস্যা সকুল নিম্নোক্ত রূপটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভয়াবহ অভিজ্ঞতা ফলত বাসিন্দাদের জীবন যাত্রা বিপর্যস্ত এবং পরিণামে তাদের মনে অসহায় শুভ নাস্তিক্যের মনোভাব অত্যন্ত দৃঢ়মূল হয়ে উঠেছে। পঞ্চাশের মনন্তরের পর থেকে কোলকাতায় জনসংখ্যা হু হু করে বেড়ে চলেছে অথচ এদের বাস, আহার, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের জন্য আনুপাতিক বন্দোবস্ত সম্ভবপর হয়নি। ইতিমধ্যে দুর্ভিক্ষ এবং দাঙ্গার ফলে সাধারণ নীতিবোধ অত্যন্ত দুর্বল হয়ে এসেছে। ফলত প্রত্যয়হীন দায়িত্ববিমুখ, অবসিত বিবেক, সংখ্যাস্ফীত উগ্রপন্থী কোলকাতা শহরকে নিয়ে শুধু ভাবনা নয়, গভীর উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান।[৪২] এই পরিবর্তন শুধু গতানুগতিক সামাজিক পরিবর্তন নয়, একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন বলেও অভিহিত করেছেন একজন সমাজতত্ত্ববিদ।[৪৩] এই বৈপ্লবিক রূপান্তর, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জটিলতার ও নতুনতর পরিচয় তুলে ধরে। একটি সমাজিক-অর্থনৈতিক জরিপে কলকাতার সমস্যা সমূহে নতুন আর একটি দিকও প্রতিফলিত।[৪৪]

বাংলাদেশের ইতিহাসে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সমাজ-জীবনে উদ্বাস্তু সমস্যা এক করুণ ও কালিমালিপ্ত অধ্যায়ের সূচনা করে এবং পরবর্তীকালে ষাট দশক পর্যন্ত সেই জীবন যন্ত্রণার ইতিহাস ক্রমপরিবর্তনজাত এক নতুন তাৎপর্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এই তাৎপর্যের ক্ষেত্রে কলকাতার নগর রূপের বিচিত্র প্রকাশ অবশ্যই উল্লেখযোগ্য।[৪৫] সংগ্রাম রক্তপাত ও উজ্জীবনের মধ্য দিয়ে এ সময়ে বাংলাদেশের সামাজিক জীবনে এক অন্তঃশীলা পরিবর্তনের ধারা সৃষ্টি হয়। গণতন্ত্র মানববাদ ও প্রগতিশীল চেতনার ক্রমবিকাশ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জীবনে গত সঞ্চারের অনেকাংশে সক্ষম হয়। পাকিস্তানী প্রশাসন যন্ত্রের সমর্থনপুষ্ট সামন্ত মূল্যবোধে আক্রান্ত সুবিধাভোগী মধ্যবিত্তের সর্ববিধ প্রয়াস সত্ত্বেও নবজাগ্রত সচেতন মধ্যবিত্তের গতিশীল কর্মকাণ্ড বৃহত্তর সমাজ জীবনেও আলোড়ন সৃষ্টি করে।[৪৬] বস্তুত, তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য উপনিবেশ শৃঙ্খলিত রাষ্ট্র অপেক্ষা পাকিস্তান শাসিত বাংলাদেশের আর্থ-উৎপাদন কাঠামো ও জনজীবনরূপ ছিল স্বতন্ত্র ধারায় বহমান। ভাষা আন্দোলন ও ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশের নিস্তরঙ্গ গ্রাম জীবনেও সূচিত হয় ইতিবাচক আলোড়ন। উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মনন্তর, মহামারী, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উন্মুলিত আস্তিত্ব গ্রামীণ জনস্রোতের নগরমুখীতা, দেশ বিভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা প্রভৃতি এই ভূখণ্ডের জীবন-বিন্যাসকে করে জটিল ও দ্বন্দ্বময়। কিন্তু মন্থরভাবে হলেও

Dhaka University Institutional Repository


সামাজিক গতির অন্তঃশীলা প্রবাহ সমাজ বিকাশকে করে সম্মুখবর্তী ।[৪৭] তবে একটি বিষয় লক্ষণীয়, ১৯৭৪-এর পর থেকে প্রায় সপ্তম দশক পর্যন্ত বাংলাদেশের অধিকাংশ সাহিত্য গ্রামীণ উপাদান নির্ভর । অথচ গ্রাম জীবনের ও সমাজের বাস্তব সত্য তাকে উন্মোচিত হয়নি । উপন্যাসে বিচ্ছিন্নভাবে ধর্মীয় শোষণ, অর্থনৈতিক শোষণের কথা বলা হয়েছে । কিন্তু সব কিছু মিলে দেশ-কালের বৃহত্তর পটভূমিতে গ্রামজীবনের সামগ্রিক চিত্র অধিকাংশ উপন্যাসে প্রায় নেই ।[৪৮]

সাতচল্লিশের দেশভাগের পর সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালী জাতিসত্ত্বার পরিচয় নানাভাবে হতে থাকে বিকশিত বিবর্ধিত । পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলের সামন্তবাদ এবং আধা-উপনিবেশবাদী বুর্জোয়া শ্রেণী পূর্বাঞ্চলের মানুষের জাতীয়তাবাদী মনোভঙ্গি এবং আত্ম পরিচয়ের উপর আঘাত করে এবং সামাজিক-অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করতে থাকে । তার ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির নিজস্বতাও হতে থাকে স্পষ্টতর । এই সব বাস্তবা ১৯৪০-৭০ কালে নানা রূপান্তর লাভ করে ।[৪৯] বস্তুত, পাকিস্তান রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং কর্মসূচী ছিলো বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্খার পরিপন্থি । এদেশের মৃত্তিকাসংলগ্ন জীবন, সমাজবিন্যাস এবং আর্থ-উৎপাদন কাঠামো সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে পাকিস্তানী শাসকবর্গ নানাভাবে শোষণ করতে লাগলো পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় দুই বিরোধী চেতনায় বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী পৃথক অবস্থান গ্রহণ করে । একদিকে অবস্থান নেয় মুক্ত চেতনার অনুসারী, মানবতাবাদী, গণতন্ত্র ও মার্কসীয় চেতনাপুষ্ট নব্যশিক্ষিত প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণী, অন্যদিকে সামন্ত মূল্যবোধে বিশ্বাসী পাকিস্তানি প্রশাসন তথা বেনিয়া পুঁজিবাদী শক্তি আশ্রয়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণী ।[৫০] অর্থনৈতিক-সামাজিক জীবনের গুণগত পরিবর্তনহীনতা এবং রাজনৈতিক-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির পশ্চাৎপদতার ফলে বৃহত্তর জনজীবনে পাকিস্তানী জন্মলগ্নেই মোহভঙ্গের কারণ হলো ।[৫১] ১৯৪৭-১৯৫১ সময় প্রসঙ্গে পাকিস্তানশাসিত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে বহুবিধ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে । দেশ বিভাগের সময়কাল থেকেই বাংলাদেশের সর্বত্র খাদ্য সংকট দেখা দেয়, এই সংকট ১৯৪৯ সালের শেষ দিকে ব্যাপক অঞ্চলে বিস্তৃত হয় এবং ১৯৫১ সালে পুনরায় তা দুর্ভিক্ষের আকার ধারণ করে । দুর্ভিক্ষ,বন্যা, মহামারী, খাজনার নির্যাতন প্রভৃতি দুর্বিসহ করে তোলে জনজীবনকে । পাকিস্তান সরকারের ভ্রান্ত খাদ্যনীতির ফলে কর্ডন ও লেভির অত্যাচার বৃদ্ধি পেতে থাকে ক্রমাগত । বস্ত্র, কেরোসিন, ভোজ্য তেল প্রভৃতির মূল্যবৃদ্ধি ও দুষ্প্রাপ্যতা জনগণের সামগ্রিক অর্থনৈতিক জীবনকে করে তোলে বিপর্যস্ত । এর ফলে কৃষক জনতা পাকিস্তান সরকারের গণবিরোধী চরিত্র সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং তাদের মধ্যে একটা আন্দোলনের সম্ভাবনা দেখা দেয় ।[৫২] ফলে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে ওঠে অসংবদ্ধ ও অঞ্চল ভিত্তিক আন্দোলন । বাংলাদেশের বিকাশমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সূচনা থেকেই কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ষড়যন্ত্রমুলক চারিত্র উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় । নতুন রাষ্ট্রের শাসকবর্গ প্রথমে উপলব্ধি করতে

Dhaka University Institutional Repository


ব্যথ হয় যে, পূর্ব-পাকিস্তানেও একটি শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিদ্যমান, যারা সমাজের সম্ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির কাছে নিয়ত সত্তা বিলীন না করে বাংলা ভাষার রক্ষণ ও আধুনিকীকরণের জন্য প্রস্তুত।[৫৩] ফলে আর্থ-সামাজিক কাঠামোর স্বাতন্ত্র্যে পূর্ব-পাকিস্তানের অধিবাসীরা কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠই নয়, আত্মনিয়ন্ত্রণ-অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নেও সংগ্রামশীল হয়ে ওঠে।

বস্তুত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাংলাদেশের ভৌগলিক পরিবেশ ও জনজীবনের গভীরে ব্যাপকভাবে আঘাত হানে। যুদ্ধের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় কলকাতা ও বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের আদিবাসীদের জীবনও হয়ে ওঠে আলোড়িত। যুদ্ধের অভিঘাতে পূর্ববর্তী প্রচলিত সামাজিক ধ্যান ধারণা এবং মূল্যবোধ প্রবলভাবে নাড়া দেয়। যথাযথভাবে হয়ে পড়ে নিঃসঙ্গ, নিরবলম্ব প্রবল প্রতাপান্বিত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিনাশী প্রকাশ। এশিয়ার এবং বিশেষভাবে ভারতবর্ষীয় জীবনধারায় আনে অপ্রতিরোধ্য অমঙ্গল। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এই যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন শুধু ভৌগলিক মানচিত্রেরই পরিবর্তন সাধন করেনি মানুষের সামাজিক, সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এনেছে অপ্রতিরোধ্য পরিবর্তনের কালস্রোত। সেই স্রোতধারায় বাংলা সাহিত্যেও প্রকাশিত হয়েছে এক পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি ও নতুন জীবন দর্শন। ফলে, জীবনের বিপর্যস্ত মূল্যবোধ ও সমাজ মানসের বিকারগ্রস্থ প্রকাশ যেমন অনিবার্য হয়ে উঠেছে তেমনি জীবন সম্পর্কে নতুন চেতনা ও প্রকরণগত পরিবর্তনের পরিচয়ও হয়েছে বিধৃত।[৫৪]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিষ্ট শক্তির পরাজয় সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থা সংরক্ষণে নজিরবিহীন আত্মত্যাগ এবং দেশীয় অর্থনৈতিক সংকট বৃদ্ধি প্রভৃতি সম্পর্কে সচেতনতার ফলে সমাজতান্ত্রিক জীবনাদর্শের প্রতি বাংলাদেশের জনসাধারণ, বিশেষত মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর কৌতূহল জাগ্রত হয়। বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল, সংগঠন প্রভৃতির অভ্যন্তরে ও আন্দোলনে এ ভাবাদর্শ ক্রমশঃ প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়। পরবর্তীতে ১৯৫৬ ও ১৯৬৮ সালে বাংলাদেশের গোপন কমিউনিস্ট পার্টির যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠান, ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের দ্বিমুখী ধারার প্রভাবে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়নের দ্বিধা বিভক্তি ১৯৬৮-৬৯ এর গণআন্দোলনের চাপে জাতীয়তাবাদী নের্তৃবৃন্দের পাশাপাশি আটক কমিউনিস্ট নের্তৃবৃন্দের মুক্তি ও গণসম্বর্ধনা লাভ এবং ১৯৭১-এর সশস্ত্র জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে স্বাধীন বাংলাদেশের চারটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতির মধ্যে অন্যতম হিসেবে সমাজতন্ত্রের স্বীকৃতি লাভ করে।[৫৫]

Dhaka University Institutional Repository


# ঘ. সাংস্কৃতিক পটভূমি

দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মত সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও পাকিস্তানবাদী সামন্ত মূল্যবোধ আশ্রয়ী একাধিক সংগঠনের উদ্ভব ঘটে। এসব সংগঠনের মধ্যে 'পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস' অন্যতম। ৪৮-এর ভাষা আন্দোলনে ইতিবাচক ভূমিকা সত্ত্বেও প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এই সংগঠনের প্রভাব ছিল ক্ষীণ। ১৯৫৪ সালের পর এ সংগঠনের তৎপরতা সীমিত হয়ে পড়ে।[৫৬] পূর্ব পাকিস্তানে সাহিত্য সম্মেলন (৩১ ডিসেম্বর-১৯৪৮-জানুয়ারি-১৯৪৯) থেকেই বাঙালী সাহিত্যিক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার পরস্পর বিরোধী দু'টো ধারা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।[৫৭] এরই মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সম্মেলন। সম্মেলনে মূল সভাপতির ভাষণে আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৬৯-১৯৫৩) নতুন রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতিতে বাংলা ভাষা ও বাঙালী সংস্কৃতির প্রকৃতি, স্বরূপ ও অবস্থান নির্দেশ করেন। প্রতিক্রিয়াশীল মহল এ সম্মেলনের পেছনেও গুরুতর ষড়যন্ত্র প্রত্যক্ষ করেন। চট্টগ্রাম সম্মেলনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে কারণ। এ সম্মেলনে পূর্ববাংলার সাংস্কৃতির যথার্থ রূপরেখা সর্বপ্রথম নির্দেশিত হয়। যে সংস্কৃতি বাংলা ও বাঙালীর আবহমান ঐতিহ্যের ফলশ্রুতি।[৫৮] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রগতিশীল ছাত্র-ছাত্রীরা ১৯৫১ সালে 'সাংস্কৃতিক সংসদ' গঠন করে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময় প্রবাহে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল সংস্কৃতি চেতনা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে 'সংস্কৃতি সংসদ'।[৫৯]

ফলে, বাংলাদেশের ভাষা সাহিত্য ও সাংস্কৃতির বিরুদ্ধে পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক ও রক্ষণশীল শাসক শ্রেণীর আবহমান ক্রমশ তীব্রতর হতে থাকে। এর প্রতিক্রিয়ায় প্রগতিশীল সংগ্রামী চেতনার বিকাশও ঘটতে থাকে অব্যাহত গতিতে।[৬০] জাতীয় জীবনে প্রয়োজনবোধ থেকেই তৎকালে 'প্রগতি লেখক সংঘে'র জন্ম নেয়। 'পাকিস্তানী সাহিত্য সংসদ' বিভাগোত্তরকালের প্রগতিশীল সাহিত্য সংস্কৃতি ও শিল্প-চেতনার শূন্যতার পটভূমিতে সংস্কৃতি সংসদের কার্যক্রম কিছুটা গতি সঞ্চার করলেও তা মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমণ্ডলেই ছিল সীমাবদ্ধ। পাকিস্তানবাদী সংস্কৃতি প্রসারের অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ ও বুর্জোয়া উদার নীতি বিশ্বকামী শিল্প সাহিত্যিকদের বৃহত্তর পরিসরে সংঘটিত হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়।[৬১] এই পটভূমিতে পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের সময়, সমাজ ও রাজনীতি সচেতন সাহিত্য-শিল্পটা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে নব উদ্দীপনা ও গতি সঞ্চার করে।

১৯৪৮ সালে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক ও সামন্ত-আদর্শপুষ্ট শাসক শ্রেণী ও তাদের বাঙালী দোসররা বাংলা বর্ণমালা, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ১৯৪৯ সালের মধ্যে মাসে গঠিত বাংলা

Dhaka University Institutional Repository


পূর্বাভাস পরিলক্ষিত হয়।[৬২] ১৯৫২ সালে ২৬ জানুয়ারী তারিখে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন (১৮৯৪-১৯৬৪) ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় ঘোষণা করে 'উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'।[৬৩] ঐ ঘোষণার প্রচণ্ড আঘাতে রুদ্র রোষে জেগে উঠলো শৃঙ্খলিত বাংলার ছাত্র-শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। খাজা নাজিমুদ্দিন নিজেই বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। তাঁর বিশ্বাসঘাতকতায় প্রচণ্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। নাজিমুদ্দিনের স্বৈরাচারী ঘোষণার প্রতিবাদে ছাত্রসমাজ গ্রহণ করলো সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলার সংকল্প, গঠিত হলো সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ। ৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ তারিখে রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জনসভায় অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা প্রতিষ্ঠার দাবীতে ২১ ফেব্রুয়ারী প্রদেশব্যাপী এক সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানানো হয়।[৬৪]

গণশক্তির ভয়ে ভীত সন্ত্রস্থ সরকার, ২০ ফেব্রুয়ারী থেকে এক মাসের জন্য ঢাকা জেলার সর্বত্র ধর্মঘট, সভা, শোভাযাত্রা নিষিদ্ধকরে ১৪৪ ধারা ঘোষণা করেন। গ্রেফতার ও নির্যাতন সত্তেও ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ছাত্রদের শোগান মুখর মিছিল অগ্রসর হতে থাকলে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য পুলিশ ছাত্র মিছিলে গুলি চালায়। এতে বেশ কিছু ছাত্র মৃত্যুবরণ করেন। বস্তত, বাঙালীর এ আন্দোলন ছিল সাংস্কৃতিক আন্দোলন। এ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালী জাতি তার অস্তিত্বের মৌল সংকট অনুধাবনে যেমন সক্ষম হলো, তেমনি জনজীবনের বৃহত্তর পরিসরে ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী নবজাগ্রত চেতনার প্রসারও ঘটলো অনিবার্যভাবে।[৬৫]

ভাষা আন্দোলন পরবর্তী পাঁচ বছর বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ দ্বন্দ্ব জটিল চরিত্র অর্জন করলেও সাংস্কৃতিক জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বটে। ভাষা আন্দোলনের ফলে জাতীয় জীবনে যে নবচেতনার উন্মেষ ঘটে, বাংলাদেশের সচেতন শিল্পী সাহিত্যিকদের মধ্যে তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া হয় সুদুর প্রসারী। সামন্ত আদর্শ কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক কার্যক্রম অব্যাহত থাকলেও জনজীবনে তার আবেদন ক্ষীণ হতে থাকে ১৯৫৪ সালের ২৩ এপ্রিল থেকে ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত পাঁচ দিন ব্যাপী বাংলাদেশের প্রগতিশীল শক্তি প্রথমবারের মতো সুসংগঠিতভাবে 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করে।[৬৬] ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কাগমারিতে পুর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের যে কাউন্সিল অধিবেশন হয়। সেখানে একটি আন্তর্জাতিক মানের সাংস্কৃতিক সম্মেলনেরও আয়োজন করা হয়। রাজনীতির সঙ্গে সংস্কৃতির এই যোগসূত্র ছিল খুবই তাৎপর্য।[৬৭]

১৯৬৩ সালের ২২-২৮ সেপ্টেম্বর 'ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' উদযাপিত হয়। বিচিত্র অনুষ্ঠানমালার মধ্য দিয়ে জাতীয় সাহিত্য সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে যেমন তুলে ধরা হলো, তেমনি জাতি সত্তার আত্ম-আবিষ্কারের প্রেরণ উৎসও নির্দেশিত হয়। 'ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' সে'কালের সাংস্কৃতিক জীবনে একটি সাড়া জাগানো অনুষ্ঠান ছিল। প্রতিদিন হাজার হাজার লোক অকৃত্রিক কৌতুহল ও আগ্রহ নিয়ে প্রদর্শনী

Dhaka University Institutional Repository


দেখেছে, আলোচনা শুনেছে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপভোগ করেছে। তাদের আগ্রহের কারণ মূলত অনুষ্ঠানের উৎকর্ষ ও অভিনবত্বের জন্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও স্পর্তব্য যে, বাঙালী জাতীয়তাবাদের যে অস্ফুট বিকাশ শুরু হয়েছিল সে-কালে, তাই টেনে টেনে নিয়ে গেছে সবাইকে অনুষ্ঠানের দিকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেকালে যে ছাত্র-আন্দোলন চলছিল, তার অন্যতম প্রেরণা ছিল নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধ।[৬৮] ১৯৬৮ সালে জাতিসত্ত্বার রাজনৈতিক জাগরণ যখন সর্বব্যপ্ত গণআন্দোলনে রূপ লাভ করেছিল তখন শাসকচক্র বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনকে পুনরায় শৃঙ্খলিত করতে উদ্যোগী হয়। বাংলা ভাষা, বর্ণমালা ও বানান সংস্করণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন একটি উপসংঘ গঠন করে। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই ও মুনীর চৌধুরী-তাৎক্ষণিকভাবে এই প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেন। ৪২ জন সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ, শিল্পী ও সাংবাদিক একটি বিবৃতি দেন ১৯৬৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর।[৬৯] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ বিরাট প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে এবং শহরব্যাপী বিক্ষোভ মিছিল বের করে। সংস্কৃতি সংসদ বাংলা ভাষার বর্ণ বর্জনের প্রতিবাদে আয়োজন করে সাধারণ ছাত্র জমায়েত। সংস্কৃতি সংসদের প্রচার পত্রে বলা হয় "বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের পশ্চাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কার্যকরী। বাংলা ভাষার উপর এই আঘাতকে প্রতিহত করার জন্য আমাদের আজ প্রবল কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাতে হবে।[৭০] সংস্কারের প্রতি ব্যক্তি বিশেষের সমর্থন থাকলেও বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ছাত্র সংগঠন ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে-'পূর্ব পাকিস্তান নীহারিকা সংসদ', 'সংস্কৃতি সংসদ', 'ভৈরবের সাংস্কৃতিক পরিষদ' এবং আওয়ামী লীগ নেতা মাওলানা তর্কবাগীশও এ- প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেন। প্রস্তাবের সমালোচনা করেও অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়।[৭১] সরকার রোমান হরফ প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করলে তা-ও প্রতিবাদের সম্মুখীন হয়। ১৯৬৮ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর নজরুল একাডেমীতে বক্তৃতা প্রদানের সময় আইয়ুব খান জাতীয় ভাষা সৃষ্টির পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। পূর্ব বাংলায় এর প্রতিক্রিয়া হলো সুদূর প্রসারী। আইয়ুব খানের অভিন্ন ধর্ম, তমদ্দুন ও ভাষানীতির মধ্যে সচেতন ছাত্র নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষার জনগোষ্ঠির জাতি সত্ত্বা বিনাসের গভীর ষড়যন্ত্র লক্ষ্য করলেন। আঞ্চলিক সংস্কৃতির প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের এই মনোভাবের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ছাত্র ও সংগঠন ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রবল প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়।[৭২] ১৯৬৮ সালের ৬-৯ জুলাই ঢাকা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে 'লেখক সংঘ' পূর্বাঞ্চল শাখার উদ্যোগে 'মহাকবি স্মরনোৎসব'-এর আয়োজন করা হয়। উপমহাদেশের পাঁচজন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আল্লামা ইকবাল, মির্জা গালিব, মাইকেল মধুসুদন দত্ত এবং কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ও সৃষ্টির মূল্যায়নেই ছিলো ঐ উৎসবের লক্ষ্য। স্মরনোৎসবের প্রথম দিন ছিলো 'রবীন্দ্র দিবস'। অনুষ্ঠানে উপস্থাপিত প্রবন্ধ এবং আলোচনা থেকে পাকিস্তানবাদী আদর্শের গর্ভে জন্মলাভকারী লেখক সংঘের বিস্ময়কর রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়। এর কারণ, এ পর্যায়ে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উদার মানবতাবাদী ও প্রগতিশীল শক্তিসমূহের সুদৃঢ়

Dhaka University Institutional Repository


অবস্থানের ফলে অসৎ উদ্দেশ্যে গঠিত অনেক প্রতিষ্ঠানেও গুণগত পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ে। জীবন-জীবিকার প্রশ্নে আইউবি দশকের সূচনায় যারা ছিলেন আপোষকামী, পরবর্তী সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ঘটনাপ্রবাহ এবং জীবনবোধের মৌল আবেগের প্রতি স্বীকৃতি তাদের পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করেছে।"[৭৩] এ সময়কালে ঢাকা-রেডিও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। উনসত্তরের গণআন্দোলনের আগ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান রেডিও ও টেলিভিশনে রবীন্দ্র সঙ্গীত বা সাহিত্য প্রচার করা হয়নি। এ রকম প্রতিকূল অবস্থায় সমস্ত বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংস্থা বিশেষ করে ছায়ানাট, বুলবুল একাডেমী ও ঐক্যতান সমবেতভাবে রবীন্দ্র মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন করে। ঢাকা ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্সে তিনদিন ধরে এই অনুষ্ঠান হয়েছিল।[৭৪] ১৯৬২ সালে তৎকালীন সরকার নিয়োজিত হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্টকে কেন্দ্র করে ছাত্র-তরুণদের মধ্যে বিক্ষোভ আন্দোলন সূচিত হলে বিভক্ত মধ্যবিত্ত নেতৃত্বে পুনরায় ঐক্যের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। এ আন্দোলনের সাফল্যে শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিল হয়। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুব সমাজ নিজেদের শক্তি সম্পর্কে সচেতন হয় এবং জাতীয়তাবাদ আন্দোলনে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হয়। ফলে, আইউব খানের সামরিক শাসন প্রত্যাহার করে শাসনতান্ত্রিক সরকার গঠনে বাধ্য হল।[৭৫]

বস্তুত, বিভাগোত্তর কালে পাকিস্তানী বৈরী আচরণে পূর্ববাংলার মানুষের মধ্যে আচরিত শতশত বছরের ভাষাতাত্ত্বিক সমাজতাত্ত্বিক বিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক আদি-সংস্কৃতি চেতনায় তাদের উদ্বোধিত করেছে অস্তিত্বের সংগ্রামে। স্থানিক ভৌগলিক অবস্থান, জলবায়ু আবহাওয়া, ভূমি গঠনের স্বাতন্ত্র্যে কল্যাণ মহিমায় তাদের বাঙালী জাতি সত্তার উৎসমূলে ফিরিয়ে নিয়েছে। ঔপনিবেশিক এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসন শোষণে এ ভূখণ্ডের মানুষ তাদের সংগ্রামী জাতি চরিত্রে অন্যায়ের প্রতিবাদ করে জনগণের মুক্তির আশায় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছে।[৭৬] মূলত, পাকিস্তানের দুই অংশের মানবিক বন্ধন পুরোপুরি বিনষ্ট করে। ১৯৬৯-হয় গণআন্দোলন ও তৎসংলগ্ন ঘটনা প্রবাহ। ছাত্র-সংগঠন ও রাজনৈতিক দলসমূহ পূর্ণ সাংস্কৃতিক স্বাধীকারের পক্ষে বিভিন্নভাবে বক্তব্য উপস্থাপন করতে থাকে। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বাধীনতার মুক্তিসংগ্রামে রূপান্তরিত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে।

এই পটভূমির পর্যালোচনার মাধ্যমে একথা প্রতীয়মান হয় যে, বিভাগোত্তর বাংলাদেশের সমাজ জীবন প্রকৃতপক্ষেই পরিবর্তিত হয়েছে। এই পরিবর্তন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন কেন্দ্রিক। এই সময়েই পাকিস্তানের দ্রুত বিস্তার ঘটেছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে যন্ত্রশিল্পের প্রতি মানুষের একনিষ্ঠ আগ্রহ। মুলত মানুষ হয়ে উঠেছে আত্মকেন্দ্রিক, বস্তুনিষ্ঠ, আস্তিত্ববিলাসী ও অস্থির চিত্ত। সেহেতু সাহিত্যেও এই কাল প্রবাহের প্রভাব অভিব্যঞ্জিত ও সুদূরপ্রসারী হয়েছে।[৭৭] ফলে সমাজ ইতিহাসের পরিচয় লাভের

Dhaka University Institutional Repository


প্রয়োজনে দেশকালের পটভূমির প্রসঙ্গে আর্থ সামাজিক, রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পালাবদলের প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। সেই লক্ষ্য অর্জনে এই প্রয়াস দেশকালের পটভূমির এক সত্য স্বরূপ সন্ধান।

বঙ্গভঙ্গের ফলে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বাঙালী মুসলমানদের অগ্রযাত্রা ছিল আশাব্যঞ্জক। শিক্ষার দ্রুত প্রসার তাদের সাংস্কৃতিক জীবনেও এনেছিলো প্রাচাঞ্চল্য। "ফলে সঙ্গত কারণেই বঙ্গভঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায় অত্যন্ত মর্মাহত হয় এবং ব্রিটিশ রাজশক্তির ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে" [৭৮] এরই ধারাবাহিকতায় ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। " ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে পূর্ববাংলার মুসলিম তরুণ মানস আলিগড়ের সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে যেমন মুক্তি লাভের সুযোগ পায়, তেমনি প্রথাগত সামাজিক অচলায়তনের বিরুদ্ধে সজাগ ও সোচ্চার হওয়ায় সুদৃঢ় প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি খুজে পায়।"[৭৯] সেই সাথে সামাজিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমান সম্প্রদায়ের আগ্রহ বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। ফলে ইংরেজী শিক্ষার অনুকূলে মাদ্রাসা শিক্ষারীতির সংস্কারের ফলে নিম্নবিত্তের মধ্যেও শিক্ষার প্রসার ঘটে। নারী শিক্ষার ক্ষেত্রেই বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয়। "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে ব্যাপক বিপর্যয় সাধিত হয়, তার ফলে প্রথাগত সমাজ-কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গে বিধ্বস্ত হয় মানুষের মূল্যবোধ, প্রাক্তন ধ্যান ধারণা সংস্কার, বিশ্বাস, ব্রিটিশ কলোনী সৃজিত আধা-সামন্তবাদী সমাজের আস্থা উঠে যায় জনমানবের। পঞ্চাশের মনন্তর সীমাহীন দুর্ভোগের সঙ্গে সমাজ মানসে জন্ম দেয় রাজনীতিচেতনা।" [৮০] ফলে নব্য শিক্ষিত তরুণদের মাঝে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে সম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে। এ কারণে সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন তরান্বিত হয়ে ওঠে।

## তথ্য নির্দেশ ঃ


১। R,P,Dutta, India today, Peoples publishing house, Bombay, Second edition, 1949, P- 401.

২। শঙ্কর ঘোষ, স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ-১৯৭৫, পৃষ্ঠা-১৯৭।

৩। মুহম্মদ রেজাউল হক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা উপন্যাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-১৯৮৯, পৃষ্ঠা-১৪।

৪। মুহম্মদ রেজাউল হক, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৬।

৫। মুহম্মদ রেজাউল হক, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩।

৬। এ.কে.নাজমুল করিম, দি ডাইনামিক অব বাংলাদেশ সোসাইটি, নতুন দিল্লী, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা, ২৪১।

Dhaka University Institutional Repository



৭। এ.কে.নাজমুল করিম, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৪২।

৮। এ.এম.এ. মুহিত, বাংলাদেশ ঃ দি ইমার্জেন্সী অব এ নেশান, প্রথম প্রকাশ-১৯৭৮, পৃষ্ঠা-৭৪।

৯। এ.এম.এ. মুহিত, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১২০।

১০। এ.এম.এ. মুহিত, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১২১।

১১। বদরুদ্দিন উমর, পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, প্রথম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৭০,পৃষ্ঠা-৩৩২।

১২। আবুল কাশেম ফজলুল হক, মুক্তি সংগ্রাম, ৯ম পর্ব, ঢা.বি, ১৯৭২, পৃষ্ঠা-৪৫।

১৩। আবুল কাশেম ফজলুল হক, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-৪৭।

১৪। ফরিদা সুলতানা, বাংলাদেশের উপন্যাসে জীবন চেতনা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৯, পৃষ্ঠা-১২৮।

১৫। মুস্তফা নূরউল ইসলাম (সম্পাদিত) বাঙালীর আত্ম পরিচয়ের সন্ধানে, ঢাকা, ১৯৯১, পৃষ্ঠা-২২৫।

১৬। ফরিদা সুলতানা, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-১৩০।

১৭। আব্দুর রহিম ও অন্যান্য সম্পাদিত, বাংলাদেশের ইতিহাস, ঢাকা-১৯৮৭, পৃষ্ঠা-৬২৫, ৬৩৫।

১৮। সরদার ফজলুল করিম, চলিশের দশকের ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-৬০-৬৮।

১৯। রজনী দাস দত্ত, আজিকার ভারত ('India To-day' গ্রন্থের পরিমল চট্টোপাধ্যায়কৃত অনুবাদ) ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ-১৯৪৮, পৃষ্ঠা-৪।

২০। কামরুদ্দিন আহমদ, পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি, স্টুডেন্টস পাবলিকেশন্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-১৩৭৬, পৃষ্ঠা-৫০।

২১। কামরুদ্দিন আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৯৪-৯৫।

২২। কামরুদ্দিন আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৯৫।

২৩। কামরুদ্দিন আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৯১।

২৪। সুকুমার বিশ্বাস, বাংলাদেশে নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা,বাংলা একাডেমী,ঢাকা,প্রথম প্রকাশ-১৯৮৮,পৃষ্ঠা-২১৮-১৯।

২৫। কামরুদ্দিন আহমদ, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-১২৭।

২৬। কামরুদ্দিন আহমদ, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-১২১।

২৭। Kamruddin Ahmed, A soicio Political History of Bengal and the Birth of Bangladesh, Inside Library, Dhaka, Fourth Edition-1975, Page-200.

২৮। সৈয়দ আকরম হোসেন, বাংলাদেশের উপন্যাস ঃ চেতনা প্রবাহ ও শিল্প জিজ্ঞাসা প্রসঙ্গ, বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-১৯৮৫, পৃষ্ঠা-১৬।

Dhaka University Institutional Repository



২৯। কামরুদ্দিন আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৪৬।

৩০। রফিকউল্লাহ খান, বাংলাদেশের উপন্যাস ঃ বিষয় ও শিল্পরূপ, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৭, পৃষ্ঠা-২৮।

৩১। আমিনুর রহমান সুলতান, বাংলাদেশের উপন্যাস ঃ নগর জীবন ও নাগরিক চেতনা, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ-২০০৩, পৃষ্ঠা-২২।

৩২। আমিনুর রহমান সুলতান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২২।

৩৩। সেলিম জাহান, অর্থনৈতিক কড়চা সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৬, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১২৪,১২৫।

৩৪। এস.এম. নারায়ণ, পূর্ববাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য (১৯৪৭-৭১) জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-১৯৮৬, পৃষ্ঠা-২৯।

৩৫। বদরুদ্দিন ওমর, পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, প্রথম খণ্ড, ১৯৭০, পৃষ্ঠা-১২১।

৩৬। বদরুদ্দিন ওমর, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১২২,১২৩।

৩৭। বদরুদ্দিন ওমর, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৫৬।

৩৮। কামরুদ্দিন আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৫৮।

৩৯। Gunnar Myrdal, Asain Drama, Vol-1 Random House, New York, Second, 1968, Page-241.

৪০। হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, উদ্বাস্তু, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-১৯৭০, পৃষ্ঠা-৭৮।

৪১। মুহম্মদ রেজাউল হক, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৪।

৪২। শিবনারায়ণ রায়, নায়কের মৃত্যু, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬০, পৃষ্ঠা-৫৮।

৪৩। বিনয় ঘোষ, কলকাতার সমাজ, মেট্রোপলিটন মন, মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ, ওরিয়েন্ট লংসম্যান লিঃ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-২০৯।

৪৪। S.N. Sen, The City of Calcutta, Bookland private Ltd., Calcutta, First Edition,1960, Page-251.

৪৫। শিব নারায়ণ রায়, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-৪৬।

৪৬। রফিকউল্লাহ খান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫৪।

৪৭। রফিকউল্লাহ খান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১১৬।

৪৮। শাহিদা আখতার, পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার উপন্যাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-১৯৯২, পৃষ্ঠা-৮৪।

৪৯। ফরিদা সুলতানা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৫।

৫০। সুকুমার বিশ্বাস, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬৮-৬৯।

৫১। রণেশ দাস, উপন্যাসের শিল্পরূপ (১৯৫৯), পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ ১৯৭৩, ঢাকা, পৃষ্ঠা-২০৫।

৫২। বদরুদ্দিন ওমর, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪।

৫৩। কামরুদ্দিন আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৯৬।

Dhaka University Institutional Repository



৫৪। মুহম্মদ রেজাউল হক, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩।

৫৫। মুহম্মদ ইদ্‌রিস আলী, বাংলাদেশের উপন্যাসে মধ্যবিত্ত শ্রেণী, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ-১৯৮৫, পৃষ্ঠা-৬৬।

৫৬। সাঈদ-উর রহমান, পূর্ব-বাংলার সমাজ ও রাজনীতি এবং কবিতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ-১৯৮৩, পৃষ্ঠা-৩।

৫৭। বদরুদ্দিন উমর, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৯২।

৫৮। রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশ আন্দোলনের সাংস্কৃতিক পর্যায়, ঢা.বি. পত্রিকা, ৪র্থ সংখ্যা, ১৯৭৬, পৃষ্ঠা-১৯২, ৯৩।

৫৯। রফিকুল ইসলাম, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-১৯৩।

৬০। রফিকুল ইসলাম, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-১৯২।

৬১। সাঈদ-উর রহমান, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-২৮।

৬২। বদরুদ্দিন উমর, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৭৫।

৬৩। বদরুদ্দিন উমর, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১২০।

৬৪। কবির উদ্দিন আহমদ, একুশের ইতিহাস, ২১ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩ সম্পাদক হাসান হাফিজুর রহমান, পুঁথিপত্র প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-২১৩-২১৪।

৬৫। একুশের ইতিহাস, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-১২।

৬৬। সুকুমার বিশ্বাস, বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-১১৯।

৬৭। রফিকউল্লাহ খান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫৪।

৬৮। বদরুদ্দিন উমর, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-৮৩।

৬৯। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিলপত্র, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৭০-৭১।

৭০। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিলপত্র, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৭২।

৭১। সাঈদ-উর রহমান, পূর্ববাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১০৯।

৭২। রফিকউল্লাহ খান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১০৯।

৭৩। রফিকউল্লাহ খান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১০৯-১১০।

৭৪। রফিকুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৮৬।

৭৫। মুহম্মদ ইদরিস আলী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪৯।

৭৬। ফরিদা সুলতানা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭৪।

৭৭। মুহম্মদ রেজাউল হক, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২১।

৭৮। রফিকউল্লাহ খান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৩।

৭৯। রফিকউল্লাহ খান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৫।

৮০। রফিকউল্লাহ খান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২২।

Dhaka University Institutional Repository


# তৃতীয় অধ্যায়

## বিভাগোত্তর বাংলা কথা-সাহিত্যে
## তিনজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও তাদের রচিত গল্প-উপন্যাস

Dhaka University Institutional Repository


# সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

## উপন্যাস

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ 'লালসালু' উপন্যাসের উপকরণ হিসেবে পশ্চাৎপদ গ্রামীণ সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাঠামো লালিত জীবনকে নির্বাচন করেছেন। কাহিনীতে এমন কোন উত্তাল গতি নেই, যা-পাঠককে রুদ্ধ-নিঃশ্বাসী মগ্নতা দান করতে পারে। চরিত্রের উজ্জ্বলতা পরিপূরক হিসেবে কাহিনীর এই অভাব পূরণ করেছে। এ প্রসঙ্গে ডক্টর রফিকউল্লাহ খান বলেছেন–"অস্তিত্ব বিষয়ে নিশ্চেতন একটি মহব্বতনগর গ্রামের জনগোষ্ঠীর সমান্তরালে একজন মজিদের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার নেতিবাচক রূপের অন্তর্ময় বিন্যাসে এ-উপন্যাস হয়ে উঠেছে দেশ-বিভাগকালীন বাংলাদেশের জীবন ও মনোবাস্তবতার ঔপন্যাসিক শিল্পরূপ।"[১]

এ-উপন্যাসে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ অস্তিত্বগ্রাসী আর্থ-সামাজিক কাঠামোর সতর্ক পটভূমিকায় মজিদ চরিত্র অঙ্কন করেছেন। মজিদ শোষণ-মূলক ও শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের প্রতিক্রিয়াজাত এক অব্যর্থ ও অনিবার্য সৃষ্টি। মজিদ ধর্মভয় ও মাজারভীতিকে ব্যবহার করে সমগ্র মহব্বতনগরকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু মজিদের সংস্কার অনুশাসন প্রত্যাখান করে তার অস্তিত্বের গভীরেই ভয় ও পরাভব চেতনা সঞ্চার করেছে জমিলা।

'লালসালু'র কাহিনী ও চরিত্র বিশ্লেষণের গভীরতা এবং আন্তরিকতা কবিত্বে ও সুষমায় সুরভিত। কাব্যধর্মী ভাষার সাবলীলতা পাঠকের মনকে আকর্ষণ করে। লেখকের এ জীবন অনুভাবনা স্বচ্ছ রূপরেখায় সুচিহ্নিত না হলেও তীক্ষ্ম গভীরতায় অন্তস্পর্শী। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্'র 'চাঁদের অমাবস্যা' (১৯৬৪) মফস্বল শহর ও আধা-গ্রামের পটভূমিতে রচিত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এই উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্র একদিকে যেমন একটি প্রতীকী-ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে তেমনি আধুনিক অস্তিত্ববাদী জীবনবোধের আলোকে উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্র বিকশিত হয়েছে। এ-উপন্যাসের কাহিনীসূত্র সংক্ষিপ্ত হলেও ঘটনাপ্রবাহ ও মানসিক দ্বন্দ্ব উপন্যাসের কাহিনীকে বিস্তৃতি এনে দিয়েছে। 'লালসালু' উপন্যাসের চরিত্রগুলো গ্রামীণ মানসিকতার উর্ধ্বে উঠতে পারেনি। কিন্তু 'চাঁদের অমাবস্যা'র চরিত্রগুলো ও প্রতিবেশকে আধুনিক জীবনবোধ স্পর্শ করে যায়। আরেফ আলীর চরিত্রসহ একাধিক চরিত্র বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। ডক্টর সৈয়দ আকরম হোসেনের মূল্যায়ন এ ক্ষেত্রে স্মরণীয়–"লালসালুর বহির্বাস্তব, 'চাঁদের অমাবস্যা'য় ক্রমশ ব্যক্তিমনের জটিল অভিজ্ঞতার অন্তর্গত।"[২] এ-উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র আরেফ আলী আধুনিক নগরজীবনবোধে মানসিকতায় দ্বিধান্বিত হয়ে উঠেছে। আর এই বোধ সৃষ্টি হয়েছে অনুশোচনা থেকে। খুনী কাদেরের সাথে যুবতী নারীর মৃতদেহ বাঁশঝাড় থেকে সরিয়ে নদীতে ফেলায় আরেফ নিজেকে ক্ষমা করতে পারেনি। এই যন্ত্রণাকাতরতা থেকে সে মুক্তি পেতে চেয়েছে। আর এই দ্বিধান্বিত মুক্তি প্রয়াস আরেফ আলীর চরিত্রের মধ্য দিয়ে সমাজ বিকাশের জীবন রূপটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে ডক্টর রফিকউল্লাহ খানের

Dhaka University Institutional Repository


মূল্যায়ন স্মরণীয় ঃ "এই উপন্যাসের নায়ক যুবক শিক্ষক আরেফ আলীর ব্যক্তি পরিচয়, অভিজ্ঞতা লোক, আত্ম-জিজ্ঞাসা ও সত্য সন্ধানের মধ্য দিয়ে একটা কালে সমষ্টি অস্তিত্বে সমগ্ররূপ উন্মোচিত হয়েছে।"[৩] আরেফ আলীর চরিত্রটি লেখক আধুনিক জীবনবোধের সমন্বয়ে চিত্রিত করেছেন। ফলে পরান্নভোগী ও পরাশ্রয়ী হয়েও আরেফ আলী স্বাধীন ইচ্ছার পথে পা বাড়িয়েছে। চৈতন্য উপলব্ধিতে সত্য প্রকাশের জন্য। বস্তুত, নাগরিক মানসিকতায় সামাজিক মূল্যবোধের যে রূপান্তর ঘটেছে এই উপন্যাসে, তা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র বাস্তব সত্যে তুলে ধরেছেন।

'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসের সমগ্র অবয়বে অস্তিত্ববাদী জীবনদর্শনের ছায়া সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উপন্যাসে কোন সুসংবাদ কাহিনী নেই ; প্রতি মুহূর্তের অনুভূতি এবং আত্মোপলব্ধি এই উপন্যাসের বিষয়। মানস জটিলতাকে প্রকাশ করতে গিয়ে লেখক সার্থকতার সঙ্গে ভাবানুযায়ী ভাষা প্রয়োগ করেছেন। বিশ্লেষণের রহস্যভরা আকর্ষণ প্রতীকের যথার্থ ব্যবহার এবং পরিবেশ উপযোগী শব্দব্যবহার উপন্যাসে সার্থকতা এনেছে। বাংলাদেশের উপন্যাসের ক্ষেত্রে 'চাঁদের অমাবস্যা' একটি নতুন পরীক্ষণ।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসটি নদীপথে স্টিমারে যাত্রা কালে কথক 'আমি' এবং কথক তবারক ভূইঞার একদিনের সময়কালের বর্ণনার মধ্যদিয়ে রচিত হলেও কাহিনীর সময়ক্রম বর্তমান থেকে সুদূর অতীতের আশি বছর তাদের পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত প্রসারিত। এ-উপান্যাসে ভাবানুষঙ্গ যেমন জটিল তেমনি এর দৃষ্টিকোণ প্রয়োগও পূর্ববর্তী উপন্যাস থেকে স্বতন্ত্র ও অভিনব। এ-উপন্যাস সম্পর্কে ডক্টর রফিকউল্লাহ খানের অভিমত স্মরণীয় ঃ "কেন্দ্রীয় চরিত্র নয়, লেখকের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিকোণ এবং তবারক ভূইঞার নিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষণ বিন্দু যুগ্মভাবে একে অপরের মাঝে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তাদের অনুচ্চারিত ও উচ্চারিত বাক্যস্রোতে রীতিমত একটি নদীর ধারায় পরিণত হয়। এখানেই 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপকরণ উৎস নিহিত।"[৪] এ-উপন্যাসের প্লট বিন্যাস ও চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রে শিল্প অভিজ্ঞতার অধিকতর প্রাগ্রসরতা লক্ষ্য করা যায়।

'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসের শিল্পরূপ প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রথা অতিক্রমী। এমন কি নিজের পূর্ববর্তী উপন্যাস সমূহকেও অতিক্রম করে গেছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌। জীবনের বস্তু কাঠামোর সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক ও সম্পর্কহীনতার প্রতীকী তাৎপর্যে খতিব মিঞা এবং মুহাম্মদ মুস্তফার বিন্যাস ঐ গভীরতার সত্যের ইঙ্গিতবাহী। বাকাল নদীর কান্নার সঙ্গে আতঙ্কিত। দীর্ঘ শূন্য অস্তিত্বময় ও উজ্জীবনকামী একীভূত 'কাঁদো নদী কাঁদো'র শিল্পরূপের একান্ত বৈশিষ্ট্য। চেতনাপ্রবাহ রীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রেও এ উপন্যাস স্বতন্ত্র বিশ্লেষণ দাবী করে। এ প্রসঙ্গে ডক্টর রফিকউল্লাহ খানের উক্তি স্মরণীয় ঃ 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসের অন্তর্ময় স্বাগত কথনরীতির ব্যবহার অনেকাংশে একাধিক দৃষ্টিকোণের ব্যবহার, অতীত ও বর্তমানের অন্তর্বয়নের মধ্য দিয়ে ঘটনার অগ্রগতি, চরিত্র-ভূমিকায় অবস্থান বদল প্রভৃতি বিচারে 'কাঁদো নদী কাঁদো' বোকটের

Dhaka University Institutional Repository


শিল্পরীতির সন্নিকটবর্তী। বিশেষ করে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষামান মালোন চরিত্রের সঙ্গে মুহাম্মদ মুস্তফার সাদৃশ্য উল্লেখযোগ্য। কিন্তু মালোন-এর বর্তমান উপস্থাপনের ক্ষেত্রেই কেবল অন্তর্ময় স্বাগত কথনমূলক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে তার বহুমুখী মূলত বর্ণনাত্মক ; কিন্তু সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ 'কাঁদো নদী কাঁদো'র আঙ্গিক সম্ভাবনাকে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত করেছেন।"[৫]

ঔপন্যাসিক বাঁধা-ধরা উপন্যাসের কাহিনী বিন্যাস রীতিতে এ-উপন্যাস রচনা করেন নি। কাজেই এর কাহিনী, পরিচর্যা এবং বিশ্লেষণ ভিন্ন প্রকৃতির। বিশ্লেষণের অভিনবত্ব, কাহিনী-বিন্যাসের জটিল নৈপুণ্য, চরিত্রাঙ্কনের সাংকোচিকতা এবং আবহ সৃষ্টির সুকৌশল এ-উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। 'কাঁদো নদী কাঁদো' বাংলাদেশের উপন্যাসের ক্ষেত্রে আর একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

## ছোটগল্প

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র ছোটগল্পে একটি স্পষ্ট ও স্বতন্ত্র শিল্পরূপ পেয়েছে। তিনি তাঁর ছোটগল্পে সমকালীন সমাজ ও রাষ্ট্র মানসের ঘটনাতে আলোড়িত হয়ে নিজস্ব সমাজ ও সমাজ আশ্রিত মানুষের জীবন-জিজ্ঞাসা রূপায়ণে যথেষ্ট আন্তরিক হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আজহার ইসলাম লিখেছেন–"তার বিষয়বস্তুর অনিবার্য আহরণ ঘটেছে বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জের সাধারণ মানুষের জীবনবৃত্তে লালিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংঘাত, অপরাধ, লোভ–লালসা–ভণ্ডামী ভরা বিচিত্র বৃত্তীয় চাহিদার তীক্ষ্ম অনুভব থেকে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের বিভিন্ন 'থিওরী' ও 'ইজমে'র ধারণায় সমৃদ্ধ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র মনন ও মানসিকতায় এই স্বদেশ–অন্বেষা তাঁর গল্প-উপন্যাসের চিত্র-চরিত্রকে করেছে অসাধারণ জীবন্ত ও অকৃত্রিম। তাই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র কথা সাহিত্যের অভ্যন্তর থেকে বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের বিচিত্র পেশার মানুষগুলো এমন অবলীলায় আত্মপ্রকাশ করেছে, ঘোষণা করেছে নিজেদের চারিত্র্যিক স্বাতন্ত্র্য। এক কথায় স্বদেশের অন্তর্লোকে প্রবেশ করেছেন বলেই তাঁর শিল্প-নির্মাণ সার্থক হয়েছে।"[৬] বস্তুত, অনিবার্যভাবেই তাঁর মননে বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের শেকড় অক্ষুণ্ন ও অবিচল রয়ে গেছে ; পাশ্চাত্যের কোন প্রভাবই তার সেই অনুভবের ভূমি স্পর্শ করতে পারেনি।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র 'নয়নচারা' গল্পগুলোতে মনোসমীক্ষণজাত শিল্পকৌশলের ছাপই বেশী। তাঁর 'নয়নচারা' গল্পে মানবসত্তার অন্তর্বিশ্লেষণের বাইরে বাংলাদেশের জীবন ও পরিপার্শ্বকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে অবলোকন করেছেন। এ-গ্রন্থের 'জাহাজী' 'পরাজয়' 'মৃত্যুযাত্রা' 'খুনী' 'রক্ত' 'খণ্ড চাঁদের বক্রতায়' 'সেই পৃথিবী' প্রভৃতি গল্পে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছে। সমকালীন সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট তার গল্পসমূহে সুস্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository


সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ 'নয়নচারা' গল্পসমূহের বিষয়বস্তু নির্বাচন ; চরিত্রায়ণ ও ভাষাশৈলী সৃষ্টিতে সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি এ গ্রন্থের অধিকাংশ গল্পেই মানুষের অন্তর্জীবনের দ্বন্দ্ব আর সংঘাতকে অধিবাস্তবতার শিল্প ভাবনায় রূপ দিয়েছেন। বাংলা ছোটগল্পের ধারায় তিনি যে শিল্পকৌশল তৈরী ও ব্যবহার করেছেন তা সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব। তাঁর 'নয়নচারা' পর্যায়ের গল্পগুলো পূর্ববর্তী গল্পসমূহের তুলনায় বহুপ্রসারিত মানবিক ও তাঁর প্রাগসর মেধার মতোই শিল্প সমৃদ্ধ, বৈচিত্র্যময় ও শিল্প সফল। 'নয়নচারা' পর্যায়ের গল্পসমূহে লেখকের আধুনিক শিল্পকলার নানাবিধ বৈশিষ্ট্যের সংযোগে সৃষ্ট হওয়ায় একটি স্বতন্ত্র শিল্প মহিমা সৃষ্টি হয়েছে। এর অধিকাংশ গল্পেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র নিজস্ব শিল্পীসত্তার বিকাশ ঘটেছে।

সৈয়দ ওয়ালীউলাহ্র 'দুইতীর অন্যান্য গল্প' (১৯৬৫) গ্রন্থের গল্পসমূহের অন্তর্বয়ন, পরিচর্যা সংগঠনেও তিনি সতর্ক যত্নশীল ও পরীক্ষা প্রবণ। এ পর্যায়ের অধিকাংশ গল্পের চরিত্রসমূহে বিবিধ বিচ্ছিন্নতা-চেতনায় আচ্ছন্ন হওয়ায় গল্পের আভ্যন্তর পরিচর্যায় এসেছে উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য, স্বতন্ত্র রীতি ও কৌশল। এ গ্রন্থের 'দুইতীর', 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' 'পাগড়ী', 'কেয়ারা', 'নিষ্ফল জীবন নিষ্ফল যাত্রা', 'গ্রীষ্মের ছুটি' 'মালেকা', 'স্তন' ও 'মতিউদ্দিনের প্রেম' প্রভৃতি গল্প ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৯ সালের মধ্যে রচিত। এ গ্রন্থের গল্পগুলোতে বিভাগোত্তর কালের সমাজ সংকট, বিচ্ছিন্নতাবোম ও নৈঃসঙ্গ্য চেতনা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

'দুইতীর অন্যান্য গল্প' গ্রন্থের প্রথম গল্প 'দুইতীর'-এ বিচ্ছিন্ন চেতনা শব্দরূপ পেয়েছে আফসার উদ্দিন ও তার স্ত্রী হাসিনার দাম্পত্য জীবনের মাধ্যমে। 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী'তেও ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতাবোধ স্পষ্ট। 'পাগড়ি' গল্প পৌঢ় খানবাহাদুর মোত্তালেব সাহেবের নিঃসঙ্গতাবোধ, তাঁরই জীবনকে পদে পদে সম্পূর্ণভাবে উপভোগ আকাঙ্খার রূপকল্প। 'কেয়ারা' গল্পে লেখক মজিদের জীবন বাস্তবতার মাধ্যমে মানবমনের শাশ্বত উপলব্ধিকে শিল্পরূপ দান করেছেন। 'নিস্ফল জীবন নিস্ফল যাত্রা' বৃদ্ধ সদর উদ্দিনের অস্বভাবী মনস্তত্বের গল্প।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র এ পর্বের গল্পসমূহের ভাষা ও রচনাশৈলী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও অন্তঃস্বারময় শব্দ-উপমা-উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার, বাক্যের প্রকরণগত শৃঙ্খলায় বিন্যস্ত হয়েছে। এ গ্রন্থে তাঁর সমাজ-চেতনা ও জীবন চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। যুদ্ধোত্তর ক্রান্তিকালের সামাজিক-অর্থনৈতিক ও আত্ম-অস্তিত্বের সংকট অস্তিত্ব সমাজ-জীবনের প্রতিচ্ছবি তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। ফলে সে সময়ের নগরকেন্দ্রিক জীবনাচারের কদর্যতা, সংকীর্ণতা ও জীবন-সংগ্রামের চিত্র যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি স্মৃতি সূত্রে গ্রাম, গ্রাম্য জীবনের অস্থিরতা, হতাশা ও হাহাকার জীবন অবয়বে উপস্থাপিত হয়েছে। অল্প-শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন সংগ্রাম ও সামাজিক তরঙ্গ সঙ্কুলতা লেখক এ পর্যায়ের গল্প সমূহকে তুলে ধরেছেন। ফলে, কাল্পিক চরিত্র ও বাস্তব কাহিনী তাঁর গল্পে অনায়াসে নির্মিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বিভাগ পরবর্তী সময়ের সমাজের অস্থিরতা ও স্থবিরতা মধ্যেও অদম্য চাঞ্চল্য, পরিবর্তনশীলতা আবিষ্কার করেছেন, সে চাঞ্চল্য যেমন সমাজ পরিসরে তেমনি ব্যক্তি মানসলোকেও ফুটে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository



# ২. আলাউদ্দিন আল আজাদ

## উপন্যাস

ষাটের দশকের বাংলাদেশের নারী জীবনের ব্যক্তি প্রেমের মূল্যবোধ ও বিকৃতি এই দুই ভিন্ন চিত্রের জীবনকে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টি চেতনায় আলাউদ্দিন আল আজাদ তাঁর 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। এটি লেখকের বিশ্লেষণমূলক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। এ উপন্যাসে কাহিনীর দীর্ঘায়িত ব্যপ্তি বর্ণনার অনাবশ্যক বিস্তার ও চরিত্রের বিচিত্রতা নেই। মানসিক জটিলতার বক্রপথে টেনে নিয়ে উপন্যাসে জীবনচিত্র অঙ্কন করেছেন। শিল্পী জাহেদ ও তার স্ত্রী ছবির প্রেম, দাম্পত্য ও অন্তর্দ্বন্দ্বের টানপোড়েনের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' উপন্যাসে। ইতিবাচক মীমাংসায় এ উপন্যাসের সমাপ্তি হলেও চিত্র রচনা ও পরিচর্যায় ঔপন্যাসিকের ফ্রয়েডীও অনুধ্যানের পরিচয় পাওয়া যায়।

আলাউদ্দিন আল আজাদ তাঁর 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' উপন্যাসে নগর জীবনের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রেমের স্বরূপ সন্ধানে যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ ও মনোবিকলন তত্ত্বের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন, তা ব্যক্তি জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার পটে বিধৃত। এ-উপন্যাসে জাহেদ শিল্পীসুলভ উদারতা ও মহত্ত্বের আলোকে ছবিকে ক্ষমা করে, তাদের অন্তর সংঘাতের যন্ত্রনায় বিক্ষত প্রেমকে অস্তিত্বশীল করে তুলেছে। বস্তুত, এ-উপন্যাসে লেখক প্রেম সংক্রান্ত জিজ্ঞাসা ও মীমাংসার সুত্র আবিষ্কার করেছেন।

এ উপন্যাসে শিল্পী জাহেদ, স্ত্রী ছবি, জামিল ও তার পত্নী অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত। লেখক সাবলীল ও বিশ্লেষণাত্বক ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে অধিকতর হৃদয়গ্রাহী করে ফুটিয়ে তুলেছেন। বাংলাদেশের উপন্যাসের ইতিহাসে 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' আধুনিক ব্যক্তিত্ব নির্ভর বলিষ্ঠতাই উত্তোরণ কালের প্রতিভূ সৃষ্টি রূপেই পরিগণিত হয়।

আলাউদ্দিন আল আজাদ 'শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন' উপন্যাসে সাঁইত্রিশ বছরের বিগত যৌবনা বিলকিস বানুর নিঃসঙ্গ, কামনাতাড়িত, যন্ত্রণাদগ্ধ মানসরূপ অঙ্কন করেছেন। প্রেমহীন দাম্পত্য জীবনে অনিচ্ছার ফসল দুই সন্তান খোকন ও পারভীনকে নিয়ে তার সংসার। স্বামীর মৃত্যুর পর এক নির্বিকার আবেগহীন জীবনযাপন করে। দরিদ্র খালাতো বোনের ছেলে কামালের পড়া-লেখার সুযোগ করার জন্য সে নিজের বাড়ীতে নিয়ে আসে কামালকে। অতঃপর তার 'শীতার্ত যৌবনে জাগে অকাল বসন্তের উন্মাতাল কামনা'। পারভীন-কামালের বিবাহ পুর্ব ঘনিষ্ঠতার প্রেমময় প্রকাশ প্রত্যক্ষ করে দগ্ধীভূত হয় বিলকিসের নিঃসঙ্গ অন্তর্লোক। ঔপন্যাসিক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বিলকিসের জটিল চৈতন্যপ্রবাহকে উপস্থাপন করেছেন। আলাউদ্দিন আল আজাদ এ-উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের হ্যাঁ-অর্থক জীবনবোধে উত্তরণের আকস্মিকতায় একটি সম্ভাবনাময় শিল্পের যেন অপমৃত্যু ঘটেছে। তবে লিবিডোর গোপন পিচ্ছিল অন্ধকার

Dhaka University Institutional Repository


থেকে বেরিয়ে এসে বিলকিসের অবস্থান নিঃসন্দেহে ঔপন্যাসিকের ইতিবাচক জীবন চিন্তার পরিচয়বাহী। এ-উপন্যাসে বিচিত্র জটিল মানসিকতার সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন। তবে এ উপন্যাসে কাহিনীর গভীরতা আছে কিন্তু প্রসারতা নেই। চরিত্রগুলো মনস্তাত্তিক জটিলতায় আবর্তিত। ভাষা ব্যবহারে চরিত্রের অনুগামিতা রক্ষিত হয়েছে।

আলাউদ্দিন আল আজাদ 'কর্ণফুলী' উপন্যাসে কর্ণফুলী নদীর তীরবর্তী মানুষের জীবন-কাহিনী হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। এ-উপন্যাসে সমতলভূমির বাঙালী আর পার্বত্য অঞ্চলের চাকমা ও অন্যান্য পাহাড়ী উপজাতির মানুষের হাসি-কান্না ও আনন্দ-বেদনার দৃষ্টি ফুটিয়ে তুলেছেন। 'কর্ণফুলী' উপন্যাসে যে-ঘটনাংশ নির্মিত হয়েছে তাতে কর্ণফুলী তীরবর্তী অঞ্চলের স্থানিক রং রূপ ও বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে দুর্লক্ষ্য। একদিকে সাহসী অন্যদিকে স্বপ্নবিলাসী অথচ বিভ্রান্ত যুবক ইসমাইল এ উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহের কেন্দ্রবিন্দু। জীবনের সমস্ত সমারোহ থেকে বঞ্চিত হয়েও সে স্বপ্ন দেখে সুখী স্বচ্ছল জীবনের সমস্ত সমারোহ থেকে বঞ্চিত হয়েও সে স্বপ্ন দেখে সুখী স্বচ্ছল জীবনের। একমাত্র স্বপ্নাকাংখার অচারিতার্থতায় হতাশ ও বিভ্রান্ত ইসমাইল অতঃপর বেছে নেয় অনৈতিক কাজ। এ-উপন্যাসে আলাউদ্দিন আল আজাদ ফুলছড়ির নি:সর্গ ও পার্বত্য দৃশ্যের বর্ণনা প্রদান সূত্রে ইসমাইলের মনোজাগতিক প্রতিক্রিয়া ও আকাঙ্খাকে শব্দরূপে দিয়েছেন। ইসমাইলের দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে লেখক এ এলাকার স্থানিক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দিয়েছেন। চাকমা সমাজে প্রচলিত ধনপতি রাধামোহন উপাখ্যানের তথ্য সূত্রের সঙ্গে উপন্যাস বর্ণিত তথ্যের সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকলেও আলাউদ্দিন আল আজাদ নিজস্ব কল্পনা মনন সহযোগে ধনপতি রাধামোহন উপখ্যানটি উপস্থাপন করেছেন।

কর্ণফুলী উপন্যাসে নীলমনি রাঙামিলার অসম-প্রেম অবশেষে সকল হিংসাদ্বেষ ভুলে তাদের শুভ পরিণতিতে ইসমাইলের বিশেষ ভূমিকা নতুন আবহ সঞ্চার করেছে। ইসমাইলের বাড়ি ফিরে আসা এবং পরবর্তীতে জুলির কাতর মিনতি হাহাকার উপেক্ষা করে ইসমাইলের সাধক হওয়ার লক্ষ্য অর্জনের জন্য চলে যাওয়া অবশেষে আশা পূর্ণ হওয়ার কাহিনী লেখক অকৃত্রিম দরদ দিয়ে অংকন করেছেন।

দেশ-বিভাগকালীন সামাজিক রাজনৈতিক জীবনের জটিল প্রসঙ্গ ব্যক্তি ও সমষ্টির সমগ্রতায় এক মেধাবী রূপ লাভ করেছে আলাউদ্দিন আল আজাদের 'ক্ষুধা ও আশা' উপন্যাসে। এ প্রসঙ্গে ডক্টর রফিকউল্লাহ খানের বক্তব্য স্মরণীয় ঃ আলাউদ্দিন আল আজাদ সময় ও ইতিহাসের দ্বন্দ্বদীর্ণ সত্যকে অন্তর্ময় অবলোকনের বিষয়ে পরিণত করেছেন। কৃষিজীবনমূল থেকে সপরিবারে উন্মূলিত জোহার আত্মসন্ধান ও জীবন সন্ধানের দর্পণে অভিব্যক্ত হয়েছে জটিল ও ক্ষতবিক্ষত কালের অভিজ্ঞতাপুঞ্জ।"[৭] আলাউদ্দিন আল আজাদের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের সঙ্গে জোহার অবলোকন ও উপলব্ধির সমন্বয় 'ক্ষুধা ও আশা'র শিল্পরীতিকে অভিনব ও স্বতন্ত্র করেছে।

Dhaka University Institutional Repository


'ক্ষুধা ও আশা' উপন্যাসের প্লট বিন্যাসের ঘটনার কার্যকারণ-শৃঙ্খলতার উপর গুরুত্ব না দিয়ে চরিত্র চেতনার সূত্র ধরে নির্দ্দিষ্ট কালখণ্ডে সংঘটিত ঘটনা চিত্রিত করা হয়েছে। এ উপন্যাসে প্রধান চরিত্র জোহা এবং অন্যান্য চরিত্রের আন্তরজাগতিক প্রতিক্রিয়ার রূপায়ণ ঘটেছে। ঘটনা নয়, ঘটনার প্রতিক্রিয়ার চরিত্রচিত্তের অস্থিরতা, উদ্বেগ, যন্ত্রণা ও রক্তপাত প্রাধান্য লাভ করেছে। এ কারণে এ উপন্যাসটি চরিত্র চেতনা নির্ভর ঘটনানিয়ন্ত্রিত ও সময়শাসিত হয়ে উঠেছে।

ঘটনা অপেক্ষা ঘটনার প্রতিক্রিয়ার চরিত্রানুগ বিন্যাসের প্রয়োজন এ উপন্যাসের চরিত্রায়ণ কৌশলকে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করেছে। ফলে, চরিত্র সমূহ বহিরঙ্গের পরিবর্তে আন্তর্জাতিক ক্রিয়াশীল হওয়ায় চিত্রের সঙ্গে বিশ্লেষণ যুক্ত হয়েছে। একটি সুনিয়ন্ত্রিত অনুশাসন উপন্যাস বিধৃত বিচিত্র ঘটনাস্রোতে কেন্দ্রাভিমুখী গতি সন্ধান করেছে। জোহা পরিবারের সামগ্রিক একাত্মতায় নেমে এসেছে মৃত্যুর অন্ধকার, মোহাম্মদ আলীর লৌহ কবাটের অন্তরালে আশ্রয় হয়েছে। আঘোর বাবু যুগব্যাপী ঐতিহাসিক অন্যায়ের খেসারত দিয়ে কলকাতায় চলে যাচ্ছে। বস্তুত, 'ক্ষুধা ও আশা' একটি অস্থির যুগের মর্মন্তদ মর্মবেদনা রূপায়িত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আকরম হোসেন বলেন–"বাংলাদেশী উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন 'ক্ষুধা ও আশা'। গ্রাম জীবনের বৈচিত্র্য, শহর-জীবনের অন্ধকার রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং একটি বিশেষ যুগের সার্বিক পরিচয় 'ক্ষুধা ও আশা'য় সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে।"[৮] আলাউদ্দিন আল আজাদের বস্তুনিষ্ঠ জীবনবোধ ও মনোবিশ্লেষণী অন্তরঙ্গতার স্বাক্ষর 'ক্ষুধা ও আশা'। শ্রেণীস্বার্থের অন্তর্দ্বন্দ্বে যে সমাজ বিকশিত হয় এ সত্য আলাউদ্দিন আল আজাদের সচেতনভাবে উচ্চারিত হলো।

## ছোট গল্প

আলাউদ্দিন আল আজাদ একজন সমাজ মনস্ক শিল্পী হিসেবে সাহিত্য রচনার প্রথম পর্বে বাংলার সমাজ অভ্যন্তরস্থ মানুষের জীবন পরিপার্শ্বের চিত্র তুলে ধরেছেন। পঞ্চাশের দশকের শেষ পর্ব থেকে তাঁর ছোটগল্পের দ্বিতীয় উত্তরণ শুরু হয়। এ সময়ে তাঁর শিল্প ভাবনাকে মানব মনের অন্তর্বিশ্লেণ ও ফ্রয়েডীয় যৌনতত্ত্বের সঙ্গে তিনি নিবিড়ভাবে জড়িত করেছেন। তাতে তাঁর শিল্প প্রয়াস আধুনিক জীবনবাদের সঙ্গে অনায়াসে সম্পৃক্ত হয়। তাঁর প্রথম দিকের রচনা 'জেগে আছি' (১৯৫০) 'ধানকন্যা' (১৯৫১), 'মৃগনাভি' গ্রন্থে সমাজ সংঘাতের অন্তর্ধারণার আলোকে শ্রেণী চেতনার জাগরণ ঘটেছে। পরবর্তী পর্যায়ের রচনা 'অন্ধকার' সিঁড়ি' (১৯৫৮) 'উজান তরঙ্গের'(১৯৫৯), 'যখন সৈকত' (১৯৬৭) প্রভৃতি গল্পগ্রন্থ লেখকের মনোবিকলনতত্ত্বের শিল্পরূপ হিসেবে বিবেচিত হলেও তাঁর ছোটগল্পের মৌল প্রেরণা সমাজ সম্পর্কের বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। "বাংলা কথা শিল্পের বাস্তবতা নিবিড় বিষয় বৈচিত্রের বাইরে আলাউদ্দিন আল

Dhaka University Institutional Repository



আজাদের শিল্প চেতনায় যে অতিরিক্ত বিশেষত্ব ধরা পড়ে। তাঁর ভাষার কাব্যময়তায়, বর্ণনার শিল্পীত মাধুর্যে এ বাক্য বিন্যাসের চমৎকারিত্বে, যার সমন্বয়ে অনায়াসে গড়ে উঠেছে তাঁর রচনার অনন্য এক শিল্প শৈলী।" [৯]

'জেগে আছি' আলাউদ্দিন আল আজাদের প্রথম রচনা। এ গ্রন্থের গল্প সমুহ গল্পকার আর্থ-সামাজিক জীবনচিত্র অঙ্কন করেছেন। এ জন্য গল্প সমূহের-প্রাণশক্তি, সংযম এবং গল্পরস অনবদ্য হয়ে উঠেছে। 'জেগে আছি' গ্রন্থের 'একটি সভ্যতা গল্পে' একজন রাজমিস্ত্রী অর্থলোভ ও লালসার বশবর্তী হয়ে কিভাবে তার নিজের শ্রেণীর মানুষকে নির্যাতন করতে পারে তা তুলে ধরেছেন। 'কয়লা কুড়ানো দল' গল্পে লেখক কয়েকজন সর্বহারা শ্রেণীর কিশোর-কিশোরীর জীবন সংগ্রামের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন।

'সৃষ্টি' গল্পে গ্রাম্য মাতব্বর প্রধানদের কারণে স্কুলের শিক্ষকদের দুর্দশা অভাব-অনটনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। 'কয়েকটি কমলালেবু' গল্পে এ দেশের প্রতিটি কৃষক নেত্রী ইলামিত্র চিকিৎসা করতে হাসপাতালে থাকার সময় তাঁর একমাত্র পথই ছিলো কমলালেবুর রস। এ গল্পটি তৎকালীন কৃষক বিদ্রোহের চিত্র তুলে ধরেছেন। এ গল্পে বাস্তব জীবন-সংগ্রামের চিত্র সে সাথে মুর্তজার মত কপর্দকশূণ্য মানুষের আত্ম-বিক্রয়ের ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 'রঙিলা' গল্পে রঙিলার বাপকে সামান্য কারণে জমিদারের পেয়াদারা নায়েব-কাছারীতে ধ'রে নিয়ে গিয়ে অমানুষিক নির্যাতনের ফলে মৃত্যুবরণের কাহিনী লেখক তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে গ্রামবাসীদের জমিদারের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য প্রতিরোধ গড়ে তোলার সংগ্রামী হয়ে ওঠার দৃশ্য শিল্প সফলভাবে তুলে ধরেছেন। এ গল্পের সামাজিক-ঐতিহাসিক গুরুত্ব অসাধারণ। 'মোচার' গল্পে একটি সম্পাদকের জীবনের এক মুহূর্তের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে লিখিত। এ গল্পে সরকার শোষক এক শ্রেণীর সাংবাদিক ও দৈনিক পত্রিকার ভূমিকা স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 'মহামুহূর্ত' গল্পটিতে জমিদার-দের বিরুদ্ধে ক্ষেত-মজুরের বিদ্রোহের কাহিনী। এ গল্পে জমিদার ভূস্বামীর শ্রেণীর বিরুদ্ধে ভূমিহীন শ্রমিকদের প্রতি আজন্ম অত্যাচার-নির্যাতনের বাস্তব ঘটনার ভিত্তিতে রচিত হয়েছে। 'হাতছাড়া' গল্পটি রেলওয়ে শ্রমিকদের ধর্মঘটের কাহিনী বিধৃত। 'দুরি' গল্পটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিকায় রচিত। এ গল্পে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে মুসলমান-হিন্দু সমাজের মধ্যে তৈরী হওয়া প্রতিহিংসা পরায়ণতার চিত্র স্পষ্ট।

'শিকড়' গল্পে বিভাগোত্তরকালে মুসলিম-অমুসলিম সর্বহারা শ্রেণীর সামাজিক-অর্থনৈতিক অসহায় অবস্থার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এ গল্পে অসাম্প্রদায়িক ও শ্রেণী-সচেতন দৃষ্টি, সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে এক বিশেষ তাৎপর্য দান করেছে। 'একটি কথার জন্য গল্পে রেলষ্টেশনের নিকটবর্তী একটি চায়ের স্টলের মালিক কালু মিয়ার সঙ্গে নিকটবর্তী রেঁস্তোরার কর্মকর্তা ও মহল্লার সর্দারের দ্বন্দ্বের কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে।

আলাউদ্দিন আল আজাদের 'জেগে আছি' গল্পগ্রন্থ সমকালীন সামাজিক অর্থনৈতিক বাস্তবতার আলোকে রচিত হলেও এর শিল্পমূল আজও বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে ডক্টর এস, এম, লুৎফর রহমানের বক্তব্য

Dhaka University Institutional Repository


স্মরণীয়-"পারিবারিক অভাব-অনটনের নিখুত বর্ননা আলাউদ্দিন আল আজাদের প্রায় প্রত্যেকটি গল্পে বিদ্যমান। তাঁর প্রখর সমাজচেতনা ও বাস্তব জীবনবোধ এ-গ্রন্থে বিশেষভাবে দীপ্যমান।"[১০] আলাউদ্দিন আল আজাদ গল্পগুলো লিখেছেন পারদর্শী হাতে। তিনি ধীরে ধীরে পাঠককে টেনে নিয়েছেন কাহিনীর আবর্তের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে।

আলাউদ্দিন আল আজাদের 'ধানকন্যা' গল্পগ্রন্থের গল্পসমূহে সমকালীন সামাজিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে নতুন ধারার গল্প রচনায় ফুটিয়ে তুলেছেন। এ গ্রন্থের অধিকাংশ গল্পেই কাহিনী ও ঘটনার অর্থনৈতিক-পরিপ্রেক্ষিত, আর্থ-সামাজিক ও পারিবারিক জীবনচিত্রণ এবং শিল্পগুণ লক্ষ্য করা যায়। ডক্টর এস এম লুৎফর রহমানের অভিমত-"আলোচ্য গ্রন্থ শুধু গল্প রসে, শ্রেণী-চেতনায় ও বৈপ্লবিক আবেগে সমৃদ্ধ নয়-সেই সঙ্গে এদেশে প্রকাশিত যে স্বল্প সংখ্যক রচনা, শিক্ষিত মানুষের মন-মানসিকতার সুস্থ, বলিষ্ঠ, কর্মঠ ও পরিচ্ছন্ন প্রতিফলনে সমৃদ্ধ-তারও অতুলনীয় নিদর্শন।" [১১]

'ধানকন্যা' গ্রন্থের প্রথম গল্প 'শিষফোটার গান'-এ তৎকালনী জমিদারী প্রথার অধীনে জোতদার-ভূস্বামীরদের দ্বারা সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের শোষণের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। 'মলাট' গল্পে নারী জীবনের অসহায়তা ও ব্যক্তি জীবনের দ্বন্দ্ব সংঘাতের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। প্রচলিত পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় এ গল্পের বাস্তব মুল্য আছে। 'চেহারা' গল্পে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের চিত্র বর্ণিত হয়েছে। 'সুরমা' গল্পে গ্রাম্য মাতব্বর, অবক্ষয়ী সামন্ত-পুরোহিত শ্রেণীর প্রতিনিধি হাজী আলী আখন্দের লোলুপতার ক্যানভাসে, বাসার চাকরি আবু নয়ীম ও সুন্দরী স্ত্রী গুলনাহারের ঐকান্তিক প্রেমের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে চিত্র পরিদৃষ্ট হয়। 'বাতি' গল্পে বংশের, দেশের এবং জাতীয় জীবনের বাতি-আদর্শবাদী, সমাজ ও রাজনীতি সচেতন ছাত্র নেতা শহীদের জেলে নিহত হবার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। 'রোগমুক্তির ইতিবৃত্ত' দেশ বিভাগের পর সংগীত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার পরিপ্রেক্ষিতে দেশত্যাগরোধের প্রয়াস লক্ষণীয়।

'ধানকন্যা' গল্পে আলাউদ্দিন আল আজাদ গ্রামীণ জমিদার পরিবারে অত্যাচারের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। এ গল্পে তৎকালীন ভূ-স্বামী শ্রেণীর সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও অত্যাচার অবিচারের স্বরূপে অঙ্কন করা হয়েছে। 'ধানকন্যা' গল্পগ্রন্থের শিল্প মূল্যে বিচার করতে গিয়ে ডক্টর এসএম লুৎফর রহমান বলেছেন-"আলাউদ্দিন আল আজাদ এ গ্রন্থের বিভিন্ন গল্পে যে সব অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, অবস্থা ও পরিস্থিতির প্রথার কু-প্রভাবের প্রতিফলন ঘটেছে। ঐ ধরণের ভূমি-ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ধারার ভূস্বামী শ্রেণীর ভূমি, অর্থ ও নারী লোলুপতা, বিলাস ব্যাসন এবং কৃষিজ পন্যের ক্রিয়াজাত অর্থে কলাকারখানা বিশেষতঃ পাটকল প্রতিটির চিত্র রূপায়িত হয়েছে।" [১২] বস্তুত, আলাউদ্দিন আল আজাদ তাঁর 'ধানকন্যা' গল্প গ্রন্থের অধিকাংশ গল্পে বৈপ্লবিক চিন্তা-চেতনার পরিচয় দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository


'গুহাচিত্র' গল্পে দেখা যায়, জীবনের অভিজ্ঞতার থেকে কোনো রাজবন্দী ছবি আঁকছেন কারাগারের প্রকোষ্ঠের দেয়ালে তাতে ফুটে উঠেছে আদিমাতার কোলে মানবশিশু। 'জলটুপি গল্পে' এক কারারুদ্ধ আরেফ ফেরারী ছেলের মাতা স্নেহবশত লুকিয়ে ছেলেকে খাওয়ান পিতার পছন্দ নয় এসব, তিনি অনেকখানি বিমুখ সন্তানের প্রতি। তার পরও দেখা যায় নামাজ পড়াতে গিয়ে পড়ে যান তিনি। নিত্যকার কর্তব্যকর্ম সম্প্রদান করতে পারেন না। এই পর্যায়ে আরেকটি গল্প 'সমতল'। এ গল্পে টাকা ধার নিয়ে শোধ করতে অপারগ কয়েক ব্যক্তির কথা; এমনকি যিনি স্ত্রীর সঙ্গে যুদ্ধ করে বাঁশের চুঙ্গিতে সঞ্চিত মহিলার টাকা-পয়সা নিয়ে যখন ঋণ পরিশোধ করতে যাবেন, অত্যন্ত দুরবস্থার চিহ্ন সর্বাঙ্গে ধারণ করে কন্যা রানীকে স্বামীগৃহ থেকে চলে আসতে বাধ্য হতে দেখে তিনিও আর ঋণ শোধ করতে পারেন না।

আলাউদ্দিন আল আজাদের দ্বিতীয় ধারা সূচনা 'অন্ধকার সিড়ি'তে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'উত্তাপ' গল্পে হুলিয়া মাথায় নিয়ে বন্ধুর বাড়িতে আত্মগোপন করতে গিয়ে তারই আত্মীয়াকে ভালোবাসা ও বিয়ে করার ঘটনা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু পরিতৃপ্ত এই জীবনে হঠাৎ আবির্ভাব হয় বাল্য বন্ধুর সে আশ্রয় চায় এবং হাসপাতালে ভর্তি হতে বন্ধুর সাহায্য চায়। বন্ধুকে বাড়িতে নিতে পারে না কিন্তু আশ্বাস দিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করায়। কিন্তু পথেই সে বন্ধুর মৃতদেহ দেখে নিজেকে অপরাধী ভাবে। সে জানতে চায়, তার চোখ থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে কিনা। 'ধোয়া' গল্পে চা বাগানের কামিনকে উপভোগ করে ম্যানেজার, তার স্ত্রীর উপস্থিতিতে কামিন দাবী করে সাহেবের সন্তান তার গর্ভে, সে মার খায় সাহেবের হাতে। স্ত্রীর আচরণ নেয় নতুন বাঁক। এখানেও নির্যাতনের একটা বিষয় আছে, কিন্তু সেটাই একমাত্র বিষয় হয়ে ওঠে না। 'নাকফুল' গল্পে বীরাঙ্গনা যে মেয়েটি রিলিফ চোরের কাছে বিক্রি হওয়ার পর পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয় হারিয়ে যাওয়া স্বমীর কাছে। ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তাদের পুনর্মিলন ঘটে।

আলাউদ্দিন আল আজাদের প্রথম জীবনে গ্রামের মানুষ ও সংগ্রাম, প্রকৃতি ও তার লালন ও সংহার মূর্তি এ সব তার মনে প্রবল ছাপ ফেলে। নগর জীবনে তিনি রাজনৈতিক সংগ্রাম, নির্যাতন-নিপীড়ন, জীবনের অপেক্ষাকৃত কৃত্রিমতা ও প্রতারণা ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি বুঝিয়েছেন মানুষের বহির্জীবনের ক্রিয়াকর্মই কমিয়ে দেয় তার অন্তর্লোকের আলোড়ন।

Dhaka University Institutional Repository


# ৩. শওকত ওসমান

## উপন্যাস

শওকত ওসমানের গ্রন্থাকারে প্রথম উপন্যাস 'জননী' (১৯৬১). এ উপন্যাসে লেখক ব্রিটিশ শাসনের অন্তপর্বের অবিভক্ত বাংলার আর্থ-সামাজিক পটভূমিকার বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। ব্রিটিশ শাসন এবং শোষণের নগ্ন পাশে আবদ্ধ হয়ে বাঙালী জাতীর জীবন যাত্রার মান কোন পর্যায়ে নেমে এসেছিল 'জননী' উপন্যাস তার প্রামাণ্য দলিল। ১৯২০ এর দশকের সময়কালে পশ্চিমঙ্গের মহেশডাঙ্গা গ্রামের কৃষক পরিবারের জীবন চিত্রায়নের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে 'জননী' উপন্যাসের কাহিনী এই উপন্যাসে লেখকের আর্থ-সামাজিক জীবন দৃষ্টির সঙ্গে গ্রামীন জীবনের হাসি-কান্নার কাহিনী বিধৃত হয়েছে।

'জননী' কাহিনী প্রধান নয়, চরিত্র প্রধান উপন্যাস। শওকত ওসমান 'জননী'র কাহিনী বিন্যাসে পরিবেশ ও প্রকৃতির সঠিক উপস্থাপনার দৃষ্টি ভঙ্গি গ্রহণ করেছেন। এ উপন্যাসের মূল কাহিনী আজহার খাঁ এবং দরিয়া বিবির জীবনের নানা ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তবে মূল কাহিনীর ছায়ায় কয়েকটি উপকাহিনী প্রশাখার মত উপন্যাসে বিস্তৃত। উপ কাহিনীর মধ্যে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গার প্রসঙ্গে এবং এই সুযোগে স্থানীয় জমিদারদের ফায়দা লুটার পদ্ধতিও বর্ণিত হয়েছে। সবশেষে উঠতি ধনী ইয়াকুবের লাম্পট্য ও তার সাংসারিক কোন্দল-কলহের ইঙ্গিত এবং তার জন্য দরিয়া বিবির অশেষ পরিণতি উপন্যাসের কাহিনীধারায় প্রবাহমানতা রক্ষা করেছে। এ সম্পর্কে অনীক মাহমুদের বক্তব্য স্মরণী–'জননী'র কাহিনীর সমগ্রে যে শ্রমজীবি মানুষের জীবনরেখা লালিত, তার সিংহভাগই দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা আর বঞ্চনার কাহিনী। ইংরেজ শাসনের শেষভাবে বাঙালীর, গ্রামীণ অর্থনীতি কেমন বিপর্যয়েএর চোরাবালিতে আচ্ছাদিত হয়ে পড়েছিল জমিদার ভূস্বামীদের দৌরাত্ম সর্বপরি ইংরেজদের বহুমুখী শোষণ শাসন এ গুলোর সুখদ বর্ণনা কাহিনীতে আছে।"[১৩] 'জননী' উপন্যাসে লেখকের শিল্প নৈপুন্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

'জননী' উপন্যাসে লেখকের শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এ উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে নিরাবেগ মন্থর ও সাধু ভাষায়। ব্যঞ্জনাময় ও গুরু গম্ভীর ভাষায় লালিত্যে এ উপন্যাস হয়ে উঠে অধিক হৃদয় গ্রাহী। এ কারণে শওকত ওসমান এ উপন্যাসের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে বাস্তব বাদী উপন্যাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়েছেন।

শওকত ওসমান 'ক্রীতদাসের হাসি' (১৯৬২) উপন্যাসে মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক বাগদাদের রোমান্টিক আবহমন্ডিত একটি কাহিনী রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর স্বাতন্ত্র্য কালিক পটভূমিতে রয়েছে সুদূর অতীতের মধ্য যুগের বাদশা হারুণ অর রশীদের রাজত্বকাল। তিনি বিখ্যাত 'আরব্য রজনীর' সহস্র ও এক রাত্রির কাহিনীর সূত্র ধরে এ উপন্যাসের ঘটনাংশ সন্ধান করেছেন। এ উপন্যাসে তিনি হারুন-অর-রশীদের

Dhaka University Institutional Repository


বাগদাদের মধ্যস্থানীয় পটভূমিকে আশ্রয় করে আধুনিক কালের পাকিস্তানী একনায়কতন্ত্র ও স্বৈরাচার শৃঙ্খলিত বাংলাদেশের সমাজ জীবনের সমস্যা ও সংকটের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। এ উপন্যাসে লেখক জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতার হিসেবে গ্রহণ করেছেন। প্রতিবাদী মৃত্যুমুখ তাঁতারী হয়ে উঠেছে বাঙালীর মুক্তিচেতনার প্রতীক পুরুষ।

শওকত ওসমান 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসের তাঁতারী, মেহেরজান, হারুন-অর-রশীদ অর্থাৎ প্রেমের দূর্বার আবেগ শক্তির প্রচন্ড নিষ্ঠুরতা এবং প্রেম ও ঐশর্য্যের দ্বন্দ পাঠককে মুগ্ধ করে। জীবন চেতনার সুগভীর সহনীয়তা এবং বিশ্লেষণের হৃদয়ভেদী আন্তরিকতা বাহিনীকে করে তুলেছে অপূর্ব গতিময়। এ প্রসঙ্গে মনসুর মুসার উদ্ধৃতি স্মরণীয় "চরিত্র গুলোতে ব্যাপ্তির চেয়ে তীক্ষ্ণতা, দ্বন্দের চেয়ে গভীরতা, অভিজ্ঞতার চেয়ে উপলব্ধি অনেক বেশী। তাঁতারী আর আছু নওয়াস কাহিনীতে রেখে গেছে জাজ্বল্যমান ছাপ। অন্যান্য চরিত্রগুলোও রক্তিম রাগে জাজ্বল্যমান।"[১৪]

'ক্রীতদাসের হাসি উপন্যাসের কাহিনীর অধিকাংশই নাট্যরীতিতে বা নাট্য ভঙ্গিতে রচিত। এ উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নাটকীয় ভঙ্গি ও উপস্থাপনই প্রধান। বস্তুত এ উপন্যাসে ক্রীতদাসের হাসিকে কেন্দ্র করে যে উৎকণ্ঠার সূত্রপাত ঘটেছে তা কাহিনীর শেষ পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে এবং উৎকণ্ঠার যেখানে সমাপ্তি সেখানেই কাহিনীর শেষ। লেখক এ উপন্যাস রচনা অজস্র আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছেন। পরিবেশ-উপদেশ সার্থক ব্যবহারের জন্য শব্দগুলো হয়ে উঠেছে জীবন্ত ও শক্তিশালী। সেই সাথে লেখকের অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'ক্রীতদাসের হাসি' শওকত ওসমানের নিরীক্ষাধর্মী উপন্যাসগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মূলতঃ এ উপন্যাসে বিভাগোত্তর বাংলাদেশের ষাটের দশকের প্রথম দিকে পাকিস্তানী সামরিক শাসনে আবদ্ধ বাংলাদেশের নিপীড়িত জনগণের বক্তব্যকেই তুলে ধরা হয়েছে। কাহিনী নির্মাণ ও পরিচর্যার অভিনবত্বে, জীবন চেতনার গভীরতায় পরিবেশ অনুযায়ী সার্থক শব্দ ব্যবহারে ক্রীতদাসের হাসি শওকত ওসমান তথা বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।

শওকত ওসমানের 'বনী আদম' আর্থ-সামাজিক চেতনা নির্ভর উপন্যাস হিসেবে উল্লেখযোগ্য। এ উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে গ্রাম ও শহরের পটভূমিতে নানান মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য ও সেই সঙ্গে কিছু ভণ্ড মানুষের জীবন চিত্র। 'বনী আদমের শুরুতে শওকত ওসমান সামান্য ভুলের জন্য হজরত আদম (আঃ) এর পরিণতির কথা স্মরণ করেছেন। বস্তুত, লেখক আদম সন্তানদের অপরিমেয় দারিদ্র্যের বীভৎসতাই এ উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। 'বনী আদম' কেবল নায়ক হারেসের মর্মস্পর্শী দুঃখের কাহিনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। অন্যান্য পাত্র-পাত্রী দারিদ্র্যের ছোবলে যে বেদনাদায়ক জীবন যাপন করেছে তার নিপুণ চিত্র লেখক এ উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।"তবে কাহিনী হিসেবে 'বনী আদম'

Dhaka University Institutional Repository


সুবিন্যস্ত নয়। যে সমস্ত আদম সন্তানের ঘটনা এখানে বর্ণিত হয়েছে। সেগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খতা বিদ্যমান থাকলেও কাহিনী ঢিলেঢালা।"[১৫] তবে বর্ণনার গভীরতা ও সরসতা পাঠককে আকৃষ্ট করে। এখানে হারেজের জীবন ও কর্মসাধনার রূপদান করতে গিয়ে কলাবিবির বস্তিবাসীদের জীবন চিত্র, বাসার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে মেহেরালীর পারিবারিক ইতিহাস, কামের সন্ধান ও বর্ণনা করতে গিয়ে খান বাহাদুরের এরফান চৌধুরীর জীবন নীতি বর্ণনার সাথে সাথে বর্ণিত হয়েছে কবি হুজুরের ছাতাওয়ালার কথা, মেহেরালীর ছেলে নাসিমের স্ত্রীর প্রসঙ্গ সহ নানা কাহিনী। বলা যায়, 'বনী আদম' উপন্যাসে শওকত ওসমান সমাজের চাহিদা বঞ্চিত মানুষের অপরিমেয় দুঃখ কষ্টের চিত্র তুলেছেন। সেই সাথে মেহনতি মানুষের জীবন সংগ্রামের বলিষ্ঠতা ফুটে উঠেছে এ উপন্যাসে।

শওকত ওসমানের 'সমাগম একটি নিরীক্ষাধর্মী ও প্রতীকাশ্রয়ী উপন্যাস। এ উপন্যাসে সমসাময়িক কালের জীবনবোধে প্রেক্ষাপটে মৃত লোকের বাসিন্দা কয়েকজন মনীষীকে চরিত্র হিসেবে হাজির করা হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কালের মনীষীদের একই স্থানে উপস্থিত করে তাঁদের জীবনবোধের বৈচিত্র বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। বার্নাডশ, রমারঁলা, মাইকেল, বিদ্যাসাগর, মহসীন, রবীন্দ্রনাথ, টলষ্টর সকলকে এ কাহিনীর চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করেছেন লেখক। এসব চরিত্রের পৃথক এবং পার্থক্য উপন্যাসের দ্বন্দ্বের মাধুর্য এনেছে। এর বিপরীতে রয়েছে জীবিত লোকের বাসিন্দাদের চরিত্র। এদের মধ্যে জুহা, জাইদুন, ফুয়া, সৈয়দ বোকজা, পাষন্ড তেছোদীন ও মোয়াদেদ বখ্ত। এরা সবাই সাংবাদিক জোহার চরিত্রকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ডক্টর রফিক উল্লাহ খানে উদ্ধৃতি স্মরনীয় ঃ "নিজ নিজ সময় ও সমাজ লালিত জীবনাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য সত্ত্বেও উপন্যাসে সমাগত মনীষীদের মধ্যে এক নিগুঢ় ঐক্য সূত্র বিদ্যামান এবং তা হলো এঁরা সবাই মনের দরদী-শোষণ, অবিচার ও যুদ্ধ বিরোধী-মানুষের শান্তি ও কল্যাণের জন্য উৎসর্গীকৃত ; দেশ প্রেমিক হয়েছে বিশ্বমানবের কল্যাণের আদর্শে আস্থাবান।"[১৬]

উপন্যাসটি সংলাপ প্রধান এবং নাটকীয় পরিস্থিতির উপস্থাপনায় বৈচিত্র্যপূর্ণ। এ-উপন্যাসের কাহিনী-বিন্যাসে লেখকের সৃজনশীল পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ব্যাপক অধ্যয়ন ও মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুত, সমমান উপন্যাসটি গভীর জীবনাভিজ্ঞতা ও অনুধ্যানের ফসল না হলেও এক মহৎ আদর্শ উদ্বুদ্ধ লেখকের একটি পরিকল্পনার ফসল। শওকত ওসমানের 'রাজা উপাখ্যানে'র (১৩৭৭) ঘটনাংশ পরিকল্পিত হয়েছে মহাকবি ফেরদৌসীর 'শাহানামা' কাব্যের অসমাপ্ত কল্পিত অংশ অবলম্বনে। আপাতদৃষ্টিতে এ-উপন্যাসের কাহিনীতে শাপগ্রস্থ রাজা জাহকের অভিশাপ মুক্তির কাহিনী হলেও এর অন্তরালে রয়েছে বিশেষ এক তাৎপর্য। 'রাজা উপাখ্যানে' তিনি প্রেমকে দেখিয়েছেন সেই কেন্দ্রীয় শক্তিরূপে যা স্বাধীনতা ও মুক্তিকে অর্থবহ করে তোলে। এই তাৎপর্যের দিক থেকে দেখলে 'রাজা উপাখ্যান' রাজা জাহক প্রধান চরিত্র না হয় হরমুজের প্রধান চরিত্র হিসেবে গণ্য হওয়ার কারণ স্পষ্ট হয়।

Dhaka University Institutional Repository


অত্যাচারী প্রজাপীড়ক রাজা জাহুক দৈববাণী কর্তৃক অভিশপ্ত হলে দু'টি বিষাক্ত কালো গোক্ষুর সাপ গলদেশে বেষ্টনি করে থাকে এবং সাপ দু'টির প্রতিদিনের খাদ্য হিসেবে নির্দেশিত হয় বিশ্ব থেকে পঁচিশ জন যুবক-যুবতী অথবা জ্ঞানীবৃদ্ধের মগজ। রাজা জাহুক যদি খাদ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে তাঁর মগজই হবে সাপ দু'টির ভক্ষণ। রাজার প্রাণ রক্ষার জন্য সিপাহীরা নিরপরাধ যুবক-যুবতী এবং ইলমদার বৃদ্ধদের বন্দী করে আনে সাপের আহার হিসেবে। প্রাণ উৎসুককারীদের কাছে অজ্ঞাত থেকে যায় তাদের অকাল ও মর্মান্তিক পরিণতির কার্যকারণ। অপরপক্ষে মাতৃহীনা রাজকুমারী গুলশানের নিঃসঙ্গ জীবন ক্রমাগত অসহায় হয়ে উঠতে থাকে। পিতার জীবন রক্ষার জন্য জীবনদান কারীদের প্রতি মমত্ববোধ থেকে সে বন্দিশালায় গমন করে এবং হরমুজ নামক এক সুদর্শন যুবকের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়। হরমুজকে সে বন্দীদশা থেকে মুক্তিদান করলে হরমুজ তা প্রত্যাখান করে। রাজ-দুহিতা গুলশানের নিকট থেকে শাপগ্রস্থ জাহুক রাজার কাহিনী শোনার পর নিরপরাধ দেশবাসীর জীবন রক্ষার জন্য জীবনের ঝুকি নিয়ে সে রাজার শাপমুক্তির চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে। তার তপস্যা সাফল্য অর্জন করে। রাজা জাহুক শাপমুক্ত হয়। জীবনসংক্রান্ত এক নতুনবোধে উপনীত হন।'রাজা উপাখ্যানের' বিধৃত উপন্যাসিকের জীবনবোধ সামূহিক স্বার্থচেতনায় উজ্জীবিত। এ প্রসঙ্গে ডক্টর রফিকউল্লাহ খানের উক্তি স্মরণীয় : "এ-উপন্যাস প্রকাশ কালে বাংলাদেশে আইউবি স্বৈরশাসনের অবসান হয়েছে ; এবং বাঙালী জাতির গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার সংগ্রাম অর্জন করেছে ইতিবাচক চরিত্র। সম্ভবত এ-কারণেই 'ক্রীতদাসের হাসি' ব্যক্তিত্ব-চেতনা থেকে এ উপন্যাসের বিষয় ভাবনার অগ্রগতি সমষ্টি জীবনের মধ্যে পথ সন্ধান করেছে।"[১৭] 'রাজা উপাখ্যান' উপন্যাসে বিধৃত রাজা জাহুকের বন্দিশালা ষাটের দশকের স্বৈরশাসন কবলিত পাকিস্তানশাসিত বাংলাদেশের রূপক। এ সময়ের আত্মবিবরণকামী ও পলায়নপর সুবিধাবাদী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামনে হরমুজকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করেছে শওকত ওসমান। এ চরিত্রের মুখে উচ্চারিত হয়েছে শ্রেণী বিভক্ত ও শোষণমূলক সমাজে ব্যক্তিস্বার্থকে সবকিছুর উর্ধ্বে স্থাপন করার নিয়মের বিরুদ্ধে শৈল্পিক প্রতিবাদ। বস্তুত "রাজা উপখ্যানে রূপকের আশ্রয়ে উপন্যাসিক ব্যক্তিস্বার্থ অপেক্ষা স্বামাজিক স্বার্থের জন্য মানুষের যে নিয়ন্ত্রণ সাধনা, তাই উপস্থিত করেছে। অভিশপ্ত রাজা জাহুকের শাপমুক্তি এবং নতুন জীবনোপলব্ধিতে উত্তরণ 'রাজা উপখ্যানে'র মৌল পতিপাদ্য। শোষিত-অবরুদ্ধ সমাজ জীবনে ব্যক্তি স্বার্থ নয়, বিচ্ছিন্নতা নয়-সাময়িক জীবন চৈতন্য উত্তরণই হল প্রত্যাশিত, শোষণ-বঞ্চনা-অত্যাচার-শৃঙ্খল জর্জরিত সমাজের প্রতি প্রবল ঘৃণা এবং তা থেকে উত্তরণের প্রতীকী ইঙ্গিতে 'রাজা উপখ্যান' অনন্য।" [১৮]

'রাজা উপখ্যানে'র পরিণতি বাস্তবতা বিবর্জিত। কাহিনীতে রাজা জাহুককে অত্যাচারী রাজা হিসেবে উপস্থাপন করলেও তার পরিণতি পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। তবে উপন্যাসের কাহিনী বর্ণনার ভঙ্গি ও ভাষা রিতীতে শিল্পীর দক্ষতা ও আধুনিকতার ছাপ রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository


শওকত ওসমানের 'চৌরসন্ধি' (১৯৬৮) একটি নিরীক্ষাধর্মী উপন্যাস। এ উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে সমাজের ওপরতলার কায়েমী স্বার্থবাদীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এক চোর প্রধানের তৎপরতা এবং অন্য এক চোর প্রধানের সঙ্গে তার এলাকা ভাগাভাগি ও ক্ষমতা বন্টনের ব্যাপারকে কেন্দ্র করে। নগর জীবনের পটভূমিতে রচিত এ উপন্যাসে প্রসঙ্গত কায়েমী স্বার্থ রক্ষার জন্য পুঁজিপতি শ্রেণীর হীন ষড়যন্ত্র ও তৎপরতা বিশেষভাবে তাৎপর্য লাভ করেছে। এ উপন্যাসের মাধ্যমে লেখক সামাজিক দায়বদ্ধ ও রাজনীতি সচেতন সাহিত্য শিল্পী হিসেবে আমাদের সমাজ, অর্থনীতি, নৈতিকতার মূলে তির্যক আঘাত হেনেছেন।

এ উপন্যাসে একজন রিক্সাচালক কাল্লু কিভাবে লুটেরা ধনিকদের ক্রীড়ণক হয়ে শ্রমিক অন্দোলন ও ধর্মঘট ভাঙার কাজে লিপ্ত হয়ে ক্রমে এক সময় কাল্লু সাহেবে পরিণত হলো। তার কাহিনীর মাধ্যমে লেখক এদেশে উপনিবেশিক শাসন-শোষণের উপজাত হিসেবে গড়ে ওঠা বিত্তবান শ্রেণীর স্বরুপে উন্মোচন করেছেন এবং দেখতে চেয়েছেন এদের হাতে পুঞ্জিভূত সম্পদের মূলে রয়েছে চৌর্যবৃত্তি।

'চৌরসন্ধি'র মূল কাহিনীর ভেতর পত্র-কাহিনীর আকারে পরকীয়া প্রেমের একটি কাহিনীও রয়েছে। আমদানী ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত জনৈক সয়ীদের সঙ্গে প্রতিপত্তিশালী উকিল আতাহার আলীর স্ত্রী কোবরার পরকীয়া প্রেমের যোগসূত্র স্থাপন করেছে। এ উপন্যাসে ভাবগাম্ভীর বক্তব্যের সঙ্গে রঙ্গরসের যুগপৎ মিশ্রণ ঘটিয়েছেন তিনি। আপাত দৃষ্টিতে এটি চোরদের কাহিনী হলেও এর পিছনে কায়েমী স্বার্থবাদীদের মধ্যকার স্বার্থ সংঘাতের ফলে দেশ বিভাগের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতও অনুমান করা যায়।

এই উপন্যাসে শিল্প-নিরীক্ষার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অপরাধ জগতের ঘটনার সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য ও ঐক্যসমেত কল্পনা,বক্তব্য ও রঙ্গরসিকতা দৃষ্টিভঙ্গি মিলিয়ে অনেকটা সামাজিক নকশা'র বৈশিষ্ট পেয়েছে। ভাষা ও বর্ণনারীতিতে অন্যান্য নিজস্ব ভঙ্গি লক্ষনীয়।

## ছোট গল্প

শওকত ওসমান-এর ছোটগল্প বিষয় বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। সমকাল সচেতনতা, মানব জীবনের বিবিধ কর্মের ব্যক্তিত্বে রেখায়িত তার ছোটগল্প। বিস্তৃত পরিসরে নানা বিষয় ও সমস্যার অনুসঙ্গ নানাভাবে ছড়িয়ে আছে। তাঁর ছোটগল্পে আর্থ-সামাজিক চিন্তার ব্যাপকতা পরিদৃষ্ট হয়। ঔপনিবেশিক সমাজ কাঠামোর অন্ত রালে থেকে বাংলাদেশের আশির দশকের সমাজ বীক্ষণের প্রচ্ছায়া পর্যন্ত তাঁর গল্পের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে।

Dhaka University Institutional Repository


শওকত ওসমানের 'সাবেক কাহিনীর 'জীর্ণপত্র' গল্পটি ক্ষুধা ও খাদ্য সমস্যা নিয়ে রচিত। গল্পটিতে জমিরের ক্ষুধার বিরুদ্ধে জীবন সংগ্রাম, অন্যদিকে বিধবা মহিলার ঘরে চাল বাড়ন্তের খবর। মৃত্যুতেও সমস্যার সমাধান হলো না। ক্ষুধার জন্য আমিরণ শহরে এসে দেহদান প্রস্তর কলঙ্কের 'উদবৃত্ত' গল্পে। উভশৃঙ্গ গ্রন্থের 'চিড়িয়া' গল্পে বি.এ. পাশ ছেলে পাখি ফেরি করে। 'প্রাইজ ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থের 'টিফিন' গল্পে শিশু শ্রমিক মফি দুপুরে অন্যদের কাছ থেকে আলাদা জায়গায় বসে খায়। সহকর্মীরা সন্দেহ করে যে হয়ত সে উন্নত খাবার খায়, শেষে ধরা পড়ল যে সে দুপুরে খাবার নামে ভান করে। 'রাতা' গল্পে খাদ্য সমস্যার মর্মস্পর্শী কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। 'নেত্রপথ' এর 'বালকের মুখ' গল্পে ছিন্নমূল বালক কোনদিন মাংস খায়নি, মোলিকেই সে মাংস মনে করবে।

'জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থের 'নতুন জন্ম' গল্পে জেলে ফরাজ আলি ও পুত্র আক্কাস উভয়ে বস্ত্রের অভাবে নগ্ন হয়ে একই কাঁথায় রাত কাটায়। 'পিজরা পোল' গ্রন্থের 'কাঁথা' গল্পেও বস্ত্র সমস্যার মর্মস্পর্শী চিত্র ফুটে উঠেছে। এ গল্পে দরিদ্র কৃষকের ছেলে মনু বাজারে চট তৈরী করে শীত নিবারণ করে।

'সাবেক কাহিনী'র প্রতীক্ষা গল্পে চাষী বাকের ম্যালেরিয়ায় ভুগে-ভুগে জমি-জমা হারিয়েও জীবন রক্ষা করতে পারেনি। 'প্রস্তর ফলক'-এর 'প্রতিবেশী' গল্পে ওয়াজেদ আলী যক্ষার কথা চাকুরী স্থলে জানায়নি। কারণ তাতে তাঁর চাকুরী যেতো। ফলে নিজেই ধুকে ধুকে মরেছে।

'আজব জীবিকা' গল্পে-১৩৫০ এর দুর্ভিক্ষের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। অভাব, দারিদ্র্য ও বিপর্যস্ত অর্থনীতির ছায়ায় মুহ্যমান মানুষের কাহিনী ফুটে উঠেছে 'ডিগবাজী'-এর 'পার্ক', 'প্রস্তর ফলক'-এর 'বর্ণমৃত', 'উভশৃঙ্গ'-এর 'স্বগতোক্তি' এবং 'তিনমির্জা' গ্রন্থের 'শেষ আগে শুরু হয়' গল্পে।

ধন সম্পদের অসম বন্টন ও শোষণ-বঞ্চনা, অভাব-দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। আমাদের দেশে যুগ যুগ ধরে-সামন্তবাদী শোষণ থেকে বর্তমানে পুঁজিবাদী শোষনের নানা চিত্র লক্ষ্য করা যায়। শওকত ওসমান তাঁর সমকালীন জীবন প্রবাহ থেকে শোষণ বঞ্চনা ও অত্যাচারের নানা চিত্র অঙ্কন করেছেন তার ছোট গল্পে। জমিদারী শোষনের হৃদয়হীনতা ফুটে উঠেছে 'সাবেক কাহিনী' গ্রন্থের বকেয়া গল্পে। 'জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থের 'দুই চোখ কানা' গল্পে শ্রমিক শোষণের অভিনব কৌশল এবং 'উভশৃঙ্গ' গ্রন্থের 'সৌদামিনী মালো' গল্পে সম্পত্তি কুক্ষিগতকরণ ও হটকারিতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। 'ভাগাড়' গল্পে শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের প্রতিবাদ ও অপমানের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

'প্রস্তর ফলকে'র 'গন্তব্য' গল্পে দারিদ্র্যের কারণে কবি-সাংবাদিক মাবুদ চৌধুরীর অলংকার বন্ধক রাখার কাহিনী বিধৃত হয়েছে। অভাব দরিদ্র্য যে কোন সখ বা বিলাসিতার তোয়াক্কা করে না তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ 'গন্তব্য' গল্প। 'একশ বছর পরে' গল্পে শওকত ওসমান 'পঞ্চাশের মনন্তরের প্রসঙ্গ এনেছেন। বস্তুতঃ শওকত ওসমান তাঁর অধিকাংশ ছোটগল্পে বিভাগোত্তর কালের এদেশের আর্থ-সামাজিক পটভূমির চিত্র

Dhaka University Institutional Repository


তুলে ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে ডক্টর সানজিদা আখতারের বক্তব্য স্মরণীয়-"বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে শওকত ওসমান প্রতিশীল ধারার প্রতিনিধি। সুদীর্ঘ জীবনের বাঁকে তিনি ক্রমাগত আরও উদার, সাহসী এবং আধুনিক হয়ে উঠেছেন। সেই সঙ্গে তার সৃষ্টি ধারাও থেকেছে অবিরাম অব্যাহত। তার অসংখ্য ছোটগল্পে এদেশের রাজনৈতিক উত্থান-পতন বিবর্তনের বিচিত্র ধারাক্রম রূপান্তরিত হয়েছে বিশ্বস্ততার সঙ্গে।"[১৯]

'সাবেক কাহিনী'র 'তুচ্ছ স্মৃতি' গল্পটি দুই পরিবারের কোন্দলের চিত্র এবং এ কোন্দলের শিকার পাঁচবছরের মেয়ে জাহানারার স্মৃতি নিয়ে রচিত হয়েছে। উৎসর্গ গল্পে পিতৃ ভক্ত আব্দুল জলিল কানাকড়ি নিয়ে পিতার লাখ টাকা রোজগারের জন্য প্রশংসায় পঞ্চমুখহয়েছে। 'বিবেক' গল্পে গ্রাম্য চাষী ও মাঝারী ব্যাবসায়ী সিরাজ খাঁ কন্যা আলেয়ার বিয়ে দিয়েছিল ক্ষয়িষ্ণু একবনেদী ঘরের ছেলে আরশাদের সঙ্গে। সিরাজ খাঁর টাকা পয়সা শেষ করে এবং তাকে নানাভাবে অপদস্ত করে আরশাদ বিবেকহীনতার পরিচয় দিলেও মৃত্যুর সময় শ্বশুর তাকেই সিন্দুকের চাবি দিয়ে যায়।

'নেত্রপথ' গল্পগ্রন্থে রাজনীতি সম্পৃক্ত গল্প আছে কয়েকটি, সেখানে রাজনৈতিক বক্তব্য প্রকাশের জন্য কৌশল এবং সাংকেতিকতার আশ্রয় নিয়েছেন লেখক। এ গ্রন্থের 'জিহ্বাহীন' কিংবা 'চিড়িমার' গল্পে স্বৈরশাসনের শৃঙ্খলে বন্দি অপরাহত মানুষের অব্যক্ত যন্ত্রণার প্রকাশ ফুটে উঠেছে। এ সব গল্পে সমকালীন দ্রোহ-প্রতিবাদের কাহিনী বিধৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে অনীক মাহমুদ বলেছেন "শ্রেণী বিভক্ত সমাজে ধনী নির্ধনের সামাজিক অবস্থান যেমন একরূপে হয় না ; তেমনই শ্রেণী সংগ্রামের নানা কাঁটা এখানে নিবদ্ধ। শওকত ওসমান তাঁর গল্প সাহিত্যে এই শ্রেণীচেতনায় নানা অনুসঙ্গ ধারণ করার চেষ্টা করেছেন।"[২০]

শওকত ওসমানের কিছু কিছু গল্পে নির্যাতিতের প্রতিবাদ ও বিদ্রুপ লক্ষ্য করা যায়। 'উভশৃঙ্গে'র-'নেমকহারাম' গল্পে ছিন্নমূল বালক সলিম, রহিম, ফতু ভিক্ষা চেয়ে নিরাশ হয়ে প্রতিবাদ করে। শওকত ওসমান তাঁর কয়েকটি গল্পে শুধু উচু শ্রেণীরবিরুদ্ধে নীচু শ্রেণীর প্রতিবাদই দেখাননি। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশদের বিরুদ্ধে দুঃস্থ দরিদ্র মানুষের অভিনব প্রতিবাদের কথা লিখেছেন। তিনি 'পিঁজরাপোলে'র 'থুকু' গল্পে ফাদার জোহানেস-এর বাবুর্চি মনসুর নিজে যক্ষারোগী হয়েও প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মনিবের খাবারে থুতু মিশিয়েছে। মনসুর থুতু মিশানোর কারণ হিসেবে বলেছে-"মেরা বহেন কো আপনে দেখ। বেগায়ের খানা মেরা দেলকা বহুত আদমী মেরা মা---- ।" শওকত ওসমান, থুতু, পিজরাপোল, পৃষ্ঠা-৩১। যে খাবারের জন্য তার বোন মরেছে। মা মরেছে, দেশের লোক মরেছে। সেখানে শাসক ও শাসক গোষ্ঠীর দোসর ফাদারের জন্য খাবার পরিবেশন করতে মনসুর কুণ্ঠিত হয়েছে। শওকত ওসমান এভাবে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণীসংঘাতের নানা পর্যায় পর্যন্ত অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে তাঁর ছোটগল্পে রূপায়িত করেছেন। কখনো তা মুক্তিকামী মানুষের প্রতিবাদ বা কখনো অনুপ্রেরণা হিসেবে বিধৃত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository



বস্তুত, শওকত ওসমান তাঁর ছোটগল্পে সমাজের নানা অসঙ্গতি-অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরেছেন। সমাজের উচ্চস্তরের মানুষ থেকে নিম্নশ্রেণীর পেশাজীবী পর্যন্ত যারা অপরাধ-অপকর্ম সংঘটনের চিত্র তাঁর গল্পে ফুটে উঠেছে।

**তথ্য নির্দেশ ঃ**


১। রফিকউল্লাহ খান, শতবর্ষের বাংলা উপন্যাস, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-২০০০, পৃষ্ঠা - ৫৭।

২। সৈয়দ আকরম হোসেন, প্রসঙ্গ ঃ বাংলা কথা-সাহিত্য, মাওলা ব্রাদার্স,ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৯৩।

৩। ডক্টর রফিকউল্লাহ খান, বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-১১৬।

৪। ডক্টর রফিকউল্লাহ খান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৩।

৫। ডক্টর রফিকউল্লাহ খান, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-২১৭।

৬। আজহার ইসলাম, বাংলাদেশের ছোটগল্প ঃ বিষয় ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পরূপ, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-১১৮।

৭। ডক্টর রফিকউল্লাহ খান, পূর্বোক্তপৃষ্ঠা-২০০।

৮। সৈয়দ আকরম হোসেন, বাংলা সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংলা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা-৮৮ :

৯। আজহার ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২০৭।

১০। ডক্টর এস.এম. লুৎফর রহমান, বাংলাদেশী কথা-সাহিত্যের তিন আমল, ধারণী সাহিত্য সংসদ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ,২০০৫, পৃষ্ঠা-১৫৮।

১১। ডক্টর এস.এম. লুৎফর রহমান, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-১৬৫।

১২। ডক্টর এস.এম. লুৎফর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৮৩-১৮৪।

১৩। অনিক মাহমুদ, বাংলা কথা-সাহিত্যে শওকত ওসমান, ইউরেকা হক এজেন্সী রাজশাহী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৫।

১৪। মনসুর মুসা, পূর্ব বাঙলার উপন্যাস, এ্যাডর্ন পাবলিকেশন্স, পরিবেশিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, ২০০৮, পৃষ্ঠা-৫৩।

১৫। অনিক মাহমুদ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮২।

১৬। ডক্টর রফিকউল্লাহ খান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৫।

১৭। ডক্টর রফিকউল্লাহ খান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৪।

১৮। সৈয়দ আকরম হোসেন, বাংলাদেশের উপন্যাস ঃ আঙ্গিক বিবেচনা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৯০৫।

১৯। সানজিদা আখতার, বাংলা ছোটগল্পে দেশবিভাগ, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ-২০০২, পৃষ্ঠা-১৭৬।

২০। অনীক মাহমুদ, বাংলা কথা সাহিত্যে শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১২৩।

Dhaka University Institutional Repository



# চতুর্থ অধ্যায়

## তিনজন কথা-সাহিত্যিকের রচনায় নিহিত চরিত্র ও ঘটনাবলীর বাস্তবতা-অবাস্তবতা নির্ণয়

Dhaka University Institutional Repository


দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-৭১) রচিত বাংলার জীবন ঘনিষ্ঠ উপন্যাসগুলোর মধ্যে 'লালসালু' (১৯৪৮) অন্যতম। 'লালসালু' চরিত্র প্রধান উপন্যাস। চরিত্রের সংগ্রামী উপস্থিতিই এই উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র 'চাঁদের অমাবস্যা' (১৯৬৪) উপন্যাস ব্যক্তি মানুষের মনোজাগতিক সংকটও তা থেকে উত্তরণের এক নিপুণ শিল্প প্রকাশ হিসেবে চিহ্নিত। তাঁর 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসে বিচিত্র সৃষ্টিশীল ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা জীবন জিজ্ঞাসার পরিচয় পাওয়া যায়। 'কাঁদো নদী কাঁদো'তে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্'র পূর্ববর্তী উপন্যাসদ্বয় থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন শিল্পদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ উপন্যাসের মত তাঁর ছোটগল্পেও শিল্প-সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর 'নয়নচারা' (১৯৪৪) গল্পগ্রন্থেই প্রথম বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবন ও সমাজের বাস্তব প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। এ গ্রন্থের অধিকাংশ গল্পগুলোতে লেখকের মনোসীক্ষণজাত শিল্পকৌশলের পরিচয় বিধৃত। তাঁর 'দুইতীর ও অন্যান্য গল্প'-গ্রন্থের অধিকাংশ গল্পেও বিভাগোত্তর বাংলাদেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

বিভাগোত্তরকালের বাংলাদেশের উপন্যাসের ধারায় আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯) একজন জীবনবাদী সাহিত্যের সূক্ষ্ম রূপকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। তাঁর প্রথম পর্বের উপন্যাস 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' (১৯৬০) বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে এক অনন্য সংযোজন। এ-উপন্যাসে তিনি সমকালীন সমাজ সূত্রের সঙ্গে ব্যক্তি চেতনার এক বিশেষ যোগসূত্র স্থাপন করেছেন। তাঁর 'কর্ণফুলী' (১৯৬২) পার্বত্য অঞ্চলের একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তিনি এ-উপন্যাসে একটি আঞ্চলিক পরিপ্রেক্ষিতকে ধারণ করে মানবাত্মার স্বাধীনতা ও বৈশ্বিক অনুভূতিকে নবরূপে অবগাহন করেছেন। তাঁর 'ক্ষুধা ও আশা' (১৯৬৪) উপন্যাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দুর্ভিক্ষ, মহামারী, সামাজিক-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে। এ-উপন্যাসে লেখক একটি অস্থির যুগের মানুষের সার্বিক অবস্থাকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

আলাউদ্দিন আল আজাদ একজন ছোট গল্পকার হিসেবে সাহিত্যে পদার্পণ করেন। তিনি তাঁর ছোটগল্পে একজন সমাজ সচেতন শিল্পী হিসাবে মানব মনের অন্তর্বিশ্লেষণ ও লিবিডো তাড়িত ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের শৈল্পিক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তাঁর 'জেগে আছি' (১৯৫০) গ্রন্থে সমাজ সত্যের নিপুণ বিন্যাস ঘটিয়েছেন। তাঁর 'ধানকন্যা' (১৯৫১) গ্রন্থে শ্রেণী চেতনার জাগরণ ও সমকালীন সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পটভূমি ফুটে উঠেছে। তাঁর 'উজান তরঙ্গে' গ্রন্থে শ্রেণী চেতনা ও মানবাত্মার জটিল দিকগুলো ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository


শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮) বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকগত নিরীক্ষার মাধ্যমে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে একজন সমাজ সচেতন শিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর 'জননী'(১৯৬১) উপন্যাস আর্থ-সামাজিক চেতনানিষ্ঠ দুর্দশাগ্রস্থ গ্রামীণ পরিবেশের সামগ্রিক চিত্র ফুটে উঠেছে। তাঁর 'বনী আদম' (১৯৪৬) উপন্যাসেও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিধৃত। 'ক্রীতদাসের হাসি' (১৯৬২) ষাটের দশকের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে তীর্যক প্রতিবাদ হিসেবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। উপন্যাসের মত ছোটগল্পেও শওকত ওসমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন। তাঁর গল্পে ক্ষুধা-দারিদ্র্য, অভাব-অনটন ও দুর্ভিক্ষের ছবি ফুটে উঠেছে। 'জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প' (১৯৫১) গ্রন্থে তিনি সমকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন। 'সাবেক কাহিনী' (১৯৫৩) গল্পগ্রন্থের গল্পসমূহে তিনি কৌতুকের স্পর্শ এনে সামাজিক অসঙ্গতি, ব্যাভিচার ও নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরেছেন। তাঁর 'প্রস্তর ফলক'(১৯৬৪) গল্প-গ্রন্থের অধিকাংশ গল্পে সমাজের অবক্ষয় , পঞ্চাশের মর্মন্তুদ ক্ষুধা-দারিদ্র্য ফুটিয়ে তুলেছেন।

## ১. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

### ১.ক. লালসালু

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১) বিভগোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম কথা সাহিত্যিক। তাঁর 'লালসালু' (১৯৪৮) একটি বহুল আলোচিত। বিভিন্ন সময়ে সমলোচকগণ উপন্যাসটির বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ঔপন্যাসিক এ-উপন্যাসের উপকরণ হিসেবে পশ্চাৎপদ গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক কাঠামো-লালিত জীবনকে নির্বাচন করেছেন। তবে এ উপন্যাসে 'একজন মজিদের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার নেতিবাচক রূপের অন্তর্ময় বিন্যাস প্রতিফলিত হয়ে দেশ-বিভাগকালীন বাংলাদেশের জীবন ও মনোবাস্তবতার ঔপন্যাসিক শিল্পরূপ' কতখানি সার্থক হয়েছে তাই বিবেচ্য।

মূলতঃ দেশ-বিভাগের মাত্র এক বছর পরে 'কলকাতার কমরেড' পাবলিশার্স এ-উপন্যাসটি প্রকাশ করলেও 'সে সময়ে এটি পাঠক প্রিয়তা অর্জনে সমর্থ হয়নি'। তার পর ১৯৬০ সালে 'লালসালু' দ্বিতীয় সংস্করণ ঢাকার 'কথাবিতান'-পাবলিশার্স প্রকাশ করলে, তখন থেকেই গ্রন্থটি বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টিতে সমর্থ হয়। এ প্রসঙ্গে ডক্টর এস.এম.লুৎফর রহমান বলেছেন-''বস্তুতঃ বুর্জোয়া সামন্ত-সামরিক চক্রের থাবায় আটকেপড়া ষাট দশকের পাকিস্তানী শাসক শ্রেণীর নিকট জনগণের নিস্তরঙ্গ সামাজিক-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ধারা প্রবাহে ধর্মীয় অনুভূতি ও আচার-বিশ্বাসের অনুমোদন সাপেক্ষে নিঃশর্ত আত্ম-সমর্পণের সঙ্গে 'লালসালু'র সমগ্র প্রেক্ষাপট আশ্চর্যরকম ঐক্যসূত্রে গ্রথিত। শিক্ষার আলোক-বঞ্চিত

Dhaka University Institutional Repository


মহব্বতনগর গ্রাম, তার মাতব্বর খালেক ব্যাপারীর সঙ্গে বহিরাগত পীর-মজিদের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক, মাজার কেন্দ্রিক কুসংস্কার, দুই পীর-মাতব্বরের দাপট এবং জমিলাকে আয়ত্বে আনার হৃদয়হীন প্রয়াসের সঙ্গে পাকিস্তানী আদর্শ, আঞ্চলিক সংহতি ও জীবন চেতনার বিশেষ সাযুজ্য বিদ্যমান।"[১]

*প্রকৃতপক্ষে মোদাচ্ছের পীরের মাজারে জমিলার মেহেদী রঞ্জিত পদপাত প্রতীকী তাৎপর্য বিশিষ্ট।* আর এর মাধ্যমে বিশেষ বক্তব্যসহ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ উপস্থিত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে জীনাত ইমতিয়াজ আলী বলেছেন–"অসমভাবে বিকশিত সমাজ-ব্যবস্থায় শঠতা-মিথ্যাচার ও সীমাহীন ফাঁকির মধ্য দিয়ে মজিদরূপী যে বিষবৃক্ষ শিকড়ায়িত হয় ও শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে, তাকে উৎপাটিত করতে হলে বনস্পতির নিচে অসহায়ভাবে বেড়ে ওঠা লতা-গুল্ম অর্থাৎ সাধারণ, বিপন্ন অস্তিত্বে নির্জীত মানুষদের অবশ্যই সর্বভয় এবং পরিণামভীতি শূন্য হয়ে জাগরিত হতে হবে। বলা যায়, এই বিশেষ বক্তব্য প্রকাশ, অনিবার্য প্রতিপাদ্যে উপনীত হওয়ার প্রয়োজনেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ 'লালসালু'র পরিকল্পনা, এর কাহিনী ও চরিত্রসমূহ নির্মাণ করেছেন।"[২]

দুধে ভাতে পরিতৃপ্ত মজিদ মাঝে মাঝে গারো পাহাড়ের শ্রমক্লান্ত দিনের স্মৃতিতে শিউরে ওঠে। তাই সে সাধারণ কৃষক যখন ধান ক্ষেত আর জীবনের মত কঠিন মৃত্তিকার সঙ্গে অচ্ছেদ্য সংগ্রামে ব্যতিব্যস্ত তখন মজিদ কণ্ঠে দোয়া-দরুদের চিকন সুর তোলে। কারণ, এ বিষয়ে জনাব আবু জাফরের অভিমত- "যে সম্মান ও প্রতিপত্তি আজ অনায়াসে করতলগত সহজ মৃত্তিকা সংগ্রামে তা লাভ করা যেত না। তার সকল ক্ষমতার *শেকড় প্রোথিত তার অন্তঃস্বার শূন্য ধর্ম ব্যবসার মাটিতে।*"[৩] তাই কখনো কখনো মজিদ এক ধরনের ভীতি দ্বারা তাড়িত হয়। ফলে, এই ভীতিই তাকে প্রতিহিংসা পরায়ণ করে তোলে। যারাই তার বিরুদ্ধে সামান্যতম বিরোধিতা করেছে তাদেরকেই সে ক্রুর হিংস্রতার তীক্ষ্ম ছোবলে নিঃশেষ করতে চেয়েছে। যার শিকার হয়েছেন-তাহেরের বাপ, নিরপরাধ আমেনা, পাশের গ্রামে আগত পীর সাহেব এমনকি, তার প্রথমা স্ত্রী রহীমা।

মহব্বতনগরের শাসন-শোষণ প্রক্রিয়ায় মজিদ মূখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ধর্ম-ভয়ের সমান্তরালে অর্থনৈতিক সামাজিক শোষক শক্তিকেও সে ব্যবহার করেছেন। শোষণের প্রশ্নে জোতদার খালেক ব্যাপারীর সঙ্গে মজিদের গভীর সঙ্গতি ও অর্ন্তমিল ঘটে পরস্পরের অজান্তেই ; কেবল শ্রেণী-চরিত্র ও শ্রেণী-অবস্থানের ঐক্যে। ধর্মশক্তি ও আর্থ-সামাজিক শক্তির সমন্বয়ে সৃষ্ট এভাবেই এ উপন্যাসে শোষণের রূপ উন্মোচিত হয়েছে। দুই শক্তির সম্মিলনে শোষণের যে প্রক্রিয়া 'লালসালু' উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে, তা মহব্বতনগরের প্রতীকে সমগ্র বাংলাদেশের-ই প্রতিরূপ। মজিদ এক মর্মান্তিক বিষবৃক্ষের শাখা-সমাজ-জীবনের এই অভ্যন্তরস্থ অসঙ্গতির কারণেই সৈয়দ আকরম হোসেনের অভিমত "অহেতুক মাজারভীতি, খালেক

Dhaka University Institutional Repository


ব্যাপারী-ভীতি, সমাজ-সংস্কারভীতি, শাসকভীতি ইত্যাদি ... অস্তিত্বগ্রাসী আতঙ্ক যেন এদেশের সমগ্র ব্যক্তিত্বকে করেছে নিমজ্জিত ও বিলুপ্তপ্রায়।"[৪]

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ 'লালসালু' উপন্যাসকে সময় ও সমাজের বস্তুগত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ফলে মজিদের প্রতি তার কোনরূপ ঘৃণা বা অসন্তোষের প্রকাশ ঘটেনি। যে-সমাজের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ায় মজিদের অন্তঃসারশূন্য বিমিশ্র অস্তিত্বের দ্বন্দ্বময় অভিযাত্রার সমান্তরালে সঙ্গশক্তিহীন সমাজে শোষণের রূপ এবং প্রতিবাদের চরিত্রও চিত্রণ করেছেন ঔপন্যাসিক।

'লালসালু'র মজিদ ছিল সর্ববিচ্ছিন্ন এক অনিকেত সত্ত্বা। এক পর্যায়ে সে নিঃসঙ্গতার মুখোমুখি হয়ে পড়ে। তখন সে জীবনকে নতুন করে উপভোগের আকাঙ্খায় জমিলাকে দ্বিতীয় স্ত্রী রূপে ঘরে নিয়ে আসে। জমিলার ঔদ্ধত্য, ভয়হীন নিঃশঙ্ক আচরণ-জীর্ণ করে তোলে মজিদের শক্তি, প্রতাপ আর বিশ্বাস। জমিলাকে সে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। ফলে, ক্ষমতার বৃত্তে মহব্বতনগরের চৌম্বক ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েও সেই জীবন-প্রবাহ ও জনপদে মজিদ সঞ্চার করতে পারেনি। তাই জীনাত ইমতিয়াজ আলীর মতে- "জমিলার মেহেদী রঞ্জিত পদপাত তাকে করেছে আরো উৎকেন্দ্রিক, চরম আত্মিক নৈঃসঙ্গের গভীরে নিক্ষেপ। অন্যদিকে জমিলা নিমজ্জিত ও বিপন্ন অস্তিত্বের মানুষদের সামনে উপস্থাপন করেছে তাদের-ই আত্ম-উত্তরণের তত্ত্ব-মাজার-মজিদ-ব্যাপারী ও পরিণাম ভীতিশূন্য হয়ে জাগরিত হওয়ার আহ্বান।"[৫]

মাজারকে কেন্দ্র করে মজিদ গ্রামবাসীর কাছে যে রহস্যঘন জীবনের সৃষ্টি করেছে, জমিলা যেন তার চাইতেও 'রহস্যঘন, অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে'। এ বিষয়টি মজিদ চরিত্রে ফুটিয়ে তুলতে ঔপন্যাসিক লিখেছেন- "মজিদ হুকা টানে আর নীলাভ ধোয়ার হালকা পর্দা ভেদ করে তাকায় জমিলার পানে।"[৬]

অতঃপর জমিলাকে কেন্দ্র করেই মজিদের ভেতরে জেগে ওঠে ক্রোধ। জমিলার নির্বিকার আচরণে অব্যক্ত ক্রুদ্ধ হয় মজিদ। লেখকের ভাষায়-"তার সে শুষ্ক হৃদয় ঢোলকের একটানা আওয়াজের নিরন্তর খোঁচায় ধিকি ধিকি জ্বলে, মনে অন্ধকারে স্ফুলিঙ্গের ছটা জাগে। সে ভাবে নেশার লোভে কাকে সে ঘরে আনলো ? যার কচি কোমল লতার মত হাল্কা দেহ দেখে আর এক ফালি চাঁদের মত ছোটমুখ দেখে তার এত ভালো লেগেছিলো তার একি পরিচয় পাচ্ছে ধীরে ধীরে ?"[৭] তবু মজিদ শেষ পর্যন্ত শান্তি লাভ করতে পারে না। প্রতারণার অগ্রযাত্রায় মজিদ একেবারেই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। একান্ত স্বজন রহীমার কাছেও সে দাঁড়াতে পারে না। এদিকে ধর্মের প্রতি তার সত্যিকার কোন অনুরাগ ছিল না বলে সাধারণ মানুষের মতো ধর্মকে অবলম্বন করে সে তার এই অন্তহীন নিঃসঙ্গতার বলয় থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। তখন এক অনতিক্রম্য গ্লানিবোধে মজিদ অবিশ্রান্ত পীড়িত হয়। কিন্তু, জীবন সংগ্রাম থেমে থাকে না। জিকিরের রাতে জমিলা অসংখ্য মুসল্লীর অদ্ভুত কায়দায় ভয়াবহ সমবেত গর্জন সহ্য করতে না পেরে হঠাৎ কাউকে কিছু না বলেই এবং মাথায় ঘোমটা না দিয়ে বাইরে চলে যায়। এ দৃশ্য সহসা মজিদের চোখে পড়ে এবং এতে সে

Dhaka University Institutional Repository


দারুণভাবে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। শাস্তি হিসেবে সে জমিলাকে তারাবীর নামাজ পড়তে বলে। কিন্তু নামায পড়তে পড়তে জমিলা এক সময় জায়নামাজের উপর ঘুমিয়ে পড়লে মজিদ ক্রোধে ফেটে পড়ে। এক হ্যাচকা টান দিয়ে সে ঘুমন্ত জমিলাকে প্রথমে বসতে বাধ্য করে এবং দ্বিতীয় হ্যাচকা টানে তাকে দাঁড়াতে বাধ্য করে। তারপর জমিলার কঁচি হাতের কব্জিকে শক্ত করে ধরে মজিদ তাকে মাজারের দিকে নিয়ে যেতে থাকে। অসহ্য ব্যথা, পুঞ্জিভূত ঘৃণা ও দারুণ বীতশ্রদ্ধা জমিলাকে তীব্র ঘৃণায় মুহূর্তের মধ্যে ক্রোধোন্মত্ত করে তোলে এবং সে অতি আকস্মিকতায় মজিদের মুখমণ্ডলের উপর থুথু ছিটিয়ে দেয়। জমিলার এ-আচরণ মজিদের কাছে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো মনে হয়। সে তার সম্মুখে কেয়ামতের দৃশ্য দেখতে থাকে। মহব্বতনগর রাজ্যের উপর মজিদের নিরঙ্কুশ একাধিপত্যের বিরুদ্ধে এ-হচ্ছে প্রলয়ংকরী ঝড়ের শামিল। জমিলার এই প্রতিবাদী ভঙ্গিতে মজিদ দারুণভাবে বিচলিত হয়ে পড়ে। মজিদ জমিলার কঠোর শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে তাকে অন্ধকার মাজার ঘরের খুঁটির সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে। প্রবল বর্ষণ ও বিদ্যুৎ চমকের মধ্য দিয়ে রাত্রি অতিবাহিত হবার পর মজিদ ভোর বেলায় জমিলার অবস্থা দেখার জন্য মাজার ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। তারপর লেখকের বর্ণনায়-"ঝাপটা খুলে মজিদ দেখলো লাল কাপড় আবৃত কবরের পাশে হাত পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে জমিলা, চোখ বোজা, বুকে কাপড় নেই। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে বলে বুকটা বালকের বুকের মত সমান মনে হয়। আর মেহেদী দেয়া তার একটা পা কবরের গায়ের সঙ্গে লেগে আছে।"[৮]

একি অচেতন হবার পূর্ব মুহূর্তে কল্পিত মোদাচ্ছের পীরের প্রতি জমিলার অশ্রদ্ধা প্রদর্শনের-তথাপি সচেতন প্রয়াস ? হয়তোবা তাই। মজিদের ভয়ঙ্কর ক্রোধ দেখে তাই-ই মনে হয়। কারণ ঐ দৃশ্য দেখার সঙ্গে সঙ্গে মজিদের মনে হলো-"মুহূর্তের মধ্যে কেয়ামত হবে। মুহূর্তের মধ্যে মজিদের ভেতর কী যেন উলট-পালট হয়ে যাবার উপক্রম করে।.....কিন্তু শেষ পর্যন্ত টান খেয়ে সে সামলে নেয় নিজেকে।"[৯] এক বিব্রত উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে সংযত হয়ে মজিদ ঠাণ্ডা মাথায় নিজের দূরভিসন্ধি অনুযায়ী কাজ করে চলে। তার ক্রোধকে শীতল করে ফেলে। এ শীতলতা তার বহিরাবরণ মাত্র। ভেতরে ভেতরে ক্রোধের আগুন সে ঠিকই জ্বালিয়ে রাখে। হাসুনির বাবা যখন ভরা মজলিসের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করে কথা বলা শুরু করে তখন মজিদ তার সঙ্গে সংযত ভঙ্গিতে কথা বলে, আক্কাসের ইংরেজী শিক্ষা প্রশ্নে উদগ্র ইচ্ছাকে সুকৌশলে বানচালের সময় সে মাথা ঠাণ্ডা রাখে। তথাপি জমিলার কাছেই মজিদের সর্বাত্মক ও সামূহিক পরাজয় ঘটেছে। এখন সে একা, মহব্বতনগরের 'স্বচ্ছলতায় শিকড় গাড়া বৃক্ষ' আরও আকস্মিকভাবে উন্মূলিত ও অনিকেত হয়েছে।

খালেক ব্যাপারী মহব্বতনগরের সবচেয়ে আস্থাবান ব্যক্তি। গ্রামের লোকেরা তাকে ভয় পায়। কিন্তু সে ভীতি মজিদকে ভয় পাওয়ার মত নয়। খালেক ব্যাপারীর ভীতি একান্তই সমাজ বাস্তবতার সৃষ্ট। সাধারণ

Dhaka University Institutional Repository


বিপন্ন অসহায় মানুষেরা যেভাবে বিত্তবানকে করে, যেভাবে সবলকে ভয় পায়, সেভাবেই মহব্বতনগরের অধিবাসীরা খালেক ব্যাপারীর প্রতি নীরব ভয় লালন করে। মজিদ ও খালেক ব্যাপারীর উদ্দেশ্য অভিন্ন। গ্রামবাসীদের শাসন ও শোষণ করা। লেখকের ভাষায়-''একজন সামন্ত প্রভূর মতোই মহব্বতনগরে খালেক ব্যপারীর অবস্থান, গ্রামের বিচার, শিক্ষা-সংস্কার কিংবা সেবাকর্ম তাকে কেন্দ্র করেই হয় পরিচালিত ব্যাপারীর মুখ দিয়েই তাহের কাদেরের বাপের বিচারের রায় ঘোষিত হয়।''[১০] মজিদ সুকৌশলে এ কাজটি করে। কারণ মজিদ জানে 'মাতব্বর না হলে শাস্তি বিধান হয় না। বিচার চলে না'। তাই এ কাজে সে খালেক ব্যাপারীকেই ব্যবহার করে। এভাবেই মজিদ ও খালেক ব্যাপারী এক হয়ে যায়। এই একাত্মতা ও শ্রেণীস্বার্থের বন্ধন মূলতঃ শ্রেণী স্বার্থের ঐক্য। প্রকৃতপক্ষে খালেক ব্যাপারীকে একজন ব্যক্তিত্বহীন দূর্বল চরিত্রের লোক হিসেবে চিত্রিত করেছেন ঔপন্যাসিক। তার নিজস্ব কোন চিন্তা-চেতনা নেই, নেই কোন স্বাতন্ত্র্য। সে মজিদের ক্রীড়নক বা তল্পী-বাহক মাত্র। সে স্ত্রী আমেনার সন্তান আকাংখা পূরণ করতেই শ্যালক ধলা মিঞাকে আওয়ালপুরের পীরের পানি পড়া আনতে পাঠানোর দায়ে মজিদের প্রতিশোধ নীরবে সহ্য করতে বাধ্য হয়েছে। তের বছর বয়স থেকে যে স্ত্রীর সাথে বসবাস করছে তাকে সে তালাক দেয়। ''বস্তুত, খালেক ব্যাপারীর ব্যর্থতা অন্তরের সত্যকে ব্যক্তিত্বে জাগরিত হয়ে প্রতিদান করতে না পারারই ব্যর্থতা। তার হৃদয়ক্ষরণ, অন্তরঙ্গ রক্তপাত ; তারই ব্যক্তিত্ব-বর্জিত আচরণ ও ব্যক্তি স্বরূপের অনিবার্য-পরিণতি। খালেক ব্যাপারীর আমেনাকে তালাক দেওয়ার ঘটনা আমাদের সমাজ-সত্য, সামান্য কারণে মুহূর্তের উত্তেজনা ও অন্যের কথায় স্ত্রী-ত্যাগ গ্রামীণ জীবনেরই বাস্তবনিষ্ঠ পরিচয়।[১১]

*তাহেরের বাপ এ-উপন্যাসে একটি উজ্জ্বল, সোচ্চার ও প্রতিবাদী চরিত্র। খালেক ব্যাপারী যে সাহস* দেখাতে পারেনি রেহান আলী, আক্কাস, তাহের-কাদের বা মোদাব্বের মিঞা, সে-সাহস দেখিয়েছে এ বৃদ্ধ। *সে মহব্বতনগরের এক সাধারণ নিম্নবিত্ত কৃষক। কিন্তু তার স্বভাব-স্বতন্ত্র ; জীবনাদর্শ ব্যতিক্রমী, অন্যান্য* গ্রামবাসী থেকে পৃথক, জীবনের প্রথম দিকে কিছুটা সুখ ও স্বচ্ছলতার মুখ দেখলেও জীবনের উপান্তে এসে তার মনোকষ্টের অন্ত ছিল না। বৃদ্ধা স্ত্রী তাকে এমন কথা বলেছে যার সঙ্গে তার সন্তানদের জন্ম-প্রসঙ্গ জড়িত। অন্য দিকে পিতা-মাতার এ নিত্য কলহ, কন্যা হাসুনির মা-র ভালো লাগেনি, রহীমার মাধ্যমে মজিদের কাছে তাই সে দোয়া চেয়েছে, তাড়াতাড়ি যাতে তার মৃত্যু হয় 'ওনারে কন, খোদায় জানি আমার মওত দেয়।'

মহব্বতনগরের কোন কিছুই মজিদের কাছে গোপন থাকে না, রহীমার মাধ্যমে তাহের-কাদেরের বাপের কথা মজিদ জানতে পারে। কিন্তু তাহেরের বাপ বুঝেছে মজিদ 'অন্তরের শক্তি দিয়ে ব্যাপারটি জানেনি'। কন্যা হাঁসুনির মা-ই তা মজিদকে বলেছে। সে কথা গভীর লজ্জার, অপার আত্ম-অসম্মানের। তা সবাইকে বলা যায় না, নির্বোধ মেয়ে তা বোঝেনি। কাদেরের বাপ তাই হাসুনির মাকে প্রহার করেছে। কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository


গভীরতর বিবেচনায় এ প্রহার হাসুনির মাকে নয়। এ প্রহার মজিদকেই করা হয়েছে। তাই তার-ই চক্রান্তে কোন অপরাধ না করেও কাদেরের বাপকে শাস্তি পেতে হয়েছে। আর সেই মর্মবেদনা, অন্তর্যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে সে হয়েছে নিরুদ্দেশ।

'লালসালু' উপন্যাসে লেখক মজিদের সমান্তরালে আওয়ালপুরের পীর সাহেবের চরিত্র অঙ্কন করেছেন। পীর সাহেবের যথেষ্ট বৃহৎ খড়গনাসা, গৌরবর্ণ চেহারা, বাতরস ভারী পদযুগল, গায়ে জোব্বাজাব্বা। পূর্ব পুরুষ কোন এক অতীতে মধ্যপ্রাচ্য থেকে এসেছেন । সে অহংকারে তিনি অনেক সময় 'উর্দু জবানে' কথা বলেন। পীর সাহেবের খ্যাতির শেষ নেই। বস্তুতঃ এ পীর একজন 'জাঁদরেল পীর' -এ কারণে তাঁর আগমণ-সংবাদ পাওয়ার পর মজিদ অস্থির হয়ে ওঠে। মজিদের ভয় হয়, এই নবাগত পীরের আগমনে তার প্রভাব কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের মত মিলিয়ে যাবে। এ জন্য ক'দিন ধরে মজিদের মন থমথম করে। সে দেখতে পায় মতিগঞ্জের সড়কটা দিয়ে দলে দলে লোক চলেছে উত্তর দিকে আওয়াল পুরের উদ্দেশ্যে। কিন্তু মজিদ তাতে চরমভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তার প্ররোচনায় ও ষড়যন্ত্রে এক দল এই বয়োবৃদ্ধ পীরকে শারীরিকভাবে আক্রমণ করে। পীর সাহেব অবস্থা বুঝে দ্রুত গাছের ডালে উঠে প্রাণ বাঁচান। পরে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে বৃক্ষ ডাল হতে নীচে নামেন তিনি। ঔপন্যাসিক পীর সাহেবের দৈহিক, বাচনিক বর্ণনা থেকে ধর্মসভায় সংগঠিত ঘটনাবলীর যে রসাত্মক ও শ্লেষাত্মক বর্ণনা দিয়েছেন : তাতে এই চরিত্রটি অত্যন্ত জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে।

রহীমা মজিদের প্রথম স্ত্রী। সে যৌবনদীপ্ত দেহের অধিকারিণী। ঔপন্যাসিক তার দৈহিক বর্ণনা উপন্যাসে স্পষ্ট রূপ দিয়েছেন। মজিদ তার স্থূল যৌবনের উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ দেখেই তার প্রতি মুগ্ধ হয়। গ্রামে মজিদের প্রতিপত্তি, সম্মান ও শ্রদ্ধাভাব রহীমার মনেও স্বামীর প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভীতিভাব জাগাতে সাহায্য করে। মজিদের প্রত্যেকটি নির্দেশ সে নির্দ্বিধায় পালন করতে কার্পণ্য করেন। তার হাঁটার মধ্যে পৌরুষদীপ্ত ভাব থাকায় মজিদ তাকে স্বাভাবিকভাবে হাটার জন্য উপদেশ দিলে সে সহজেই তা মেনে নেয়। সংসারের প্রতিটি কাজও সে সুশৃঙ্খলভাবে পালন করে। স্বামীর কাজের প্রতি তার কৌতূহল অসীম। বাপ ও ছেলের এক-ই সঙ্গে মুসলমানি দেখার জন্যে অন্যান্য মেয়েদের মত রহীমার কৌতূহলও অদম্য এবং স্বামীর কীর্তিতে তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

লালসালু দিয়ে ঢাকা মাজার মজিদের শক্তির প্রধান উৎস। তাই মজিদের স্ত্রী হিসেবে রহীমার কাছেও গ্রামের মেয়েরা ছুটে আসে বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্য। রহস্যাবৃত এই মাজারের প্রতি রহীমার আকর্ষণও কম নয়। গভীর রাতে সে মাজারের পাশে গিয়ে অপলক চেয়ে থেকে অন্তরের গভীর রহস্য ভেদ করতে চায়। লেখকের ভাষায়– "গভীর রাতে কখনো মাজারের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকে মাছের পিঠের মত স্তব্ধ বিচিত্র সেই মাজারের পানে। মাথার কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টানা, দেহ নিশ্চল। তাকিয়ে থাকতে

Dhaka University Institutional Repository



থাকতে ঘোর লাগে, চোখ অবশ হয়ে আসে, মহাশক্তির কাছে পাছে কোন বেয়াদবী করে বসে, সে ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে কখনো। তবু মুহূর্তের পর মুহূর্ত মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে।"[১২] যে মাজার ক্ষমতার উৎস, সেখানে সেও মনের কামনা প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করে না। তাই নিঃসন্তান রহীমা সেখানে সন্তান কামনা করে নারীত্বের অসঙ্গতি পূরণের জন্য, সংসার জীবনে আনন্দের আশায়। এই প্রার্থনা মজিদের নিজের মধ্যে সঞ্চারণ করার অবচেতন দিক স্মরণ করিয়ে দেয়।

হাসুনির মার প্রতি মজিদের অলক্ষ্য আকর্ষণ রহীমা অনুভব করে : কিন্তু স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে না। তার প্রতি আকর্ষণের জন্য মজিদ তাকে শাড়ি কিনে দিলে রহীমা স্বামীর দুর্বলতা উপলব্ধি করে। কিন্তু প্রতিবাদ তার ধর্ম নয়। আমেনার সন্তান লাভের জন্য মাজারের চারপাশে ঘোরার ব্যবস্থা করলেও রহীমার ক্ষেত্রে তা অনুসৃত হয়নি। রহীমা উপলব্ধি করে মজিদ তার স্বামী হিসেবে মনের কথা উপলব্ধিতে সমর্থ। মাজারের চারপাশে ঘোরার প্রয়োজন হয় না। স্বামীর শক্তি ও প্রতিপত্তি তার মধ্যে বিশ্বাসের ছায়া ফেলে।

নিঃসন্তান রহীমার চপলতাহীনতা মজিদের জীবনে সুখ আনতে অসমর্থ হয়। চতুর মজিদ নিজের মনোভাব আবৃত করে, নিজেদের ঘরে সন্তান থাকলে আনন্দ হত, একথা বলার পর রহীমা হাসুনীকে পোষ্যপুত্র করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে মজিদ তা সমর্থন করেনি। সে হাসুনির মার দেহ দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হলেও সামাজিক কলঙ্কের জন্যে তাকে প্রার্থনা করেনি। নতুন বিয়ে করে এনেছে কিশোরী জমিলাকে। জমিলাকে স্বপত্নী হিসেবে পাওয়ার পর রহীমা নিজের জীবনের অন্ধকার দিক উপলব্ধি করতে পারে। বন্ধ্যা নারীর অন্তঃসারশূন্যতা যে কতখানি দুর্বিসহ, তা অনুভব করতে তার কষ্ট হয় না।

'লালসালু' উপন্যাসে নগর-প্রত্যাগত শিক্ষিত যুবক আক্কাস গ্রামে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ গ্রহণ করলেও ধর্ম ও সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজপতি ও রাষ্ট্রীয় মূল্যবোধের প্রতীক মাজার-ব্যবসায়ী মজিদের চক্রান্ত মূলক প্রতিরোধের ফলে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সমগ্র উপন্যাসে এই একজন মাত্র শিক্ষিত লোকের সাক্ষাত পাওয়া যায়। অথচ-এ যুবক অপমানিত হয় অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ও নগ্নভাবে। আক্কাস গ্রামে স্কুল-প্রতিষ্ঠা করলে মজিদের জীবনে নতুন সংকটের সৃষ্টি হতে পারে, এ-আশংকায় কৌশলী মজিদ দাড়ি না রাখার সুযোগ নিয়ে আক্কাসের ব্যক্তিত্বকে খর্ব করে নিজের আত্ম-প্রতিষ্ঠাকে দৃঢ় করে। তার স্বার্থসিদ্ধির পথ সুগম করে। ইংরেজী পড়ার জন্য তীক্ষ্ণ বাক্যবান সহ্য করতে হয়। লেখক আক্কাসের চরিত্র-চিত্রণের মাধ্যমে প্রকারান্তরে মজিদের শ্রেষ্ঠত্বকেই প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন।

এ ছাড়াও 'লালসালু' উপন্যাসের কাহিনী বিস্তারের প্রয়োজনে লেখক তাহের, রেহান আলী, মোদাব্বের মিঞা, ধলা মিঞা, মতলুব, দুদু মিঞা, কালু, মতি, হাসুনির মা, হাসুনীর নানী প্রভৃতি চরিত্র অংকন করেছেন। এসব চরিত্র অনুজ্জ্বল হলেও গুরুত্বহীন নয়।

Dhaka University Institutional Repository


এ কথা অনস্বীকার্য যে, কেন্দ্রীয় চরিত্র মজিদের চরিত্র অঙ্কনেই ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রধান কৃতিত্ব। এ চরিত্র সৃষ্টিতে লেখক কোন অস্পষ্টতা রাখেননি। যে মাজারকে কেন্দ্র করে অস্তিত্বের অধিকার রক্ষা করতে চেয়েছিল, তা ছিলো বানানো, দারিদ্র্য-মুক্তির একটি হাতিয়ার মাত্র। কিন্তু তারও যে বাঁচবার অধিকার আছে সে কথাটিই সামগ্রিক চিন্তার মধ্যে প্রধান হয়ে ওঠে। উপন্যাসটির শুরু হয়েছে এক ইশারায় শেষ হয়েছে আর এক ধূসরতায়। লেখকের ভাষায়–"শস্যহীন জনবহুল এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের বেরিয়ে পড়বার ব্যাকুলতা ধোঁয়টে আকাশকে পর্যন্ত যেন সদা সন্ত্রস্থ করে রাখে 'সমাপ্তি বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে চোখ।"[১৩] এক ধূসরতায় শুরু আর এক ধূসরতায় শেষ-মধ্যবর্তী পরিসর বহু বর্ণময় জীবনের। সব তুচ্ছতা শেষ পর্যন্ত এক অর্থময় অনির্বচনীয়তায় ভরে যায়। উপন্যাস যদিও শেষ হয় সংগ্রামশীল মজিদের এক ধরনের ব্যর্থতায়, অন্ধকারে। তবু তার-ই মধ্যে আশার একটি অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত থাকে।

## ১.খ. চাঁদের অমাবস্যা

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র দ্বিতীয় উপন্যাস 'চাঁদের অমাবস্যা' (১৯৬৪)। 'লালসালু'র পাশে 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাস হিসেবে সর্বাংশে নিরীক্ষা প্রবণ। 'লালসালু' সমাজমনস্ক উপন্যাস। এতে ব্যক্তি ও জনজীবনের চিত্র প্রচুর ও বিপুলভাবে আকীর্ণ। কিন্তু 'চাঁদের অমাবস্যা' ভিন্নধর্মী উপাদানে সমৃদ্ধ। এ প্রসঙ্গে শিরিণ আখতারের বক্তব্য স্মরণীয়–"এ-উপন্যাসের যে-কাহিনী, তা জীবনের একটি সাধারণ বৃত্তান্ত বা চিত্রমাত্র নয় এবং পরিস্থিতির অভিনবত্ব ব্যক্তিমানুষের চিত্তে মনোজাগতিক যে সংকট ও আলোড়ন সৃষ্টি করে তার জটিল বুনোনিকে ফুটিয়ে তোলাই এখানে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র লক্ষ্য।"[১৪]

'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসের কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে একটি যুবতী নারীর মৃত্যু এবং জ্যোৎস্না-প্লাবিত রাত্রে বাঁশ ঝাড়ের ভেতরে তার মৃতদেহ আবিষ্কার। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ এ-ঘটনাকে আরেফ আলীর জীবনভাষ্য রচনার মধ্যদিয়ে উপস্থাপন করেছেন। তার চরিত্রের মানস-পরিক্রমা ও বিশ্লেষণের ধারাতেই অগ্রসর হয়েছে উপন্যাসের কাহিনী। আর তার সূত্রপাত হয়েছে আরেফ আলীর আকস্মিক ভাবে এক জ্যোৎস্না প্লাবিত রাত্রে বাঁশঝাড়ের মধ্যে যুবতী নারীর মৃতদেহ দেখার পর। সে-ঘটনা কেন্দ্রিক জটিলতায় আক্রান্ত হয় এবং তা অতিক্রম করতে গিয়ে তার নিরাবেগ অন্তরে দ্বন্দ্বময় আবেগের সূচনা হয়। শুরু হয় তার আত্মদ্বন্দ্ব ও আত্মজিজ্ঞাসা। এ উপন্যাস সম্পর্কে শিরিণ আখতার আরো বলেছে–"উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র আরেফের সদা জাগ্রত বিবেকের চেতনার স্বাক্ষর। এই জীবন চেতনার রূপায়ণে ওয়ালীউল্লাহ্‌ আমাদের উপন্যাসের ঐতিহ্যগত কাঠামোতে ঘা দিয়েছেন এবং সাহসী শিল্পীর সৃজনশীলতা নিয়ে এ উপন্যাসের ঐতিহ্য এবং উদ্ভাষণকে সমন্বিত করেছেন।"[১৫]

Dhaka University Institutional Repository


'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয় হচ্ছে একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে উত্তরণের স্তরকে অঙ্কিত করা। উপন্যাসের প্রথম দুটি পরিচ্ছেদে আরেফ আলীর চেহারাটা স্পষ্ট নয়। শুধুমাত্র সে একজন যুবক শিক্ষক এবং সে দাদা সাহেবের বাড়িতে জায়গীর থাকে। এই দুই পরিচয় ছাড়া আর তেমন উল্লেখযোগ্য পরিচয় নেই। তৃতীয় পরিচ্ছেদে লেখক বলেছেন–"আরেফ আলীর বয়স বাইশ-তেইশ। কিন্তু তার শীর্ণ মুখে ; অনুজ্জ্বল চোয়ালে বয়োতীত ভাব যৌবন ভার সে যেন বেশীদিন সহ্য করতে পারে নি। সে মুখে হয়ত যৌবন কণ্টক জন্মেছিল। কখনো যৌবন মূল্য পুষ্পোদগম হয় নাই । কয়েক বছর আগে মদ্রাসা হাদিসের প্রভাবে দাঁড়ি রেখেছিল, আজ সে দাঁড়ি নাই। কিন্তু এখনো মনে হয় থুৎনীর নীচে কেমন উলঙ্গতার ভাব। খাড়া নাক, চিকন কপাল ঈষৎ সমুন্নত চোখে একটু কাঠিন্যভাব। তবে রসশূণ্য স্বাস্থ্যের জন্যই তার চোখ কঠিন মনে হয়। লক্ষ্য করে দেখলে সে চোখের সরলতা, সময়ে সময়ে অসহায়তাও নজরে পড়ে। কখনো কখনো তার মধ্যে ঔদ্ধত্য ভাব ও দম্ভ দেখা যায় তবে একটু অহংকার নাই যে, তা নয়। দম্ভ ঔদ্ধত্য না হোক শিক্ষক হলে অহংকার না হয়ে পারে না। তবে সেটা কৃত্রিম নয় বলে সযত্নে ঢেকে রাখে, শুধু ক্বচিত কখনোই তার আভাস পাওয়া যায়।"[১৬]

বস্তুত, পুরো উপন্যাসে আরেফ আলীর মানস প্রতিক্রিয়ার প্রতিই লেখকের চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে আছে। তটিনী জলে লাশ ভাসিয়ে দেবার পর আরেফ আলীর বুক নদীর বুকের মত শূণ্যতায় খাঁ খাঁ করে। পঞ্চম পরিচ্ছেদ থেকে আরেফ আলীর মানস যাত্রার ক্ষীণ ও তীব্র ফল্গু নদী ক্রমশ ভীষণ ও চওড়া হতে থাকে। লেখকের ভাষায়–"গতরাতে নদী থেকে ফিরবার সময় তার মনে হয়, তার চিন্তাশক্তি সত্যিই লোপ পেয়েছে। কেবল সে বোঝে তার কিছুই করার নাই, শুধু অপেক্ষা করতে পারে। হয়তো কোথাও কিছু ঘটবে, কোথাও আলো দেখতে পাবে, তার বিচিত্র অভিজ্ঞতার মর্মার্থ বুঝতে পারবে।"[১৭] এভাবেই শুরু হয়েছিল প্রায় একটি শূন্য থেকে। কিন্তু ক্রমশ একরাশ জিজ্ঞাসা ফুটে উঠতে থাকে। এরপর ক্রমাগত আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মতদন্ত, আত্মবিশ্লেষণ, ব্যক্তিমানসের বিচিত্র ফলন-প্রতিফলন, ছায়া-উপছায়া-প্রতিছায়া নৈর্ব্যক্তি, আত্মদৃষ্টিপাত প্রথমে একান্তভাবে পরে ফল্গু নদীর অর্ন্তগত মোহনায় গিয়ে পড়েছে বিশাল বিস্তারে। "না, আরেকটি কথা আছে যা হয়তো সে কাদেরকে কেন, কাউকে বলা যায় না। বাঁশ ঝাড়ের কথাটি প্রকাশ করা যায় না সেটি কাদের আর তার গোপন কথা। শরীরের গোপন স্থানে গুপ্তক্ষতের মত। এমন কথা কাউকে বলা যায় না।"[১৮]

ঘটনাবলীর বিন্যাসে আরেফ আলীর মানসলোকের নব-নব বিশ্লেষণ তৈরী হতে থাকে। সে বার বার নতুন নতুন পরিকল্পনা আটতে থাকে। কিন্তু বিভিন্ন যুক্তি ও কারণের মূল্য উদ্‌ঘাটন করতে ব্যর্থ হয়ে এক সময় সে অভিষ্ট চূড়ায় এসে দাঁড়ায়। এক সময় তার চিন্তাশক্তি লোপ পেয়ে শূণ্যের কিনারায় এসে উপনীত হয়। আরেফ আলীর অন্তঅভিযাত্রা এই উপন্যাসের মূল বিষয়। এ প্রসঙ্গে আবদুল মান্নান সৈয়দের উক্তি স্মরণীয়-"আরেফ আলী ও তার মনোলোককে আবিষ্কার করেছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্। এই আবিষ্কার

Dhaka University Institutional Repository


কিছুতেই অক্ষিত নয়। দেশ মৃত্তিকার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশ্রিত। সমাজ সত্তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সংলগ্ন এবং শেষ পর্যন্ত একটি যেন জিজ্ঞাসার বিন্দু জ্বলে ওঠে, জ্বলতে থাকে, তা দার্শনিক বটে কিন্তু সমাজোৎসারিতও বটে। বিশ শতাব্দীর উপন্যাসে যে অনায়কোচিত নায়ক তৈরীর এতিহ্য বিধৃত, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র যাত্রা বরং সেই পথেই।"[১৯]

'চাঁদের অমবস্যা'র মূল চরিত্র যুবক শিক্ষক কাদের চরিত্রের দরবেশী তথা জীবনযাপনের রহস্যময়তা নিয়ে যৎসামান্য উৎসুক। যুবক শিক্ষক জ্যোৎস্না আমন্ত্রিত কিন্তু ভীরু। তাই জনৈক যুবতী নারীর খুন হওয়া নিয়ে আরেফ আলীর মনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াই উপন্যাসের মূল উপজীব্য। বস্তুত এ উপন্যাসে সৈয়দ ওয়ালীউল্লার শিল্প যাত্রার লক্ষ্য মনোজগতের উদ্‌ঘাটন। তাই উপন্যাসের সমগ্র পরিধি যুবক শিক্ষকের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এবং অতিক্রিয়াই প্রধান ভাবে উপস্থিত। এ প্রসঙ্গে জীনাত ইমতিয়াজ আলী বলেছেন–"এ উপন্যাসে বাইরের ঘটনা গৌণ। আরেফ আলীর অন্তলোকে সৃষ্ট ঘটনার স্রোতই মুখ্য, তারই অতিখনন, একটি পর্যায় থেকে আর একটি প্রান্তে উপনীত হওয়ার মধ্যবর্তী পর্বের যন্ত্রণা, মানস দ্বন্দ্ব পরিণামী চিন্তার ব্যাকুল অন্তঃকরণ, জাগরিত সত্তার বর্ণবহুল, ইঙ্গিতধর্মী ও পারম্পর্য আশ্রয়ী বর্ণনার মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়েছে ঔপন্যাসিকের মৌল বক্তব্য স্পষ্ট হয়েছে তার অভীপ্সিত প্রতিপাদ্য।"[২০]

একমাত্র নারী চরিত্র 'যুবতী নারী'র কোন প্রত্যক্ষ উপস্থিতি উপন্যাসে নেই। তার মৃত্যুর পরই উপন্যাসের যাত্রা শুরু। কাদের, দাদা সাহেব, স্কুলের অন্যান্য সহযোগী শিক্ষকবৃন্দ, পুলিশ কনেষ্টেবল প্রত্যেকেই উপন্যাসে ক্ষণিক উপস্থিত। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যুবক শিক্ষকের চরিত্রের ব্যাপ্তি ও গভীরতা দানের জন্যেই তাদের চরিত্র সৃষ্টি। এ উপন্যাসে জীবনের নিরর্থকতা খুবই স্পষ্টভাবে দ্যুতিত হয়েছে লেখকের ভাষা–"লণ্ঠনের মৃদু আলোয় ঘরের অন্ধকারটা অবশেষে কাটে মশারী সরিয়ে কাদের বিছানার কোণে বসে। একবার তাদের চোখা-চোখি হয়। তারপর কাদের কতক্ষণ নিশ্চল হয়ে বসে থেকে অকস্মাৎ আঙ্গুল মটকাতে শুরু করে। দশ আঙ্গুল থেকে দশাধিক আওয়াজ বের করে সে পকেট থেকে সিগারেটের বাক্স বের করে একটি সিগারেট ধরায়।"[২১] 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসের কাহিনী নির্ভরতা অস্পষ্ট। এ উপন্যাসে চৈতন্য বিভাজন ও দার্শনিকতার ওলট-পালট এবং জীবনের গূঢ় গভীর অর্থ অনুসন্ধানেই এর তাৎপর্য নিহীত। শেষ পর্যন্ত যুবক শিক্ষক সিদ্ধান্ত নেয় যে, 'যুবতী নারীর খুনের' ব্যাপারটি সে প্রকাশ করে দেবে। তাই সে প্রথমে ঘটনাটি দাদা সাহেবকে অবহিত করে। তারপর দু'ক্রোশ দূরে আদালতের সামনে 'ঘাস শূণ্য বৃক্ষ ছায়াচ্ছন্ন এক কোণে যে থানা' সেখানে। কিন্তু যুবক শিক্ষক পূর্বেই যে পরিণাম ভেবে রেখেছিল তাই হলো। যুবক শিক্ষক অভিযুক্ত হলেন। তবুও তাতে যুবক শিক্ষকের কোন ভাবান্তর নেই। লেখকের ভাষা–"সে যেন নদীর মতোই একটি গন্তব্য স্থলের দিকে ভেসে যাচ্ছে। সে গন্তব্যস্থল দেখতে পায়

Dhaka University Institutional Repository


না, সেখানে তার প্রশ্নের সঠিক উত্তর আছে কিনা তা ও সে জানে না। তবে নদীর ধারা যেমন থামানো যায় না বা তার দিক পরিবর্তন করা যায় না তেমনি তার পক্ষে থামা বা দিক পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।"[২২]

আধুনিক জীবনবোধের মানসিকতা আরেফ আলীর চরিত্রকে করেছে দ্বিধান্বিত। আর এই বোধ সৃষ্টি হয়েছে অনুশোচনা থেকে। খুনি কাদেরের সাথে যুবতী নারীর মৃতদেহ বাঁশঝাড় থেকে নদীতে সরিয়ে ফেলার সে নিজেকে ক্ষমা করতে পারে না। কাদের তার কাছে গুরুতর অপরাধ স্বীকার করেছে কিন্তু সে তা কর্তব্য বলে মনে করেছে। আবার চন্দ্রালোকের আলোতে সে কেন কাদেরকে অনুসরণ করেছিলো : হয়তো সে পিছু পিছু না গেলে যুবতী নারী খুন হতো না কাদেরের হাতে এই অপরাধবোধও তার মনে জেগে ওঠে। এই যন্ত্রণা কাতরতা থেকে সে মুক্তি চেয়েছে। কিন্তু এ মুক্তির পথ থেকে এসে দ্বিধায় জর্জরিত হয়েছে আর এর ফল হিসেবে আরেফ আলীর চরিত্র বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সমাজ বিকাশের জীবনরূপটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে ডক্টর রফিকউল্লাহ খান বলেছেন– "বিভাগোত্তর দ্বিতীয় দশকের গ্রাম জীবন, তার বর্হিকাঠামো : অন্তঃসংঘাত এবং পরিবর্তনশীলতার লক্ষণ সমূহ এ উপন্যাসে বিন্যস্ত হয়েছে। আরেফ আলী ব্যক্তি-পরিচয় ও মানস গঠনের মধ্য দিয়ে নবোদ্ভূত গ্রামীণ মধ্যবিত্তের বিকাশ সম্ভাবনা যেমন সুস্পষ্ট তেমনি দাদা সাহেব আলফাজ চৌধুরীর পরিবার ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিদ্যমান।"[২৩]

স্বল্প শিক্ষিত দরিদ্র পরনির্ভর ম্রিয়মাণ এবং দূর্বলচিত্ত যুবক শিক্ষক আরেফ আলী এক অচেনা যুবতী নারীর অবমাননার নিজের বিশ্বাস ভঙ্গের বেদনায় রূপান্তরিত হয় পূর্ণ মানুষে। আত্ম-অহংকার ও আত্ম-সম্মানবোধ তাকে যথার্থ অস্তিত্ববান মানুষে পরিণত করে। শুধু তাই নয় এই উপন্যাসের ঘটনার মূল কেন্দ্র যে তিনটি চরিত্র অর্থাৎ দাদা সাহেব, কাদের ও আরেফ আলী রয়েছে তার মধ্যে আরেফ আলী অস্তিত্ববাদী দর্শনে বিকশিত হয়েছে। ফলে পরান্নভোগী ও পরাশ্রয়ী হয়েও আরেফ আলী স্বাধীন ইচ্ছার পথে পা বাড়িয়েছে ব্যক্তির চৈতন্য উপলব্ধি জাত সত্য প্রকাশে : যে জীবনের নিশ্চয়তা পরিত্যাগ করে এক গভীর দায়িত্ববোধে যে নতি স্বীকার করেনি বাইরের শক্তির কাছে। এ প্রসঙ্গে আমিনুর রহমান সুলতান বলেছেন-"নাগরিক মানসিকতার গলি পথে যে কপটতার জন্ম তার বহিঃপ্রকাশও ঘটতে দেখি পুলিশ কাছারির মাধ্যমে, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন প্রতিপত্তিশালী গোষ্ঠীপক্ষ অবলম্বন করায়। নাগরিক মানসিকতার সামাজিক মূল্য বোধের যে রূপান্তর ঘটেছে এ-উপন্যাসে : তা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বাস্তব সত্যে তুলে ধরেছেন।"[২৪]

ঔপন্যাসিক এ-উপন্যাসের চরিত্রের মধ্য দিয়ে "নবোদ্ভূত শিক্ষিত মধ্যবিত্তের চেতনায় সত্য প্রকাশের আকাঙ্খা থাকলেও ধর্মভীতি, রাষ্ট্রভীতি, অস্তিত্বভীতি প্রভৃতির টানাপোড়েন সৃষ্টি করে সংকটাবর্তের। সে সংকট মুক্তির সাধনাই ষাটের দশকের বাঙালীর জীবন সাধনা। কেননা, এ উপন্যাসের আরেফ আলী বাংলাদেশের 'শিক্ষিত মধ্যবিত্ত' শ্রেণীরই প্রতিনিধি। অভ্যস্ত জীবনে ঘুণ পোকার মত বেঁচে থেকে সে নিঃশেষিত হয়নি। পরিণাম ভয় শূন্য ও অন্ধকারময় প্রান্তিক পরিস্থিতি অতিক্রম করে আরেফ আলী শেষ

Dhaka University Institutional Repository


পর্যন্ত সত্য উচ্চারণ করেছে বরণ করেছে স্বেচ্ছাবন্দিত্ব। কেননা, অমাবস্যা সত্য নয়, অমাবস্যা ক্ষণস্থায়ী আলোই একমাত্র সত্য ও ক্ষণস্থায়ী। তার কারাবরণও তাই প্রতিরূপকী মূল্য পায় ক্ষমতাবানদের স্বেচ্ছাচারী দাদা সাহেব কাদেরদের ভোগবাদী মানসিকতার বিরুদ্ধে গিয়ে বৃহত্তর মুক্তির জন্য আমাদের সংগ্রামী ও সংবদ্ধ হতে ডাক দেয়।"[২৫]

চাঁদের অমাবস্যায় "আধুনিক উপন্যাস অভিজ্ঞান ও প্রকরণ অনুসন্ধানী হয়ে আরেফ আলীকে ইয়োরোপীয় আধুনিক উপন্যাসের নায়কদের সহযোগী ও সহযাত্রী করে নির্মাণ করেও তিনি পূর্বের মতোই একটি বিশ্বাসযোগ্য ও প্রত্যহিক বাস্তবতায় দাঁড় করেছেন। দেশ কাল সংলগ্ন মধ্যবর্তী ও পরিপ্রেক্ষিত চরিত্র বিশেষত, কাদের দাদা সাহেব ও তাদের পরিবারের সদস্য বৃন্দ ; স্কুলের শিক্ষকমন্ডলী প্রভৃতির সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ গ্রামীণ সমাজ কাঠামো নির্মাণ করেছেন। ক্ষয়িষ্ণু জমিদার শ্রেণী ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের সমাজ অবস্থান ও জীবনার্থ ; গ্রামীণ শিক্ষা ব্যবস্থা আর্থিক কারণে সৃষ্ট গ্রামের সাধারণ মানুষের অসহায়ত্বের পরিচয় চাঁদের অমাবস্যার বহিঃবাস্তবতা করে তুলেছে জীবন বিশ্বাসযোগ্য। যে অর্থে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্'র 'চাঁদের অমাবস্যা' মানবিক অস্থিত্ববাদী দার্শনিক চিন্তার রূপালেখ্য; সাহিত্য কৃতি হয়েও মূলত হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমাবদ্ধ কোন অঞ্চলের ইতিকাহিনী।"[২৬]

মূলত 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসে আরেফ আলীর লড়াই গ্রন্থের প্রথম থেকে শেষ পযর্ন্ত নিজের আত্মসত্তার সঙ্গে। এদের কাউকেই দেখা যায় না। পুঙ্খানুপুঙ্খ আত্ম তদন্তের মধ্যদিয়ে নিজের চৈতন্যকে বারংবার মথিত মর্দিত করে শেষ পর্যন্ত সত্যের প্রসন্ন আলোয় আত্মমুক্তির পথ সন্ধান পায় যে জীবনের চরম সংকটে একজন অস্তিত্ববান মানুষের মতই স্বাধীন কর্মপন্থা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করে সমাজের প্রতি সমবসী অন্যান্য মানুষের প্রতি দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে আরেফ আলীর নবজন্ম হয়।

Dhaka University Institutional Repository


# ১.গ. কাঁদো নদী কাঁদো

'কাঁদো নদী কাঁদো' (১৯৬৮) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র তৃতীয় উপন্যাস। ঔপন্যাসিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র চিত্র সৃষ্টিশীল ও পরীক্ষা নিরীক্ষা ও জীবন জিজ্ঞাসার উপন্যাস। উপন্যাসটি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন ও বস্তুনিষ্ঠ ঔপন্যাসিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র বিচিত্র সৃষ্টিশীল ও পরীক্ষা নিরীক্ষা ও জীবন জিজ্ঞাসার শেষ স্বাক্ষর বহণ করে। ঘটনাগত বিন্যাস, আভ্যন্তর অন্তর্বয়ন কিংবা ঔপন্যাসিক শিল্পদৃষ্টি কোনো দিক থেকেই 'লালসালু' (১৯৪৮) অথবা 'চাঁদের অমাবস্যা'র অনুসৃত বা অনুবর্তন নয়। 'কাঁদো নদী কাঁদো' সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র পূর্ববর্তী উপন্যাসদ্বয় থেকে স্বতন্ত্র, উপন্যাসটি ঔপন্যাসিকের নিরীক্ষাপ্রবণ এবং বিশ্ব প্রসারী জীবনবোধ ও শিল্পদৃষ্টির অঙ্গীকারে সমৃদ্ধ।

'কাঁদো নদী কাঁদো'র ঘটনা দু'টি স্রোতধারা অর্থাৎ, মুহাম্মদ মুস্তফার অর্ন্তমুখী চেতনা ও কুমুরডাঙ্গার জনগোষ্ঠীর জীবন প্রবাহকে আশ্রয় করে উৎসারিত ও প্রবাহিত হয়েছে। ডক্টর রফিকউল্লাহ খান বলেছেন-"এ উপন্যাসের বহির্বাস্তবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কুমুরডাঙ্গার ইতিহাসলোকের অন্তঃপ্রবাহ। ব্যক্তিও সমষ্টির বর্তমান লগ্ন সক্রিয়তার বহুকৌণিক বৈশিষ্ট্যের নেপথ্য-লোকে আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও পারিবারিক পরিপ্রেক্ষিতের যে নিগুঢ় ভূমিকা বিদ্যমান, সম্পূর্ণ (Entire) জীবন রূপায়ণের প্রয়োজনেই তার অনিবার্যতা স্বীকৃত হয়েছে।"[২৭]

চলমান একটি ষ্টিমারের পটভূমিতে ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিকোণ মুহাম্মদ মুস্তফার চাচাতো ভাইয়ের অজিতালোকের সঙ্গে সমীকৃত হয়ে উপন্যাস কাহিনীর পট উন্মোচিত হয়েছে। কুমুর ডাঙ্গার সমষ্টি জীবন বিন্যাসে তবারক ভূঁইঞার প্রেক্ষণ বিন্দু ব্যবহৃত হলেও এই তৃতীয় ব্যক্তির দৃষ্টিকোণের ব্যবহার ঔপন্যাসিক কর্তৃক সতর্কতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে মুহাম্মদ মুস্তফার শূণ্যতা ও অন্ধকার আক্রান্ত চেতনা প্রবাহের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে 'কাঁদো নদী কাঁদো'র সমগ্র দৃষ্টিকোণ গড়ে উঠেছে। ঔপন্যাসিকের কৃতিত্ব এখানেই যে, "একাধিক চরিত্র সমীকৃত হওয়া সত্ত্বেও তার নিরাসক্ত সর্বজ্ঞতা বিপন্ন হয়নি। পরিমিত ও সুনিয়ন্ত্রিত দৃষ্টিকোণ থেকে উৎসারিত হয়েছে যে, উপন্যাসের পরিচর্যা রীতি। উপন্যাসের সূচনাংশে বর্তমান লগ্ন বাস্তবতার রূপাঙ্কণে চিত্র, দৃশ্য ও অনুভূতি প্রবাহের সমীকরণ ঘটেছে।"[২৮]

মুহাম্মদ মুস্তফার চাচাতো ভাইয়ের প্রেক্ষণ বিন্দু উৎসারিত পরিচর্যার পদ্ধতি লক্ষণীয় ঃ "লোকটিকে তখন দেখতে পাই তখন অপরাহ্ন, হেলে পড়া সূর্য গা ঘেঁষা হয়ে থাকা অসংখ্য যাত্রীর উষ্ণ নিঃশ্বাসে দেহতাপে এমনিতে উত্তপ্ত তৃতীয় শ্রেণীকে আরো উত্তপ্ত করে তুলেছে। সে-জন্যে, এবং রোদ ঝলসানো দিগন্ত বিস্তারিত পানি দেখে দেখে চোখে শ্রান্তি এসেছিল, তন্দ্রার ভাবও দেখা দিয়েছিল। তারপর কখন নিকটে গোল হয়ে বসে তাস খেলায় মগ্ন একদল যাত্রীর কেউ হঠাৎ চীৎকার করে উঠলে তন্দ্রা ভাঙে, দেখি

Dhaka University Institutional Repository


আমাদের স্টীমার প্রশস্ত নদী ছেড়ে একটি সংকীর্ণ নদীতে প্রবেশ করে বাম পাশের তীরের ধার দিয়ে চলছে : উঁচু খাড়া তীর, তীরের প্রান্তদেশ ছুয়ে ছোট ছোট ছায়াশীতল চালা ঘর, এখানে সেখানে সুপারিগাছের সারি, পেছনে বিস্তীর্ণ মাটি, আরো দূরে আবার জনপদের চিহ্ন। সে সব তাকিয়ে দেখছি এমন সময়ে কি কারণে পাশে দৃষ্টি গেলে সহসা লোকটিকে দেখতে পাই।"[২৯]

'অতিশয় দুর্বৃত্ত' পিতা খেদমতুল্লাহ্‌র সন্তান মুহাম্মদ মুস্তফা দুঃসহ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নিজের চেষ্টায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করে এবং শিক্ষানবীশ কুমুরডাঙ্গার ছোট হাকিমের চাকুরী করে। ইতিমধ্যে তসলিম নামক একজন অন্তরঙ্গ সুহৃদ বন্ধুর ঘটকালীতে সদ্য অবসরপ্রাপ্ত উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারী আশরাফ হোসেন চৌধুরী সাহেবের তৃতীয়া কন্যার সঙ্গে তার বিবাহ ঠিক হয়। কিন্তু এ খবর জানার পর মুহাম্মদ মুস্তফার জন্যে তার ফুফাত বোন খোদেজা আত্মহত্যা করে। আর খোদেজার এ আত্মহত্যার জন্যে মুহাম্মদ মুস্তফাকে দায়ী করার পিছনে তাদের পারিবারিক একটি 'প্রতিশ্রুতি' কাজ করে। "বিধবা হয়ে ছয়-সাত বছরের খোদেজাকে নিয়ে ছোট ফুফু যখন উত্তর ঘরে আশ্রয় নেয় তখন মুহাম্মদ মুস্তফার পিতা খেদমতউল্লাহ বোনের দুঃখে দুঃখ পরবশ হয়ে স্থির করে মুহাম্মদ মুস্তফা বড় হয়ে খোদেজাকে বিয়ে করবে।"[৩০] মুহাম্মদ মুস্তফার আচরণও এই প্রতিশ্রুতিকে পরোক্ষ প্রতিষ্ঠা দান করেছে। "প্রতিবার দেশের বাড়ীতে আসার সময় খোদেজার জন্যে সে টুকিটাকি উপহার নিয়ে আসতো।"[৩১]

কিন্তু মুহাম্মদ মুস্তফার উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য দূরে আসার পর সে খোদেজাকে বাগদত্তা স্ত্রী ভাবেনি। তার শ্রেণী অবস্থানও তা অনুমোদন করে না। মুহাম্মদ মুস্তফার অন্তরে খোদেজার স্থান না থাকলেও খোদেজার অন্তরে সেই অতীত প্রতশ্রুতি দানা বেধে থাকে। আর এ কারণেই মুহাম্মদ মুস্তফার চিঠি অন্তঃসার কিছুক্ষণ পরেই খোদেজার মৃত্যু ঘটেছিল।' বলে পরিবারের সবার ধারণা জন্মে যে, মুহাম্মদ মুস্তফার 'চিঠিই মেয়েটির মৃত্যুর কারণ'- এ সম্পর্কে জীনাত ইমতিয়াজ আলী বলেছেন-"মানুষের অন্তর্লোকে সবচেয়ে দুর্গম : বুদ্ধি বিবেচনার অনধিগম্য এক এলাকা। মানুষ নিজেই অনেক সময় তার মনের খবর জানে না। তাই সজ্ঞানে, নিজের চেতন সত্তায় নির্দোষ বলে মনে হলেও মুহাম্মদ মুস্তফার অবচেতন মনে অপরাধবোধ জাগে।"[৩২]

'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসে মুহাম্মদ মুস্তফার কাহিনী সংক্ষিপ্ত, কিন্তু কুমুরডাঙ্গার উপাখ্যান সুদীর্ঘ কলেবরে বিস্তৃত, ব্যাপক জনগোষ্ঠীর সামবায়িক উপস্থিতি অগ্রসরমান। ফলে কোন একক চরিত্র কিংবা পরিবার এ পর্যায়ে ঔপন্যাসিকের এককভাবে আকর্ষণ করেনি। সমগ্র জনপদের প্রতিই রয়েছে তার সজাগ দৃষ্টি। জীনাত ইমতিয়াজ আলীর বক্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়- "কুমুরডাঙ্গার নিস্তরঙ্গ ও পুনরাবৃত্ত জীবনের জাগরণ প্রকম্পিত। বাকাল নদীতে চর পড়ে ষ্টীমার চলাচল বন্ধ। অর্থাৎ বহির্বিশ্ব থেকে এমনই ক্ষুদ্র শহরটি বিচ্ছিন্ন হলে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতার সৃষ্টি হয়েছে। কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীদের তাই দ্বিবিধ পরিচয়। প্রথমত,

Dhaka University Institutional Repository


তারা চলমান জীবন স্রোতের সঙ্গে সমীকৃত। দ্বিতীয়ত, ষ্টীমার চলাচল বন্ধ হওয়ার ফলে সৃষ্ট তাদের দুর্ভাবনা ও পরিণামী অনিশ্চয়তাবোধে বিপন্ন অন্তকরণজাত প্রতিক্রিয়াসহ উপস্থিত।"[৩৩]

এ উপন্যাসে কুমুরডাঙ্গার বিভিন্ন শ্রেণী ও সমাজ অবস্থান থেকে ঔপন্যাসিক যে সব চরিত্র নির্বাচন ও নির্মাণ করেছেন তাদের মধ্যে খতিব মিয়া, কফিলউদ্দিন, বোরহান উদ্দিন, হাবু মিয়া, রহমত মিঞা, তাহের, সুলতান, রোকন উদ্দিন, মোহনচাঁদ, ছলিম মিঞা, করিমন-নেছা বানু, মিহির ফজল, কানু মিঞা ও সুরত মিঞা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসে খতিব মিয়া ঘাটের স্টেশন মাষ্টার। ষ্টীমার না আসার সংবাদ প্রথম কোম্পানীর সদর দফতর থেকে প্রেরিত তার মারফত পেয়েছে। খতিব মিয়ার দীর্ঘ জীবনে এমন ঘটনা না ঘটায় সে বিচলিত হয়ে পড়ে। সে কুমুরডাঙ্গার কলা চাষীদের কথা চিন্তা করে। তাছাড়া সে নিজের থেকেও কোম্পানীর প্রতি বিশ্বস্ত। নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষের প্রতি অতিমাত্রায় নিষ্ঠ থেকে কর্তব্য পালনের মধ্যেই খুঁজে পায় জীবনের সার্থকতা, কর্ম সম্পাদনে সন্তুষ্টি ও আত্মিক আনন্দ।

কফিল উদ্দিন কুমুরডাঙ্গার সবচেয়ে সফল আইনজীবী। শহরের নদীমুখো এবং অন্যান্য বাড়ির তুলনায় মস্তবড় বাড়ির মালিক। শহরবাসিনী অতি আদুরে মেয়ে হোসনাকে অধিক দিন না দেখে থাকতে পারেনা। নদীপথে তাই প্রায়শই তাকে শহরে যেতে হয়। একদা সে উদ্দোশ্য নদীর ঘাটে এসে জানতে পারে স্টীমার আসবে না নদীতে চরা পড়েছে। কিন্তু এই সত্য কথাটি সে সহজভাবে নিতে পারেনি। তার মনে হয়েছে স্টীমার বন্ধ হওয়া ষড়যন্ত্রমূলক। কফিল উদ্দিন অতঃপর কয়েকজন উকিল মোক্তার, হেকিম, ডাক্তার এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এর সভা ডেকে এ বিষয়ে জোর কলমে সরকারের কাছে পত্র লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কফিল উদ্দিনের আশংকা ক্রমান্বয়ে সত্যে পরিণত হয়েছে। কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীরা বুঝেছে যে,চরা নদীতে নয়, শহরবাসীর বুকেও তা 'ভার হয়ে জেগে' উঠেছে। 'ঝোকের মানুষ' কফিল উদ্দিন স্থির করেছে যে, তার পক্ষে কুমুরডাঙ্গা বাস করা সম্ভব নয়। অতএব, সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বজরায় ওঠে সে। কিন্তু কফিল উদ্দিনের আর কুমুরডাঙ্গা ছাড়া হয়নি, নদীর ঘাটেই তার মৃত্যু হয়েছে।

ডাক্তার বোরহানউদ্দিন 'অকাল বৃদ্ধ' চল্লিশে পৌঁছানোর পূর্বেই শিরদাড়া বক্র-নূব্জ। রোগীদের কাছে একজন 'নিতান্ত ভালোমানুষ' বলে পরিচিত বোরহানউদ্দিন পেশাগত জীবনে অসুখি ও অতৃপ্ত। সে অভ্যস্ত জীবন প্রবাহেই নিমজ্জিত। সে চলমান ও পরিচিত জীবন প্রবাহে সমর্পিত হয়ে মুক্তিঅন্বেষী লোকজীবনেরই সে প্রতিনিধি, প্রতিভূ।

সখিনা মোক্তার মোসলেম উদ্দিনের মেয়ে, মেয়েদের মাইনর স্কুলের শিক্ষকা। তার হাঁটার ভঙ্গিতে ঈষৎ মাজা ভাঙ্গা ভাব এবং সখিনার হারগোড় না বাড়লেও তার মধ্যে 'দ্বিতীয়বার চাঁদের মত অতি সঙ্গোপনে

Dhaka University Institutional Repository


ক্রমে যৌবনও দেখা' দিয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ক সচেতনতা সখিনার নেই। রুগ্ন মায়ের সাংসারিক দায়িত্বভার নিজের অজান্তেই তার উপরে এসে পড়েছে। স্কুলের চাকরি করেও সে সংসারের সব দায়িত্ব পালন করে। তবে তার সম্পর্কে কুমুরডাঙ্গার গ্রামের মানুষের কৌতূহল অনেক। সে যখন ছাতা মাথায় দিয়ে প্রতিদিন প্রায় একই পোশাকে স্কুলে যায় এবং ফিরে আসে তখন দু'পাশের বাড়িঘর, দোকানপাট থেকে অনেক লোক তাকে চেয়ে চেয়ে দেখে'। বস্তুতঃ উকিল কফিল উদ্দিনের মৃত্যু, শহরে যেতে গিয়ে ব্যর্থ হাবু মিঞার রুগ্ন ছেলেসহ প্রত্যাবর্তন, কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীদের জাগরিত, তাদের মধ্যে একটি সচেতনতার জন্ম দিয়েছে। তারা বুঝেছে, সত্যিই নদী মরে গেছে, তাদের বিচ্ছিন্ন ও সীমাবদ্ধ জীবন হয়ে পড়েছে সংকীর্ণ ও নিস্তরঙ্গ। সখিনা অতঃপর এই যন্ত্রনাবোধ বিবিক্তি চেতনাকেই করেছে আরো ঘনিভূত ও সূচীমুখ অকস্মাৎ সে একটি কান্না শুনেছে ঃ "কোথায় একটি নারী কাঁদছে। যে কান্না কখনো আচমকা ঝড়ের মত কখনো ধীরে ধীর বিলম্বিত বিলাপের মত শুরু হয়।"[৩৪]

উপন্যাসের প্রধান কোন চরিত্র না হলেও ছলিম মিঞার পূর্ণ পরিচিতি আমাদের সামনে উদঘাটিত। তার ব্যবসার লাভ-লোকসান নিয়ে তার কোন মাথা ব্যথা নেই। দোকানদারী ছাড়াও চাষাবাদও করে। একেবারে ছোটবেলায় সে এতিম হয়। আবার মধ্য বয়সে পৌঁছেও কোন সন্তান তার গৃহকে কলরব মুখরিত করেনি। এ দিকে নদীর কান্নার খবরটিকে সে অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দিতে চাইলেও সমগ্র কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীরা এ খবরে গভীর আস্থা ব্যক্ত করায় সেও বিচলিত বোধ না করে পারেনি। এ প্রসঙ্গে মুহম্মদ ইদ্রিস আলীর বক্তব্য স্মরণীয় "তার চরিত্রের যে অস্বাভাবিকতাটুকু, তার কারণ সম্ভবত ছোটবেলায় মাতা পিতার স্নেহ শাসন থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং পরিণত বয়সেও সন্তানের জনক না হতে পারায় জীবন সম্পর্কে ব্যর্থতাবোধ।"[৩৫]

স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা করিমুন্নেসা বানু 'বহু সমস্যা জর্জরিত' এক বিধবা। শিক্ষিকা কিংবা ছাত্রীদের উপর তার প্রসন্ন দৃষ্টি কদাচিৎ পড়ে। স্কুলে সখিনাকে প্রবেশ করতে দেখে তাই সে বলেছে "এই যে তুমি এসে গিয়েছো"[৩৬] পূর্বাভ্যাসবশত কথাটি বলেই করিমুন্নেসা অপ্রস্তুত বোধ করে। ফলে, "কয়েক মূহুর্তে অস্বস্তিকর নীরবতা' কাটানোর পর করিমুন্নেসা পুনরায় সখিনাকে বলেছে-তুমি নাকী একটি কান্নার আওয়াজ শুনতে পাও ?"[৩৭] অর্থাৎ, কান্না শুনার পর সখিনা খাতুনের প্রতি করিমুন্নেসা আর আগের মত ব্যবহার করতে পারেনি। সখিনার প্রতি তারও জেগেছে সম্ভ্রম, ভয়। সখিনা খাতুনের শোনা কান্না আর তার নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, অন্যেরাও তা শুনেছে। তরারক আলী মুন্সীর পর্দানশীল স্ত্রী জয়নাব খাতুনও 'বিচিত্র কান্নার আওয়াজ' শুনতে পেয়েছে। বৃদ্ধ দর্জি করিম বকস্‌ও যখন সাধন কর্মে নিয়োজিত ছিল তখন তার মনে হয়েছে কোথাও যেন একটি বানবিদ্ধ পাখি তীক্ষ্ণস্বরে আর্তনাদ করছে। কিন্তু কুমুরডাঙ্গার মোল্যা মৌলভীদের সিদ্ধান্ত ভিন্ন। তাদের মতে 'খোদার দুনিয়ায় নানা প্রকারের শব্দ হয়'। কান্নার শব্দটি অনুরূপ কোন আওয়াজ।

Dhaka University Institutional Repository


থানার প্রধান দারোগার নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটিও গঠিত হয়। কিন্তু অলিগলি অনুসন্ধান করেও কারার রহস্য উদঘাটন করা যায়নি।

আত্ম প্রতারণা-দ্বিধা-সংশয় ও বাস্তব কর্তব্যচ্যুতি ধীরে ধীরে মুস্তফাকে এমন এক অতল গহ্বরের প্রান্তে এনে ফেলেছে যেখান থেকে তার ফেরার কোন পথ নেই। 'কাঁদো নদী কাঁদো' ব্যক্তির সুতীব্র সংকটের রূপায়, চেতন অবচেতন লোকে ভ্রাম্যমান মানুষের অস্তিত্ব জিজ্ঞাসার নিপূণ ছবি এ উপন্যাস। নিয়তি চালিত মুহাম্মদ মুস্তফার জীবনে ট্র্যাজিক বোধের সূচনা ও শেষের কাহিনী এ উপন্যাসের মূল উপজীব্য হয়ে উঠেছে।

বস্তুত, আধুনিক জীবন দৃষ্টি, কাহিনী বর্ণনা ও চরিত্রের কাঠামোতে নিটোল ফ্রেমে বেঁধে এক অপূর্ব ঐক্যতান সৃষ্টি বিশ্ব সাহিত্যের আধুনিক রূপরীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সেই সঙ্গে ঐতিহ্যের সৃজনশীল ব্যবহারের দিক থেকে এ উপন্যাস সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র অন্যতম সার্থক উপন্যাস।

## ১.ঘ. নয়নচারা

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ উপন্যাসের মত ছোটগল্পেও বিশেষ সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্'র ছোটগল্প সম্পর্কে বিশ্বজিৎ ঘোষের বক্তব্য প্রণিধানযোগ–"শিল্পবোধ ও জীবন চেতনার প্রশ্নে পূর্বাপর সতর্ক। সপ্রতিভ এবং বিশ্ববিস্তারী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র গল্পসমূহ বাংলা সাহিত্যের ধারায় সংযোজন করেছে এক স্বকীয় মাত্রা। যুদ্ধোত্তর বিনাশী প্রতিবেশে বাস করে মানবীয় অস্তিত্বের ক্লান্তিহীন সাধনায় তিনি ছিলেন স্থিতপ্রাজ্ঞ। নিরস্তিত্বের শূন্যতায় ফুরিয়ে যাওয়ার জীবন নয়,অন্ধকার ভেঙে ভেঙে অস্তিত্বের দায়িত্বশীল স্বাধীন সত্তায় উত্তীর্ণ হওয়াই তাঁর ছোটগল্পের মৌল বৈশিষ্ট্য।"[৩৮]

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ অনিবার্য ভাবেই তাঁর মননে বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের শেকড় অক্ষুণ্ন ও অবিচল রয়ে গেছে, পাশ্চাত্যের কোন প্রভাবই তার সেই অনুভবের ভূমি স্পর্শ করতে পারেনি। তবে পাশ্চাত্য সাহিত্যের নিবিড় অধ্যয়ন ও অনুশীলনের ফলে পশ্চিমা সাহিত্যরীতি সম্পর্কে তার যে নিজস্ব কিছু ধ্যান-ধারণা গড়ে ওঠে, তারই অভিজ্ঞতায় তিনি তার চর্চায় ফলনকে সুক্ষ্ম কায়দায় বিন্যস্ত করেছেন। দেশজ ঐতিহ্য ও উপাদানের ভিতর, কিন্তু "দেশজ চিত্র চরিত্রের উপর পাশ্চাত্য প্রভাবের আস্ফালনকে কোন ক্রমেই প্রাধান্য বিস্তার করতে দেন নি, সেখানে তার জন্মভূমি বাংলাদেশের স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় লালিত মানুষ গুলোই পঙ্কমলিনতার অবিশুদ্ধ কূপ থেকে অবলীলায় বেরিয়ে শুদ্ধ সাহিত্যের চরিত্রের মর্যাদা পেয়েছে। স্বদেশের প্রতি এই অটুট পক্ষপাতিত্বের জন্যেই তার ইউরোপীয় সাহিত্যাদর্শে পুষ্ট মননের গভীরতা থেকে

Dhaka University Institutional Repository


তিনি তার ছোটগল্পের শিল্পবলয়ে বাংলাদেশের আঞ্চলিক জীবনকে এমন অপার মমতায় রূপ দেওয়ায় প্রেরণা পান।"[৩৯]

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র শিল্পী মানস তাঁর ছোটগল্পের বলয়ে যে জীবনের অনুসন্ধান করেছে সেই জীবন বিধৃত হয়েছে বাংলাদেশের দূরদূরান্তের কোনো প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনজীবনকে ভর করে। এই বাস্তবতা বোধ, এই স্বদেশ সংলগ্নতাই প্রকৃতপক্ষে তাঁর মননকে পাশ্চাত্যের অনভিপ্রেত প্রভাব থেকে রক্ষা করেছে, অনুপ্রাণিত করেছে তাঁকে স্বদেশাভিমুখী হতে। তিনি গল্পের অভিলক্ষ শিল্প এবং অনুশীলনকৃত শিল্পের অভিব্যঞ্জনা প্রায় সচেতন ভাবেই সিদ্ধ করেছেন, সুতরাং তাঁর গল্প গুলোও জীবন সম্পৃক্ত অকৃত্রিম প্রকাশের ভেতর দিয়ে যর্থাথ শিল্পরূপ লাভ করেছে। বলা বাহুল্য এই শিল্পজ্ঞান সৃজনশীলতারই পরিপূরক রূপে কাজ করেছে। তিনি "বস্তুকেন্দ্রী বিষয়কে বস্তু অতিক্রমী দৃষ্টিতে দেখার যে প্রবণতা ওয়ালীউলাহ্ মানসে সক্রিয় তারই শিল্প কৌশলটির ধার তাতে পুরোমাত্রায় বিদ্যমান।"[৪০]

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র অধিকাংশ গল্পই মনস্তত্ত্বধর্মী ও মনোময়। সমাজের বর্হিবাস্তবতার চেয়ে মানব জীবনের অন্তর্বাস্তবতার জগতে বিচরণ করতে তিনি অধিক উৎসাহী। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আকরম হোসেনের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য- "গল্পের বিষয় নির্বাচনে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ছিলেন বাংলাদেশের জনজীবন সম্পৃক্ত, কিন্তু বক্তব্য ও প্রকরণে সর্বজনীন, বিশ্ব প্রসারিত, স্বনিষ্ট এবং পরীক্ষা প্রিয়। চেতনা ও আঙ্গিকে তাঁর গল্প সমূহ যেন তার পরিব্যাপ্যমান জীবনবোধের অনুবিশ্ব, মানুষের অস্তিত্ব অভীপ্সা, নৈঃসঙ্গ,ভয় অনুশোচনা প্রভৃতি তার গল্পের উপজীব্য।"[৪১]

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ গল্পগ্রন্থের সংখ্যা দু'টি। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'নয়নচারা' (১৯৪৪) 'পূর্বাশা' প্রকাশনী থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। 'নয়নচারা' গল্পগ্রন্থে সর্বমোট আট-টি গল্প স্থান পেয়েছে। ১.নয়নচারা, ২.জাহাজী, ৩.পরাজয়, ৪.মৃত্যুযাত্রা, ৫.খুনী, ৬.রক্ত, ৭.খণ্ড চাঁদের বক্রতায় ও ৮.সেই পৃথিবী। 'নয়নচারা' গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবন চিত্রিত হয়েছে। পঞ্চাশের মনন্তর ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পট ভূমিতে লেখা এ গল্পে ময়ুরাক্ষীর স্মৃতিময় জনপদ উন্মোচিত হয়েছে। "নয়নচারা'র গল্পগুলোতে লেখকের মনোসমীক্ষণ জাত শিল্প-কৌশলের ছাপই বেশি পড়েছে। বাংলাদেশের আঞ্চলিক জীবনের পরিচয় তাতে আছে : তবে সমাজ যেখানে প্রাধান্য পায়নি, সমাজকেন্দ্রিক মানব-জীবন তার উপলক্ষ,কিন্তু মানব জীবনের অন্তর্বিশ্লেষণ তার লক্ষ্য। সমকালীন সাহিত্য ধারণায় কথাশিল্পে ব্যবহৃত এই কলাকৌশল পাশ্চাত্য সাহিত্যরীতির নির্বিচ্ছিন্ন অনুশীলনের ফল, যা বলা যায় ওয়ালীউল্লাহ্ মানসে ফল্গুর মত প্রবাহশীল।"[৪২] এ-গল্পে হাসু ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে খাদ্যের জন্য গ্রাম থেকে শহরে ছুটে এসেছে। তারপর সে এক অদ্ভুত মানসিক ভাবনার শিকার হয়। এক টুকরো শান্তির সন্ধানে তার যাত্রা। এ সময় গাঁয়ের নদীটি তার দারুন

Dhaka University Institutional Repository


মনে পড়ে, তার মনের প্রবল ইচ্ছা, সে ভেসে যাক প্রশান্ত নদী তাকে নিয়ে যাবে ভাসিয়ে, দূরে বহু দূরে।' যেখানে শান্তি সেখানে নিয়ে যাবে। কিন্তু শহরে যে শান্তির আশায় ক্ষুধাতাড়িত হয়ে অবসন্ন দেহখানি নিয়ে এক মুঠো ভাতের আশায় শহরের অলিগলি ঘুরেছে। আমুর সঙ্গে অসুস্থ ভূতনী অদ্ভুতভাবে শহরের মানুষগুলো দেখছে। এক দুর্ধর্ষ শক্তির ইঙ্গিত ওরা যেন থর থর করে কাপছে। আর আমুর মনে হল এক বিশাল অন্ধকার যেন হিংস্রতায়, পাশবিক ইচ্ছায় নিষ্ঠুর ভাবে গ্রাস করার জন্য তার দিকে এগিয়ে আসছে। সেই ভয়াবহ শক্তিশালীর কাছে সে ক্ষমা চায়। কেননা তার কাছে অপরাধী সে, সে অন্যায় করেছে যেহেতু শক্তিশালীর অন্যায় ও ন্যায়, সে ন্যায়ের প্রতি অন্যায় করা গুরতর পাপ। সে পাপ করেছে, এবং তাই সে ক্ষমা চায়, দুটি ভাত দিয়ে শক্তিশালী তাকে ক্ষমা করুক।"[৪৩] বিচিত্র এ পৃথিবীতে আমুর অস্তিত্বের সঙ্গে যার নিবিড় সম্পর্ক, অথচ তার অন্তরঙ্গ এই বাস্তব পৃথিবীও যেন অবস্থার বিপাকে এখন মিথ্যা হয়ে যায়। কেননা তার উপরের অসহ্য তাপে জমাট কথাগুলোও এখন ধোঁয়া হয়ে বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে। আর তার গলাটা যেন হঠাৎ সুরঙ্গ হয়ে গেলো। আমু শুনতে পায় "কেমন একটি অতি ক্ষীণ আওয়াজ যে গভীর ও ফাঁকা সুড়ঙ্গ বেয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠে আসছে ওপরের পানে এবং অবশেষে বাইরে যখন মুক্তি পেলো তখন তার আঘাতে-অন্ধকারে ঢেউ জাগলো, ঢেউগুলোতে দু'ধারের খোলা চোখে ঘুমন্ত বাড়িগুলোর গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এলো তার কানে। মা-গো, চাট্টি খেতে দাও।"[৪৪]

মনের স্বপ্নচারীতায় আবার আমু যেন দেখতে পেলো ময়ূরাক্ষীর তীরে এখন কুয়াশা লেগেছে। স্তব্ধ দুপুর, আর শান্ত নদী। নৌকা ভেসে যায়, আর একটু দূরের শ্মশানে মৃতদেহ পুড়ছে। কিন্তু এখন তার ভয় করছে না, কেননা মৃত্যুর দুয়ার পেরিয়ে নানা অলিগলি দিয়ে এখন সে মৃত্যুহীনতার উন্মুক্ত সদর রাস্তায় ফেলেছে।

সংক্ষেপে এই হচ্ছে 'নয়নচারা' গল্পের কাহিনী। এই একটি মাত্র গল্পের মাধ্যমেই লেখকের শিল্পী সত্তার সবগুলো বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। নূরউল করীম খসরু বলেছেন– "ভাসমান জীবন যারা অতিবাহিত করে, বিশেষত যা 'উন্মুল উদ্বস্তুতা হিসেবেই পরিচিত তাকেই কেন্দ্র করে গল্পের প্রসার ও আয়োজন সপন্ন করা হয়েছে এ গ্রন্থের প্রায় গল্পে। অন্য কথায় বলা যায়, তিনি চল্লিশ দশকের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রসূত জনজীবনের ভাসমানতাকে একটি বিশেষ দৃষ্টি প্রসারতায় ও আকর্ষণে উপজীব্য করতে প্রয়াসী হয়েছেন।"[৪৫]

মূলত এ গল্পে উপজীব্য হয়েছে-আমু, ভূতো, ভূতনী পদের জীবন-যন্ত্রণা। তবে লেখকে মূল পক্ষপাত আমু চীরত্বের প্রতি। এই চরিত্রের মধ্যে অনেক জীবন জিজ্ঞাসা ও ঘৃণা-বিদ্বেষ ক্রোধের সমাহার লক্ষণীয় ঃ "ময়রার দোকানে মাছি বোঁ বোঁ করে। ময়রার চোখে নেই নন্দী কোমলতা, সে চোখময় পাশবিক হিংস্রতা এতো হিংস্রতা যে মনে হয় চার ধারে ঘন অন্ধকারের মধ্যে দু'টো ভয়ঙ্কর চোখ ধক্ ধক্ করে

Dhaka University Institutional Repository


জ্বলছে। ওধারে একটা দোকানে যে ক-কাঁধি কলা ঝুলছে, সে দিক পানে চেয়ে তবু চোখ জুড়ায়। ওগুলো কলা নয়তো, যেন হলুদ রঙের স্বপ্ন ঝুলছে। ঝুলছে দেখে ভয় করে নিচে কাদায় ছিড়ে পড়বে কি হঠাৎ ? তবু লংকা ছাপিয়ে আমুর মন উর্ধ্বপানে মুখ করে কেঁদে ওঠে। কোথায় গো, কোথায় গো নয়নচারা গাঁ।"[৪৬]

'জাহাজী' গল্পের অন্তর্গঠন 'নয়নচারা'র মতোই সর্বজ্ঞ লেখকের প্রেক্ষণ বিন্দুর ব্যবহার এর ঘটনান্তর্গত চরিত্রের সংলাপ অর্থাৎ, উত্তম পুরুষের প্রত্যক্ষ প্রশ্রয়ে বৈচিত্রপূর্ণ ও গতিময়। অপর দিকে 'জাহাজী'গল্পের চরিত্রায়ণে যুগপৎভাবে লেখকের ও গল্পাশ্রিত চরিত্রের প্রেক্ষণ বিন্দুর পরিচর্যা গৃহীত হয়েছে। "সারেঙে স্তব্ধ। কিন্তু ঘরের আলো শীঘ্র ম্লান ও নিষ্প্রোয়জনীয় হয়ে উঠবে। তা উঠুক, তবে কী-একটা প্রশ্ন অতি অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য প্রায় কী একটা প্রশ্ন থেকে থেকে মাথায় নাড়া দিয়ে উঠছে। দীর্ঘ জীবন তো অতিক্রান্ত হলো প্রায়, কর্মজীবনের অবসান ঘনিয়ে এসেছে, কিন্তু তুমি আমাকে কী দিলে, আর আমি তোমাকে কী দিলাম ? সারেঙ কিছু চঞ্চল হয়ে উঠলো : পবিত্র প্রভাত-এ সময়ে বেদনার মতো অবসান ঘটিয়ে উঠেছে কেন মনে।"[৪৭]

এ গল্পটিতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর শিল্পী জীবনের দর্শনই গভীর অর্থদ্যোতনায় চিত্রিত হয়েছে। অভিজ্ঞতার ভারে ন্যুব্জ বৃদ্ধ করিম সারেঙ এর তরঙ্গক্ষুব্ধ সামুদ্রিক জীবনের প্রতিটি দার্শনিক চিন্তার সূত্র গভীর দ্যোতনাময় হয়ে উঠেছে। 'পরাজয়' গল্পে নারীদেহের প্রতি পুরুষের দুর্দম কামনার বিষয় স্থান পেয়েছে। সাপের ছোবলে সদ্যমৃত ছমিরের বিধবা স্ত্রী কুলসুমের যৌবনদীপ্ত দেহটি সম্ভোগের দুরন্ত বাসনা জাগায় কালু ও মজনুর মোহমুগ্ধ মনে। গল্পের বিষয়টি গতানুগতিক হলেও উপস্থাপনে লেখকের শিল্পচাতুর্য লক্ষণীয়। বিশেষ করে নদীমাতৃক বাংলাদেশের চিরকালের প্রবাহমান রূপের বর্ণনায় লেখকের ছাপ সুস্পষ্ট। "পূর্ব দিক থেকে হাওয়া বইছে : নদীর জলে তাই মৃদু ঢেউ, আর অস্পষ্ট কলকল আওয়াজ। ওধারে আকাশটা পরিষ্কার হয়ে গেছে , নীল স্বচ্ছ আকাশ পরিপূর্ণ রোদে ঝলমল করছে, আর তারই ছটা লেগেছে অদূরে কালো ধানে। মৃদু হাওয়ায় দুলছে কাশবন, তার ডগাগুলো চিকচিক করছে। নৌকা যখন রাস্তার ঢালা থেকে বেরিয়ে ধলেশ্বরীর মাঝামাঝি এসে পড়লো তখন স্রোতের ধারে নৌকা দুলে উঠলো। তাছাড়া নৌকা চলছে হঠাৎ কোনাকোনি ভাবে, স্রোতের অনুকূলে ওদিকে হতে একটা দৈত্যের মতো গোলাপপুরী নৌকা আসছে, পালের রঙ তার সাদা।"[৪৮]

'মৃত্যুযাত্রা' আবহ প্রধান গল্প। এ গল্পের একক কোন নায়ক নেই। নায়ক এক দল মেয়ে পুরুষ। তিপু, করিম, কমলি ,আসগর, ময়না, হাজুর বাপ ও মা, আনু হাজুর মা, রাব্বি মিয়ার বউ, তোতা প্রভৃতি

Dhaka University Institutional Repository


কেউ নায়ক নয়, নায়ক ১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষ। এ গল্পে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে মানুষগুলির বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে : তাদের ক্রোধ, ঘৃণা ক্ষোভ একদিকে, অন্যদিকে তাদের স্বপ্ন।

গ্রাম বাংলার শত সহস্র অনাহার ক্লিষ্ট মানুষ দল বেঁধে অজানার পথে ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য খাদ্যের সন্ধানে ছোটার বর্ণনা চিত্র গল্পের সমস্ত শরীর কাঁপে। গ্রাম্য জনপদের শত সহস্র দুঃখের পাচালী ভরা এ গল্পে তিনি চরিত্র সমূহের মানস-বিচিত্রতাও নিখুঁত ভাবে উপস্থিত করেছেন, বিশেষত বুড়ো হাজুর মার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। এ গল্পে মৃত্যু চেতনা বারবার উদ্ভাসিত। "হঠাৎ হাটু থেকে মুখ তুলে উজ্জ্বল আলোয় সংকুচিত চোখে আনু বুড়ির ঢাকা দেয়া মুখের পানে তাকালো, তাকিয়ে কেমন একটা আকস্মিক ভয়ে শীতল হয়ে উঠলো তার ভেতরটা। সে আহত মুখে কী যেন একটা ভীষণ সংকল্প। যেহেতু মহাবুভুক্ষতা নিয়ে সে মরেছে সে জন্যেই কী সে তাদের খেতে দেবে না, তাদের মরতে হবে তেমনি করাল ভীষণতা।"[৪৯] বস্তুত, "১৯৪৩ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে বাংলা সাহিত্য বেশ কিছু গল্প , কবিতা। উপন্যাস রচিত হয়েছে- কিন্তু 'মৃত্যুযাত্রা'র মত একটি ছোট গল্পে দুর্ভিক্ষের মর্মস্পর্শী চিত্র সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ যেভাবে তুলে ধরেছেন তার প্রতি তুলনীয় তেমন কোন দৃষ্টান্ত খুব একটা পাওয়া যায় না।"[৫০]

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্'র 'খুনী' গল্প পূর্ববাংলার নদী তীরের জেগে ওঠা চরতাড়িত ও চরপীড়িত জীবনের নির্মম ভাষ্য, নিরাবেগ কাহিনী। আধুনিক নাগরিক-বৈশিষ্ট্যে অসাধারণ হয়েও সাধারণ গ্রাম-বাংলার ক্ষয়িষ্ণু, কর্মকান্ডের সমালোচনায় তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ ধী সম্পন্ন। তাঁর 'খুনী' গল্পের চরআলেকজান্দ্রার সোনাডাঙ্গার গ্রাম: আর সে গ্রামের উম্মুল, দৈবাৎ খুনী রাজ্জাক : এই খুনী সম্পর্কে তিনি লিখেছেন "ফজু মিঞাদের বাড়ি ও মৌলভীদের বাড়ীর দু'ছেলের মধ্যে কি একটা সামান্য বিষয় নিয়ে হঠাৎ খুনাখুনি হয়ে গেল, ফজু মিঞাদের ছেলের প্রাণ গেল, আর মৌলভীদের ছেলে তারপর সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। সোনাডাঙ্গা গ্রামের আর কেউ কোন সন্ধান পেল না।"[৫১]

'রক্ত' গল্পে জাহাজের খালাসী আবদুলের মনে একটা ব্যর্থতাবোধ জন্ম নেয় এবং সে ব্যর্থতাবোধ থেকেই তার মনে ছড়িয়ে পড়ে ধূসর মরুর মত-ধূঁ-ধূঁ করা শুধু অন্তহীন শূন্যতা। সারাজীবন সে কাটিয়ে দিয়েছে তরী রেখা শূণ্য সাগরের বুকে। সেখানে তার কামনা-কাতর দিন -গুলোতে ছিলো নারী সংসর্গহীন শূন্যতা কিন্তু মাটির বুকে এসে আর হৃদয়ে আকাঙ্খার জন্ম নেয়। সে অঞ্চলের অবস্থা বদ্ধ ঘরের 'অন্ধকারে একটা নারী হয়তো পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে' থাকার কথা চিন্তা করে অন্তরে সুখ অনুভব করে, তার অন্তর লালিত মরু প্রদেশ বিস্তৃত ও প্রসারিত হয়। কিন্তু সেখানেও সে নিঃসঙ্গতা অনুভব করে : "আবদুল চোখ বুঝলো। কিন্তু কোথায় স্নেহের উৎস? শ্রান্ত পায়ে মস্তিষ্কের অলিগলিতে মন হাঁটছে খুঁজতে-খুঁজতে, কোথাও দেখলো, নদী রয়েছে বটে তবে নিষ্করুণ শুষ্কতায় ধূঁ-ধূঁ করছে দিগন্তব্যাপী, কোথাও বা অনাত্মীয় নিঃসঙ্গতা তীর রেখা

Dhaka University Institutional Repository


শূণ্য নীল সাগরের মতো বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। আবার কেউ কোথাও মাকে ডাকলে, কিন্তু তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, ওপারে ঘন অন্ধকার নেমেছে, আর এধারে খেয়াঘাটে লোকও নেই নৌকাও নেই।"[৫২]

এ গল্পটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত হলেও কেন্দ্রীয় বিষয়ের সঙ্গে কোন যোগ সূত্র নেই। প্রকৃত প্রস্তাবে এ গল্পে একজন জাহাজীর নারী সঙ্গহীন জীবনের মর্মবেদনার ছবিই লেখক চিত্রিত করেছেন।

'সেই পৃথিবী' গল্পে সাদেকের কুৎসিত মনের একটি দিকই উন্মোচন করেছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্। চুরি ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত সুখের জীবন-যাপন করলেও তার মনের মাঝে সেই পূর্বে দেখা ঘুমন্ত মেয়েটির ছবি ভেসে ওঠে। 'পৃথিবীর মধ্যেও যেন কোথায় আবার রূপকথার দেশ' সেই পৃথিবীর জন্যেই তার তৃষ্ণা জাগে। 'যে পৃথিবী ভরা সূর্যালোক ও মুক্তি,যে পৃথিবীতে শিশুরা কাঁদে ও দম্পতিরা হাসে, যে পৃথিবীময় শুধু উলমল স্নেহ, সে পৃথিবীই বেহেস্ত? তাই সে ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে ও মদ খেয়ে বুদ হয়ে থাকে। সে 'ঘরময় অসম্ভব শান্তি. অনুভব করে। আর নীরবতার মধ্যে বেজে ওঠে তার অপ্রাপণীয় জীবনের গান - "একটা শিশু ক'কিয়ে ক'কিয়ে কাঁদছে। আহা, শিশু কাঁদছে, রাতের বিপুল অন্ধকারে আর গভীর নীরবতায় শিশু কাঁদছে, সেই পৃথিবীর শিশু।"[৫৩] সেই পৃথিবী সাদেকের অপ্রাপ্য সেই শান্তিময় সংসার যা এই পৃথিবীতেই আর এক পৃথিবী রচনা করে।

একথা অনস্বীকার্য যে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর গল্পে চেতনা ও সকলের সমাজ বাস্তবতার চিত্র অঙ্কন করেছেন।

## ১. ঙ. দুই তীর ও অন্যান্য গল্প

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প'(১৯৬৫)। গ্রন্থভুক্ত গল্পগুলি ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৯ সালের মধ্যে রচিত। এ গ্রন্থে সংকলিত গল্প গুলো ১. দুই তীর ২. একটি তুলসী গাছের কাহিনী, ৩. পাগড়ী ৪. কেয়ারা ৫. নিষ্ফলা জীবন নিষ্ফলা যাত্রা ৬. গ্রীষ্মের ছুটি ৭. মালেকা ৮. স্তন ও ৮. মতিউদ্দিনের প্রেম।

'দুই তীর' পর্যায়ের গল্প সমূহে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ গল্পগুলির অন্তর্বয়ন, পরিচর্যা, সংগঠনেও সতর্ক, যত্নশীল ও পরীক্ষা প্রবণ। এ পর্যায়ের গল্পগুলি অধিকাংশ চরিত্রই বিবিধ বিচ্ছিন্নতা চেতনায় আচ্ছন্ন হওয়ায় গল্পের আভ্যন্তর পরিচর্যায় এসেছে উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য স্বতন্ত্র রীতি ও কৌশল।

'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' দেশ বিভাগের পটভূমিতে লেখা একটি অনন্য সাধারণ গল্প। দেশ বিভক্তির পরপরই একটি শহরে মতিন, ইউনুস, আমজাদ, কাদের, হাবিবুল্লাহ, মকসুদ, মোদাব্বের,

Dhaka University Institutional Repository


বদরুদ্দিন, এনায়েতসহ বেশ কয়েকজন-কলকাতা থেকে এদেশে এসে একটা পরিত্যক্ত বিশাল হিন্দুবাড়ী দখল করে বসবাস শুরু করেছে। "এদের অনেকেই কলকাতার ব্লকম্যান লেন-এ খালাসী পট্টিতে, বৈঠক খানার দফতরীদের পাড়ায়, সৈয়দ সালেহ লেন-এ তামাক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বা কমরু খানসামা লেন-এ অকথ্য দুর্গন্ধ নোংরার মধ্যে দিন কাটিয়েছে।"[৫৪] অতীতের সংকীর্ণ পল্লীর দুর্গন্ধযুক্ত ও নোংরা পরিবেশের তুলনায় 'বড়ো বড়ো কামরা, নীলকুঠির, দালানের ফ্যাশানের মস্ত মস্ত জানালা' খোলা-মেলা উঠোনের বর্তমান বাড়িটি রাজসিক, মুক্ত-বাতাস ও পর্যাপ্ত পরিসরে স্বাস্থ্যময়। দখলকারীরা তাই তৃপ্ত ও স্বপ্নাতুর। কিন্তু অচিরেই তাদের এ বিষণ্নতাবোধ, সচেতনতা জাগ্রত হয়। একদিন সকালে বাড়িটির রান্নাঘর সংলগ্ন উঁচু জায়গায় আবিষ্কৃত হয় একটি বিবর্ণ, শীর্ণ-প্রায় তুলসীগাছ আর সেই অনুষঙ্গে তাদের হৃদয়ে জেগেছে গৃহকর্তার প্রতি প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি, এক অনুচ্চারিত সহমর্মিতাবোধ। তারা ভেবেছে সময়ের ক্রমধারায় বাড়িতে কখনো দুর্দিনের ঝড় বয়েছে। কখনো বিরাজ করেছে উৎসবমুখর পরিবেশ। কিন্তু একদিনের জন্যও তুলসী তলায় প্রদীপ দেওয়া বন্ধ হয়নি। কিন্তু দেশ বিভাগের ফলে সেই ধারা হয়েছে ভিন্ন। গৃহকর্ত্রী হয়তো এখন আসানসোল, বোদ্যহাটি, নিলুয়া কিংবা হাওড়ার কোন আত্মীয় বাড়িতে দুর্ভোগ ও অনাদরে কাল কাটাচ্ছেন। 'তুলসী গাছ হিন্দুয়ানি'র চিহ্ন বলে মোদাব্বের তা উৎপাড়িত করতে চেয়েছে। অন্যান্যেরও তাতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু সবার অলক্ষ্যে তাদের কেউ তুলসী গাছে জলসিঞ্চন ও মঞ্চের আবর্জনা পরিস্কার করেছে। ফলে শুষ্ক, পীতবর্ণ গাছটি ভরে উঠেছে সবুজের সমারোহে। শেষ পর্যন্ত বাড়িটিতে বাসের অধিকার তারা পায়নি। সরকার বাড়িটি রিকুইজিশন করেছেন। তারা গৃহকর্ত্রীর মতোই হয়েছে উন্মূলিত। বস্তুত, পরিত্যক্ত বাড়িতে আশ্রিত ব্যক্তিরা বিচ্ছিন্ন বলেই ভীত, একদা আশ্রয় পেয়েও বিতাড়িত। সাম্প্রদায়িক সংকট, দুই বাংলার মানুষদের বাস্তুভিটা ত্যাগের কারণেই তাদের এই বিচ্ছিন্নতা, পরস্পর পরস্পরকে অনাত্মীয় ও শত্রুজ্ঞান।

গল্পকার অত্যন্ত সুকৌশলে এদেশের তথা, তথা ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বন্ধনকে নষ্ট করার জন্য দায়ী করেছেন সেই সব মানুষকে যারা রাজনীতির ছত্র-ছায়ায় নিজেদের স্বার্থকে টিকিয়ে রাখতে চায়। 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের শেষ ক'টি বাক্যেই গোটা গল্পকে দারুণভাবে নাড়া দিয়েছে। "তুলসী গাছের অস্তিত্বের সঙ্গে একটি ছল ছল চোখের প্রতিচিত্র স্থাপন এবং মানুষের উপযোগিতার প্রতি কটাক্ষসম তীব্র মন্তব্য, যা পরিশেষে ইন্দ্রিয় সজাগতা ও রাজনৈতিক চৈতন্যের বহিঃপ্রকাশ, এই সূত্রেই অন্তত তিনি একটি অসাধারণ গল্প মানসতার পরিচয় ধ্বনিত করলেন। আমাদের বাংলা গল্পসাহিত্যে এটি অনন্যতম যুক্ত সংযোজন।"[৫৫]

'পাগড়ি' প্রৌঢ় খান বাহাদুর মোত্তালেব সাহেবের নিঃসঙ্গতাবোধ, তারই জীবনকে 'পদে পদে সম্পূর্ণভাবে উপভোগ' আকাঙ্খার রূপকল্প। মফস্বল শহরের উকিল হলেও মোত্তালেব সাহেব আত্ম-প্রতিষ্ঠায়

Dhaka University Institutional Repository


তৃপ্ত, পেশাগত সাফল্যে গঠিত। কিন্তু জীবনের মধ্যপর্বে পৌঁছে তার মধ্যে জেগেছে গভীর অতৃপ্তিবোধ। কারণ স্ত্রীর মনঃরোগ, মস্তিষ্কবিকৃত। পঞ্চম সন্তানের পরই মোত্তালেব সাহেবের স্ত্রীর মানবিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। আর সেই থেকে তিনি অন্তরে অসুখী, এত কাল এ অবস্থা সহ্য হলেও এখন তিনি আর তা পারছেন না। জীবনকে উপভোগের ইচ্ছা এ মধ্যপর্ব তার মধ্যে প্রবলভাবে জাগ্রত হয়েছে। মোত্তালেব সাহেব দ্বিতীয় বিয়ে করার সিদ্ধান্ত স্থির করে। দ্বিধার সঙ্গে হলেও সন্তানদের কাছে তিনি তার এ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

মাঝবয়সী পিতার এ সিদ্ধান্ত ছেলে-মেয়েদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া, ক্ষোভ ও বেদনার জন্ম দিলেও বাহ্যিক সংযম তারা হারায়নি। অতঃপর নজু মিঞার মাধ্যমে চলেছে বিয়ের আয়োজন। এ উপলক্ষে মোত্তালেব সাহেব নতুন পোশাকে সজ্জিত হয়েছেন, বজ্‌রা ভাড়া করেছেন, নববধূর জন্য শাড়ি-গহনা ক্রয় করেছেন। কিন্তু ক্রয় করতে পারেননি নতুন পাগড়ি। কেননা তা তার বিবেচনায় 'আড়ম্বরের চুম্বক শীর্ষ' প্রকাশ, 'নওজোয়ানদের উদগ্র নিশানা' এবং পৌঢ় ব্যক্তির বিয়ে লোকচক্ষুর আড়ালে, অনাড়ম্বরে হওয়াই শ্রেয়। তাই সবার অজান্তেই মোত্তালেব সাহেবের বিয়ে নিষ্পন্ন হয়। অতঃপর নববধূসহ তার গৃহে প্রত্যাবর্তন কালে মুষলধারে বৃষ্টি নামায় তার পোশাক, শরীর ভিজে যায়। অথচ মোত্তালেব সাহেবের প্রথম বিয়ের 'মাসহাদি পিড়ীতে এতটুকু পানির স্পর্শ লাগেনি এবং যেমনি যেমনি গিয়েছিল তেমনি সেটি হাত বাক্সে লুকিয়ে ফিরেছে।' ''পাগড়ি' গল্পের আরম্ভ মোত্তালেব সাহেবের জীবনের মধ্যপর্ব অর্থাৎ স্ত্রী সম্মানিত তার অতৃপ্তিবোধের সূচনা থেকে। ফলে মোত্তালেব সাহেবের পূর্বজীবন এসেছে অতীত প্রক্ষেপণ রীতিতে। মোত্তালেব সাহেবের দ্বিতীয় বিয়ের জন্যে যাত্রা করার সঙ্গেই বর্তমানের সাথে অতীতকে সমীকৃত করার কৌশল পরিত্যাগ হয়ে কাহিনী হয়েছে একমুখী, শীর্ষমূহুর্ত, ক্লাইম্যাক্সের দিকে ধাববান।''[৫৬]

এ গল্পের চরিত্রগুলি বিশেষত, মোত্তালেব সাহেব ছাড়া অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে একটি অন্তর্মুখী বেদনা, 'মনে না নিলেও মেনে নেওয়ার' একটি নিরুপায় যন্ত্রণা বর্তমান থাকায় তাদের উপস্থিত প্রায় নিঃশব্দ, ভীরু ও কম্পিত পদে। ফজু মিঞা কেবল হাতব্যাগসহ মোত্তালেব সাহেবের ছেলেদের বাইরে থেকে প্রতিক্রিয়াশূন্য মনে হলেও তারা ছিলো বেদনাময়, পিতৃ-আচরণে বিক্ষুব্ধ। পূর্বাপর প্রায় নির্বাক থেকে নিজেদের মাথা চুলকিয়ে তারা জনকের নিক্ষেপ করেছে তাদের অন্তরের ঘৃণা। ''বস্তুত 'পাগড়ি' গল্প মোত্তালেব সাহেবের অবচেতন আকাঙ্খা : তারই আসঙ্গ ও বহুবিবাহ প্রথার এক বাস্তবানুগ চিত্র। সামন্ত চেতনা-নির্ভর সমাজ ব্যবস্থার পৌঢ় ও প্রায় বৃদ্ধ ব্যক্তির অবচেতন মনের অতৃপ্ত কামনা চরিতার্থের বাসনা আর সেই লিবিডো চেতনাকেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ফ্রয়েড, ইয়ং লরেন্সের তত্ত্ব জিজ্ঞাসার মাধ্যমেই গল্পে রূপায়িত করেছেন।''[৫৭]

Dhaka University Institutional Repository


'কেয়ারা' গল্পে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র "উপলব্ধি শুধু প্রাকৃতিক অথবা আধ্যাত্মিক নয়, জীবন ও নদীর উপমা যেন ক্রম অর্থে সঞ্চরণশীল। যেহেতু তার বিশ্বাস ও চেতনা-সৃষ্টিশীলতা জীবনকে অনিঃশেষ, বৃহৎ এবং চঞ্চলতায় ভরপুর ভাবতেই নিমগ্ন, ফলস্বরূপ বিপরীত প্রকৃতি ও লক্ষণ তথা শূন্যতা-অর্থহীনতা, নির্বিকারত্ব নিষ্কৃয়তা তার কাছে সমান গুরুত্বময়। প্রতীক্ষারও একটি আশ্চর্য অর্থ ও যৌক্তিকতা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে অবশ্যই আছে, কিন্তু এ ধনাত্মক বিশিষ্টতাকে অনুভবে প্রজ্জ্বলিত করা, আবিষ্কার ও অনুসন্ধান করাই শিল্পীর আরাধনা, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সেই অপ্রচ্ছন্ন ভাব বস্তুকেই উপস্থাপিত করেছেন 'কেয়ারা' গল্পে।"[৫৮]

'নিষ্ফল জীবন নিষ্ফল যাত্রা' গল্পের কাহিনী একটু বিচিত্র। এ গল্পে বৃদ্ধ সদর উদ্দিনের মৃত্যু পূর্বকালে তার সব বন্ধু ও শত্রুদের নিকট পূর্ণ করতে সে মাঠে নেমেছে। পঙ্গু শরীর নিয়েও সে পরিচিত প্রত্যেকের কাছে মদ চেয়েছে। কিন্তু আখলাক তরফদারের বাড়ির সামনে উপনীত হয়ে তার আত্ম অনুশোচনার অনুতাপ হয়েছে আরো গভীর ও মর্মন্তুদ। সদর উদ্দিন জীবনে এই একটি লোককেই বেশী কষ্ট বেদনা দিয়েছে। তারই কটু অভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্রের আখলাকের জীবন হয়েছে বিপদ সংকুল ও দারিদ্র্যকীর্ণ। আখলাক তরফদারের কাছে তাই তার মাফ চাওয়া একান্ত দায়িত্ব। কিন্তু সক্রদর উদ্দীনের মন দ্বিধান্বিত। কেননা চিরশত্রুকে এতোদিন পর নিজের বাড়িতে পেয়ে আখলাক কি আচরণ করবে সদর উদ্দিন তা জানে না। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, সদর উদ্দিনকে কাছে পেয়ে আখলাক রইল নিরুত্তর, আর চোখ অশ্রুময় দেখে সদর উদ্দিন বুঝলো আখলাক তাকে ক্ষমা করেছে। অতঃপর পরম নির্ভাবনায়, প্রশান্ত চিত্তে সদর উদ্দিন বাড়ী ফেরে। মৃত্যুতে তার আর কোন ভয় নেই বা আপত্তি নেই।

'গ্রীষ্মের ছুটি' গল্পে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ সেলিনা নামের এক প্রতীকি চরিত্রের আশ্রয়ে গ্রাম্য জীবনের অন্ধকার অতলান্তে আলোকমালা দীপিত করেছেন। অভিযাত করেছেন মিথ্যা ও ঠুনকো বিশ্বাস ও সংস্কারবোধের। গ্রাম্য মানুষের সরলতার পাশে সামন্ত শ্রেণীর কুটিল মনস্কাম, অন্ধকারের গ্রাস, শয়তানি চক্রান্ত, আম-মৌলভীদের ক্রিয়াকলাপ অত্যন্ত তাৎপর্যময় বিন্যাসে উপস্থাপিত করেছেন লেখক। গল্পের শেষ পর্যায়ে দেখা যায়, সেলিনার 'মাথাভরা কালো রেশমের চুল' পর্যন্ত কর্তন করা হয়। অর্থাৎ সকল সৌন্দর্য ও স্বাভাবিকত্ব ছেটে ফেলে অসুন্দর ও কৃত্রিমতাকে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে এ গল্পে। প্রকৃত ছোট গল্পের মতোই একটি অনিবার্য সরল বঙ্কিম রেখায় অগ্রসর হয়ে গল্পটি শেষ হয় একটি অনিবার্য বাক্যে ঃ 'সে দ্বন্দের জন্যই হয়তো যখন সে ছুটি শেষে শহরে প্রত্যাবর্তন করে তখন তার মুখ রক্তশূন্য ফ্যাকাসে দেখায়।' "এর ভিতর যে ঘটনা পরম্পরা তা কোন নিহিত গলিতে রেখাটির। কিন্তু আপাত অন্বের চিহ্ন নেই। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র কাছে ঘটনার চেয়ে ঘটনার প্রতিক্রিয়াই বড়ো, বাস্তবতার চেয়ে অবাস্তবতাই তার আবাধ্য।"[৫৯]

Dhaka University Institutional Repository


'মালেকা' নামকরণের মাধ্যমেই গল্পের কথাবস্তু আভাসিত। মাইনর স্কুলে পাশের পর তোজাম্মেল তরফদারের সঙ্গে মালেকার বিয়ে হয়েছি। বধূ জীবনের প্রারম্ভিক পর্বে মালেকা সুখেই ছিলো। কিন্তু ক্রমান্বয়ে ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। তোজাম্মেল ব্যবসা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। আর যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষ্য তাদের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থাকে আরো বিপন্ন করে তোলে। গ্রাম ছেড়ে মালেকা স্বামীর সঙ্গে শহরে আসে। এদিকে ম্যাট্রিক ফেল তোজাম্মেল শত চেষ্টা করেও বেকারত্ব দূর করতে পারেনি। তাই মালেকাকেই সংসার নির্বাহের, নিজের সন্তান ও স্বামীর ভরণ-পোষণের জন্য স্কুলে চাকরী গ্রহণ করে। কিন্তু এ অর্থে জীবন নির্বাহ দুর্বিসহ হয়ে পড়ে। এ কারণে মালেকা সেদিক থেকে তারই সংগ্রামী সত্তা এবং জীবন যুদ্ধের করুণ অথচ বাস্তবানুগ কাহিনী।

তবে গল্পের নাম 'মালেকা' হলেও গল্পকারের সার্বক্ষণিক অভিনিবেশ তারই প্রতি নিবদ্ধ থাকেনি। প্রধান শিক্ষিকা ও দাই-এর প্রতিও তিনি সমান যত্নবান। ফলে তিনটি চরিত্রই হয়ে উঠেছে জীবন্ত ও বাস্তবানুগ। মালেকা জীবন যুদ্ধে পরাজিত, অস্তিত্বের সংকট বিধ্বস্ত হলেও প্রধান শিক্ষিকা স্বচ্ছল ও অতিমাত্রায় হিসেবী। কিন্তু তুলনামূলক বিচারে তিনটি চরিত্রের মধ্যে দাই-ই সর্বাধুনিক আকর্ষণীয় ও স্বাতন্ত্র্য। তার ব্যক্তি স্বরূপে বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন "দাই-এর বৈর্য্য যেমন সীমাবদ্ধ তার মুখটাও তেমন চাঁছাছোলা। তার ভয়ও নাই কাউকে। সত্য কথা বলার মতো বেরিয়ে আসে মুখ দিয়ে, কোথাও আটকায় না।"[৬৫]

এই চরিত্রটি এই গল্পের সত্যের বিদ্যুৎ দর্শিনী নায়িকা এবং দর্শয়িতাও তার মুখকে ভয় করে চলে মালেকা থেকে প্রধান শিক্ষয়িত্রী সবাই। তার উপলব্ধি: "খুশী আনন্দের কথা দাই-এর কাছে বড় নয়। সে সব মায়া আলেয়ার মত ভুয়ো। জীবনটা তার কাছে দুঃখ কষ্টে সদা ছায়াচ্ছন্ন। মালেকার আশু মৃত্যুর ছায়া অন্যেরা পরিষ্কার করে দেখতে না পেলেও সে দেখে এবং তার কাছে সে ছায়াই একমাত্র সত্য।"[৬৬] কিন্তু ওয়ালীউল্লাহ্‌র বাস্তব মানুষী বাস্তবতার আয়তন থেকে এক তিল দূরে সরে যায়নি সে, তার উপরে নেই কোন আরোপিত প্রতীক বা ছায়া বা অন্ধকার ও রকম মুখরা, নির্ভীক, সত্যভাষিণী, সহৃদয়া, কুটভাষিণী মানুষকে আমরা বাস্তব ভাবেই কল্পনা করতে পারি।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌'র 'দুই তীর' ষাটের দশকে প্রকাশিত হলেও গল্পসমূহ বিভাগোত্তর কালের সমাজ বাস্তবতায় নির্মিত, সে সময়ের সামাজিক ক্ষয়িষ্ণুতা, শ্রেণী-দ্বন্দ, ব্যক্তিক চেতনার রূপান্তর অভিক্ষেপকে কেন্দ্র করেই তিনি সমকালীন প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরেছেন। তার গল্পে মানব জীবনের অন্তগূঢ় রহস্যের চমকপ্রদ বিশ্লেষণ আছে। অধিকাংশ গল্পেই মানুষের অন্তর্জীবনের দ্বন্দ আর সংঘাতকে অধিবাস্তবতার শিল্পভাবনায় রূপ দেওয়ার প্রয়াস লক্ষণীয়। 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে দেশ বিভাগ সময়কালকে ধারণ ও একটি অসাম্প্রদায়িক জীবন ধ্বনিকে অভিসিক্ত করা হয়েছে। আবার 'মালেকা' গল্পেও যুদ্ধোত্তর সময় ও ফলস্বরূপ বিপর্যয়, হাহাকার ও বাচার আর্তনাদকে প্রান্তরময় ধূসর রঙের তুলিতে আচড় দেওয়া হয়েছে। 'দুই তীরে'র আফসার উদ্দিন হাসিনাদের চারপাশ ও তাদের চৈতন্য বিশ্ব চল্লিশের সময়কেই স্পষ্ট করে তুলেছে। 'ছুটি', 'কেয়ারা' 'স্তন' গল্পেও সে সময়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার চিত্র লেখক সুনিপণভাবে বিন্যস্ত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository


## ২. আলাউদ্দিন আল আজাদ

বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যকে তার সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯) -এর অবদান অনস্বীকার্য। বিভাগোত্তর কালের বাংলাদেশের উপন্যাসে পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত যে ঘটনার বহিরঙ্গ প্রাধান্য উপন্যাসের কাহিনী বস্তুকে প্রভাবিত করার ধারণা প্রচলিত ছিলো সে ধারা থেকে উত্তরণ সম্ভব হয়েছিল এ কাল পর্বেই। এ সময়ে যে কয়েকজন তরুণ ঔপন্যাসিক বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের উপন্যাসে সম্ভাব্য সেই পরিবর্তনের প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন আলাউদ্দিন আল-আজাদ তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। তিনি জীবনবাদী সাহিত্যের সূক্ষ্ম রূপকার। জীবনের পরিপূর্ণ রূপের প্রতিটি অংশকে আলাদা আলাদা করে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি তার দর্শন ও অভিজ্ঞতার যৌথ প্রক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া দিয়ে মার্কসবাদী দর্শন তাকে যথেষ্ট বিচ্ছুরিত করেছে তার লেখালেখিতে, রোমান্টিকতার প্রশ্রয় সে দর্শনকে তারল্যে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। আর তাই তার গল্প কবিতা উপন্যাসে উজ্জ্বলতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

## ২. ক. তেইশ নম্বর তৈলচিত্র

বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে যে অনন্যতা আলাউদ্দিন আল আজাদকে এক বিশেষ স্থানে অধিষ্ঠিত করেছে তার প্রধান আলোকচ্ছটা হলো উপন্যাস। মানব মনের অন্তর্বিশ্লেষণ ও ফ্রয়েডীয় যৌনতত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত সমাজের রূঢ় বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন তার রচনায়। মানুষ সমাজ ও জীবনকে ঘিরে গড়ে ওঠা প্রায় প্রতিটি আধুনিক দার্শনিক জিজ্ঞাসা এক অপরূপ শিল্প সুষমায় ন্যাস্ত করেন।"চল্লিশের দশকের উপান্তে ছোট গল্পের আসরে তাঁর আবির্ভাব ও পঞ্চাশের দশকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প লেখক রূপে তাঁর প্রতিষ্ঠা ঘটলেও ঔপন্যাসিক রূপে প্রথম আর্বিভাবেই বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্বেই তাঁর প্রতিভার দ্যুতিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এবং প্রথম উপন্যাস 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র'(১৯৬০) বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক ব্যক্তিরূপে তাঁর প্রতিষ্ঠা সম্ভব করে তোলে।"[৬১] তাঁর এ উপন্যাস ব্যক্তির অভিযাত্রা এবং তাঁর আত্মিক সংকট ও অন্বেষণের অদ্বিতীয় রূপকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এক কঠিন সত্যকে নির্মম, নৈর্ব্যক্তিক ও সত্যনিষ্ঠভাবে উপস্থাপন করেছেন যা সমকালীন বাংলা সাহিত্যে বিরল। এ উপন্যাস সমাজ সত্যের সঙ্গে ব্যক্তি চেতনার এক বিশেষ যোগসূত্র স্থাপনের প্রয়াসে আলাউদ্দিন আল আজাদ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিচয়ও প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশের উপন্যাসের ইতিহাসে 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' আধুনিক ব্যক্তিত্ব নির্ভর বলিষ্ঠতায় উত্তরণ কালের প্রতিভূ সৃষ্টি কর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository


'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' উপন্যাসে জাহেদ শিক্ষানবীশ শিল্পী হিসেবে জামিলের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠে, ক্রমান্বয়ে পরিচয়ের গভীরতায় ছন্নছাড়া, জীবন বিমুখ দরিদ্র শিল্পী জামিলের সাংসারিক আবর্তে প্রেমিকের পর্যায়ে উন্নীত হয় এবং জামিলের বোন ছবির সঙ্গে প্রেম থেকে বিয়ে অতঃপর দাম্পত্য জীবনে সঙ্গিনী হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু বাসর রাতেই ছবির মাতৃত্বের স্বাক্ষরবহ শরীরকে আবিষ্কার করে জাহেদের মনে সংশয় ও সন্দেহ দানা বেঁধে ওঠে এবং কালক্রমে ছবির বিবৃতিতে তার অসহায়তার সুযোগে ব্যবসায়ী এক লম্পটের শিকার রূপেই তার কুমারী মাতার পরিচয় ব্যক্ত হয় এবং এই বিবরণ শিল্পী জাহেদের গতানুগতিক সাধারণ মানুষী পরিচয় প্রকাশের পরিবর্তে তাকে অনন্য এক শক্তিতে উজ্জীবিত করে। "তাহা কথিত সামাজিক সত্যকে বড় করে তুলে না ধরে ব্যক্তিত্বের মহিমা রঞ্জিত মানবিকতার স্পর্শে জাহেদের শিল্পী সত্তা ছবির অস্তিত্বকে তার জীবনে অনেক বেশী অর্থবহ করে তোলে এবং বিবাহিত জীবনে জাহেদের সন্তানের মা হিসেবে ছবির কুমারী জীবনের অবদমিত মাতৃত্বের এক নব মহিমা প্রকাশ পেল। পরবর্তী পর্যায়ে এই মাতৃত্বের এক মহিমান্বিত প্রকাশই শিল্পী জাহেদের সৃষ্টিকর্মে সার্থক হয়ে উঠল 'বসুন্ধরা' নামক চিত্রকর্মে তারই এক বিশিষ্ট পরিচয় বিবৃত।"[৬৩]

এ উপন্যাসের কাহিনীর পট উন্মোচিত হয়েছে করাচীর পটভূমিকায়। সেখানে এক প্রতিযোগীতা মূলক শিল্প প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে জাহেদ তার ছবি যেখানে প্রথম পুরস্কারের গৌরব অর্জন করে। পুরস্কার প্রাপ্ত ছবিটি একজন শিল্পীর জীবনের আদর্শ ও সৃজনকর্মের বিন্যাসে ব্যক্তির মনোজৈবিক পরিস্থিতির সমগ্ররূপ উন্মোচন করেছেন ঔপন্যাসিক। জাহেদের আত্ম বিশ্লেষণে জীবন ও শিল্পের এই আন্তরক্রিয়ার পরিচয় বিধৃত ঃ "বসুন্ধরা ছবিটি প্রথম প্রদর্শনেই সমালোচক ও সমঝদারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, এতে আমি সুখী। প্রতিষ্ঠা ও যশ শিল্পী মাত্রেরই কাম্য এবং আমিও সেটা চাই। কিন্তু বলতে পারি, ছবিটা হল ঘরের এক কোণায় অনাদরে পড়ে থাকলেও খুব দুঃখিত হতাম না। কারণ আমার যা আসল পাওনা, তা পেয়ে গেছি অনেক আগেই। সে হল আনন্দ, সৃষ্টির আনন্দ। সে আনন্দ আনন্দের চেয়ে তীব্র, বেদনার চেয়ে গভীর, মৃত্যুর চেয়ে অনন্ত এবং তখন আমিইতো নায়ক ছিলাম না ? হ্যাঁ তাই, আমি ছিলাম না তখন। আমি ছিলাম ইজেলে সাঁটানো ক্যানভাসের সামনে, রং সাজিয়ে তুলি হাতে নির্ঘুম সারারাত, কিছু রচনা করেছিল সে আর একজন। বর্ষণ বৃষ্টি বিদ্যুৎ ঝটিকার মেঘে আকাশটা ঝিম ধরেছিল, যখন ভেঙে পড়ল, পরিচিত আমাকে কোথায় ভাসিয়ে দিয়ে গেল। অন্যজন হল সৃষ্টির সারথী। আমার দেহের অভ্যন্তরেই জেগেছিল সে, বিধাতার মত, অচেনা রহস্যময়, আমার হাত দিয়ে ক্যানভাসের ওপর কাজ করে চলে গেছে তাকে চিনিনা, কিন্তু তবু মনে হয়, সেই তো জেগেছিল বাফেল দা ভিঞ্চি মাইকেল এঞ্জেলার মাঝে, গগাঁ রেনোয়া পিকাসোর আত্মায়।"[৬৪] বসুন্ধরা ছবির জন্ম উৎস সন্ধান করতে গিয়ে জাহেদ তার প্রেমময় শিল্পময় জীবনের

Dhaka University Institutional Repository


ইতিহাসকেই উন্মোচন করে দেয়। একজন সম্পন্ন শিল্পীর, আত্মকথনে এ উপন্যাসে যে জীবন রূপায়িত হয়েছে, বাংলাদেশের উপন্যাসের পটভূমিতে তা অভিনব।

জাহেদ করাচীর চিত্র প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণের সুবাদে তার দূর সম্পর্কের খালা জোবেদার বাসায় ওঠে। সেখানে জাহেদ জোবেদা খালাকে নতুন দৃষ্টিতে দেখার প্রয়াস পায়। জোবেদা ছিলেন স্কুল শিক্ষক আহাদ সাহেবের স্ত্রী। কিন্তু তিনি তার স্বামীর বর্তমানেই জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তিকে স্বামীরূপে বরণ করে পাকিস্তান চলে যান। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্তরণ ঘটে যায় জোবেদা খালার এই ধরনের বিয়ের মধ্য দিয়ে। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্মৃতিকাতরতা থেকে তিনি সহজে উত্তীর্ণ হতে পারেননি। তাঁর স্বশ্রেণীর মানসিকতা তাকে গ্রাস করে। জাহেদ ঘটনাক্রমে জোবেদা খালাকে তার প্রথম স্বামী আহাদ সাহেবের কথা মনে পড়ে কিনা জানতে চাইলে 'অতীত' দাম্পত্য জীবনের মধুমাখা স্মৃতিচারণে তীব্র যন্ত্রণা দাহন করে। লেখকের বর্ণনায়ঃ "আমি অকম্প গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করলাম 'আচ্ছা আহাদ সাহেবকে আপনার মনে পড়ে না?' 'কে? বিকারগ্রস্ত রোগীর মতোই তির্যক প্রশ্ন। ... এরপর কি ঘটল বলতে পারব না। একটা চোরাবালির ধ্বস বুঝি নীচে ডুবে গেল আচমকা। আসলে এটা আমার মনের ভুল। আর্তনাদের মতো একটা অস্ফুট শব্দ করে জোবেদা খালা বসে পড়লেন শুধু। নীচু হয়ে আমি শুধিয়ে উঠলাম, কি হল খালা, কিছু হয়নি জাহেদ! আমাকে একটু ধরতো'। একেবারে নির্বাপিত শীতল কণ্ঠস্বর। হাত ধরে তুলতে গিয়ে দেখি তার দু'চোখ বেয়ে দরদর ধারায় পানি গড়িয়ে পড়ছে। ঠোঁট দু'টো কাঁপছে। এরপর থরথর করে সমস্ত শরীরটাই কাঁপতে লাগল। বিস্মিত হওয়ার ও সময় নেই। মুখটা একবার আকাশের দিকে তুলে পরক্ষণেই একটা তীব্র কাতরানির সঙ্গে লুটিয়ে পড়লেন বালির ওপর।"[৩৫] বস্তুত, "কলকাতা-করাচীর নবীন প্রতিবেশে অবাধ জীবন উপভোগের আনন্দে জোবেদা খালা ডুবে থাকলেও প্রথম দাম্পত্য জীবনের প্রেম তাকে কাতর করে তুলছে। মধ্যবিত্তের মানসিকতা তাকে উচ্চ বিত্তের শ্রেণীর আসনে দাঁড় করাতে দেয়নি ভেতর থেকে।"[৩৬]

'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' উপন্যাসে আরো দু'টি প্রেম ও তার পরিণামের ঘটনা বিদ্যমান। একদিকে জামিল চৌধুরী ও মীরা এবং অন্যদিকে মুজতবা ও মগকন্যা তিনার প্রেম কাহিনীতে জামিল ও তার স্ত্রী মধ্যবর্তী বিকারকে অতিক্রম করতে সক্ষম হলেও মুজতবা ও তিনার প্রেম বিকার ও অনিশ্চয়তার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। প্রেমের পথ ধরেই জামিল মীরার বিয়ে হয়। অথচ দু'সন্তানের মা-বাবা হবার পরও তাদের দাম্পত্য কলহ ঘোচেনি। এক পর্যায়ে জামিল ও মীরা আলাদা থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। শুরু হয় তাদের দাম্পত্য কলহ। স্ত্রী ও সন্তানের প্রতি দায়িত্ব পালনে সচেতন নয় এই অভিযোগে থেকেই মীরা ও জামিলার দাম্পত্য জীবনে নেমে আসে যন্ত্রনা। কিন্তু জামিলের জীবন দর্শন দিয়ে তার শিল্পী সত্তার স্বরূপকে সন্ধান করতে চেয়েছে। এ ভাবেই শেষ পর্যন্ত তাদের দাম্পত্য কলহ আর স্থায়ী থাকেনি।

Dhaka University Institutional Repository


চিত্র শিল্পী মুজতবা জাহেদের বন্ধু। সে পতিতালয়ে রাধারাণীর সাথে ভাব জমিয়ে ছবি আঁকার কাজে সহযোগীতা করেছে। লেখক এ চরিত্রের মাধ্যমে পতিতালয়ের নারীর সামাজিক অবস্থান তাদের কার্যকলাপ, নারীর জীবন চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি জামিলের পতিতালয়ে যাওয়ার আসার সূত্র ধরে জীবন চলে। কিন্তু তার প্রেমময়ী স্ত্রী তিনাকে আড্ডার এক পর্যায়ে চট্টগ্রামের বাংলোতে তিনার বাবা যখন তাকে আনা দেয় তখন পাহাড়ের বুক চিরে যেন তিনার কণ্ঠস্বর শুনতে পায় জামিল। আর এ রাতেই যে তিনার ভালবাসার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু মধ্যবিত্তের হেয়ালিপনা তিনার মত একটা সরলপ্রাণ মেয়ের জীবনকেই নষ্ট করেনি। প্রেমকেউ কলুসিত করেছে।

## ২. খ. কর্ণফুলী

আলাউদ্দিন আল আজাদের 'কর্ণফুলী'(১৯৬২) উপন্যাস কর্ণফুলী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের সম্প্রদায় বিশেষের জীবন প্রবাহের শব্দরূপ অনুরঞ্জিত হয়ে উঠেছে। নদীমার্তৃক বাংলাদেশের অসংখ্য স্রোতস্বিনী নদীর মধ্যে কর্ণফুলী অন্যতম। লুসাই পাহাড় এ নদীর উৎসস্থল। পার্বত্য রাঙ্গামাটি ও চট্টগ্রামের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অবশেষে এ নদী বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে। একটি বিশেষ লৌকিক উপাখ্যান রয়েছে এ নদীটির নামকরণের পিছনে। তার তীরের মানুষের মনের অশান্ত কামনাও দূর সমুদ্রের দিকে। নদীর গতি আর মানুষের মনের গতি দূরাভিমুখী। এ নদী তীরের বাসিন্দা ইসমাইলের মনের কোণে সমুদ্রাভিযানের সুপ্তবাসনা। সে বাসনা চরিতার্থতার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তার আর্থিক দৈন্যতা। তবুও থেমে থাকে না তাদের জীবনাচার এ সব মানুষের বিচিত্র জীবন প্রণালীই 'কর্ণফুলী' উপন্যাসের মূল উপজীব্য।

'কর্ণফুলী' উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র নীলমনির প্রেক্ষণ বিন্দু থেকে লেখক কর্ণফুলীর নদীর নামকরণে উপাখ্যান সম্পর্কে যে ইঙ্গিত করেছেন তা নিম্নরূপ ঃ "নীল মনির মনে পড়লো সেই রূপকাহিনী, সেই যে উজির জাদীর কানের ফুল পড়ে গিয়েছিল, যার থেকে এই গাঙের নাম হলো কর্ণফুলী। সে বলল, অলে ঈদ্যুকা রেদত উজির বিঁ হানত্তুন হানফুল্ল ঝুরি পজ্যা"[১৭]

তবে একটি লোক প্রচলিত আখ্যানকে কেন্দ্র করেই যে কর্ণফুলী নদীর নামকরণ করা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। "আলাউদ্দিন আল আজাদ 'কর্ণফুলী' নামে এ উপন্যাসটি প্রকাশ করায় মনে হয়, এ উপন্যাসে কর্ণফুলী নদীর তীরবর্তী মানুষের বিচিত্র জীবন যাপন প্রণালীকে কল্লোলিনী কর্ণফুলীর জল প্রবাহের সঙ্গে সমন্বিত করে পরিবেশন করেছেন তিনি। কিন্তু সমগ্র উপন্যাসে সে প্রত্যাশা দুঃখজনকভাবে দুর্লভ।

এ-উপন্যাসে কর্ণফুলী নদী বিধৌত বিশাল অঞ্চলের বিস্তৃত জীবনালেখ্য রচনার মতো অভিনিবেশ উপন্যাসিকের ছিলো বলে মনে হয় না।"[৬৮]

আলাউদ্দিন আল আজাদ এ উপন্যাসে ইসমাইল চরিত্রকে নানা প্রেক্ষণবিন্দু দিয়ে উপস্থাপন করেছেন। পাহাড়তলীর 'ঘিঞ্জি খড়োঘরের হিজিবিজি' পরিবেশের বাসিন্দা ইসমাইলের মানুবিবিকে নিয়ে বসবাস। সে একজন পকেটমার। জীবনের সমস্ত সমারোহ, সুখ-শান্তি, হাসি-আনন্দ থেকে বঞ্চিত তাই স্বপ্ন দেখে সুখী-স্বচ্ছল জীবনের। স্বপ্ন দেখে সারেঙ হয়ে সমুদ্র ভ্রমণের ঃ "স্বপ্ন ছিল সারেঙ হবে, খুব বড় সারেঙ, সাত দরিয়া যে চরে বেড়ায় সেই বড় জাহাজের সারেঙ। অনেক বড় স্বপ্ন, ছোটবেলার স্বপ্ন, কৈশরের স্বপ্ন এবং যৌবনের স্বপ্ন। কিন্তু কোথায় ? বুকের ঘাম, চোখের পানি এক করেও এত বছরে একটা নলিও যোগাড় করতে পারেনি।"[৬৯] জীবনের একমাত্র স্বপ্নাকাঙ্খার অচরিতার্থতায় হতাশ ও বিভ্রান্ত ইসমাইল অতঃপর যে পেশায় নিক্ষিপ্ত হয় তা অনৈতিক। এ অনৈতিক ও অসামাজিক জীবনপথে সে পরিচিত হয় শঠ ও ধূর্ত ব্যবসায়ী। রমজান আলীর সঙ্গে। রমজান আলীর গোমস্তারূপে সে কয়েকদিনের জন্য উপস্থিত হয় কাসালং নদীর পার্শ্ববর্তী পার্বত্যাঞ্চল ফুলছড়িতে। এ দুর্গম পার্বত্যাঞ্চলে এসে ইসমাইল প্রথমে পরিচিত হয় এক অদ্ভুত দর্শন ব্যক্তির সঙ্গে। তার নাম লালন-লাল-চাচা, পাগলা জামাই। এ এলাকায় লালন ছিলো একজন আগন্তুক। একদা বাঁশ কাটতে এসে চাকমার মেয়ে ধলা বিবিকে বিবাহ করে। সে এখানেই এখন স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। লালন-ধলাবিবির বিবাহ প্রসঙ্গে এ উপন্যাসের অন্যতম পার্শ্ব চরিত্র রমজান আলী আদিবাসী চাকমাদের জনজীবনে প্রচলিত 'ধনপতি-রামমোহন' উপন্যাসটি ইসমাইলের কাছে উপস্থাপন করে। চাকমা সম্প্রদায়ের আদি উৎস সম্পর্কে চাকমা সমাজের প্রচলিত রয়েছে দু'টো পুরাকাহিনী ঃ 'ধনপতি রাধামোহন উপাখ্যান' এবং 'চাটিগা ছড়া'। দ্বিতীয় উপাখ্যানটি প্রথমটির প্রলম্বিত রূপমাত্র। চাকমা সমাজের প্রচলিত ধনপতি রাধামোহন উপাখ্যানের তথ্য সূত্রের সঙ্গে উপন্যাস বর্নিত তথ্যের পার্থক্য সুস্পষ্ট। তা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে এ উপন্যাসের প্রথমেই বর্ণিত লেখকের কথায় ঃ "লোক চরিত্রের মুখে লোকভাষার ব্যবহার কালিদাসের আমল থেকেই প্রচলিত। আধুনিক কালেও এর জের চলেছে ; সে জন্য 'নীল দর্পণ' কি 'পটলডাঙ্গার পাঁচালী', পদ্মানদীর মাঝি কি 'হাসুলিবাঁকের উপকথা'য় আমরা প্রাকৃত কণ্ঠস্বর শুনতে পাই এবং মনে হয় চরিত্রকে অধিকতর 'স্বাভাবিক' করার শৈল্পিক তাগিদ থেকেই এই রীতির জন্ম। কিন্তু আমি এর অর্থ বুঝিনে ; সাহিত্য জিনিসটাই তো কৃত্রিম ও নির্বাচিত। সে হিসেবে প্রকৃত জনের সংলাপেও খানিকটা কৃত্রিমতার আমদানী করলে ক্ষতিটা কোথায়?"[৭০] এ উপন্যাসে তিনি আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ব্যক্তির বিকাশ, তার সংকট ও সম্ভাবনা নিজস্ব রীতিতে সুনিপুণভাবে বিন্যস্ত করেছেন।

এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র শুধু ইসমাইল নয়, তার সঙ্গে সহকর্মী রমজানও জীবনের তাগিদে ছিনতাই রাহাজানি, ডাকাতি, নারী পাচার ইত্যাদি অসামাজিক কাজে জড়িয়ে পড়ে। এসব কাজে

Dhaka University Institutional Repository


ইসমাইলকেও বহুদিন রমজানের সহযোগী হতে হয়েছে। কিন্তু ইসমাইলের একটা স্থির লক্ষ্য ছিলো 'নলি' সংগ্রহ করা। জাহাজের চাকরি পেতে হলে 'নলি' প্রয়োজন। আর 'নলি' পেতে হলে ঘুষের প্রয়োজন, অর্থের প্রয়োজন। সে অর্থ যে করেই হোক সংগ্রহ করতে হবেই। উৎকোচ প্রদানের রীতি এ দেশের সামাজিক জীবনের সর্বস্তরে প্রচলিত। কিন্তু অর্থ উপার্জনের জন্য যে কাজ তাও সহজে পাওয়া যায় না। রমজানের নির্দেশে ইসমাইল কত স্থানে, অবস্থানে যাতায়াত করে, কিন্তু কর্মের সংস্থান হয় না। আবার এসব দরিদ্র মানুষ যা দিনের বেলা উপার্জন করে তা রাতের বেলা ব্যয় করে নিষিদ্ধ পল্লীতে। এদের বসবাস শহরতলীতে কিংবা শহরের বস্তিতে, জীবনের সাধ এখানে অকল্পনীয়।

কেরামত আরেক দরিদ্র বস্তিবাসী। তার কন্যা জুলিও জানেনা পিতা কি কাজ করে। কিন্তু তারা যে অতি দরিদ্র তা জানে কিশোরী, জুলির পোশাকে দেহে দারিদ্র্যের চিহ্ন-চুল তৈলবিহীন। নেই চিরুনীর কোন চিহ্ন, অন্ন, বস্ত্রের তেমন সংস্থান না থাকলেও পাড়া-প্রতিবেশী বিবাহযোগ্য আর পাঁচটা মেয়েকে দেখে তারও মনে নানান শখ জাগে। কিন্তু তা পূর্ণ হওয়ার আগেই নিজের অগোচরে কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করে। ইসমাইল তাকে অনেক আংটি পরালেও জুলির পিতা তাকে অর্থের লোভে অন্য জায়গায় বিয়ে দিতে চায়। কিন্তু জুলির অন্তরে মিশে থাকা সে আংটি পরানোর স্মৃতির কারণে সে ইসমাইলের সঙ্গে তার ঘরে চলে যায়। অবশেষে জুলির পিতা ইসমাইলের হাতে তার কন্যাকে তুলে দেয়। এর মাঝে ইসমাইলের জাহাজের চাকরিটা হয়ে যায়। স্বামীর মঙ্গল কামনায় রাতে সে তাবিজ আনতে যায়। কিন্তু ইসমাইল তাকে ভুল বুঝে চপেটাঘাত করে। পরে তার মায়ের কথায় ভুল বুঝতে পেরে নিজেই অনুতপ্ত হয়ে জুলিকে বুকে টেনে নেয়। এর মাঝে ইসমাইলের বিচারের দিন এসে যায়। জাহাজ ঘাটে সবাই ইসমাইলের বিয়ের দিন এসে যায়। জাহাজ ঘাটে সবাই ইসমাইলকে বিদায় জানাতে যায়। জুলিও যায় সেখানে। জাহাজ ছেড়ে দিলে তার চোখের অশ্রুধারা যেন কর্ণফুলীর প্রবাহের সঙ্গেই মিশে যায়। জাহাজটা আর দেখা যায় না। সামনে শুধুই নীল আকাশ আর নীল দরিয়া দেখা যায় না।

সংগ্রামী এক যুবক চরিত্র ইসমাইল জীবনের অনেক অঞ্চলির পার হয়ে একটি সুস্থ সৎ জীবন-যাপনের জন্য সে জাহাজে চাকরি নিয়ে। বিদেশের পথে যাত্রা করে-পশ্চাতে ফেলে রেখে গেল মমতাময়ী স্ত্রী জুলিকে আর শিশু সন্তানকে। "আজাদের কৃতিত্ব, তিনি সমাজের পঙ্কিলতা থেকে একটি মানব সন্তানকে উদ্ধার করে সৎ জীবনের পথে, মানবতার পথে নির্দেশিত করেছেন। দারিদ্র্য, প্রলোভনে দুর্নীতির নানান পঙ্কে নিমজ্জিত, তা থেকে তো তাকে উদ্ধার করা চাই।"[৭১]

বস্তুত, আঞ্চলিক পরিপ্রেক্ষিতকে যে মানবাত্মার স্বাধীনতা ও বৈশ্বিক অনুভূতিকেও যে একটি বিশেষ নব সৃষ্টির আনন্দকে নবরূপে অবগাহন করে 'কর্ণফুলী' তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কঠিন সত্যকে নির্মম নৈর্ব্যক্তিক ও সত্যনিষ্ঠভাবে উপস্থাপনের ক্ষমতা সমকালীন বাংলা সাহিত্য বিরল।

Dhaka University Institutional Repository



## ২. গ. ক্ষুধা ও আশা

আলাউদ্দিন আল আজাদের 'ক্ষুধা ও আশা' (১৯৪৬) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ,মহামারী ও সর্বব্যাপ্ত সামাজিক অবক্ষয়ের পটভূমিতে রচিত। এ উপন্যাসে একাধারে ফুটে উঠেছে বৈধ-অবৈধ চেতনা, নগর সঙ্কট, হিন্দু মুসলমানদের সম্পর্ক ও দুর্ভিক্ষের নির্মমতা ও অভিঘাতে কৃষিমূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঢাকা শহরে আশ্রয় গ্রহণকারী একটি পরিবারে বিপর্যস্ত হয়ে যাওয়ার মর্মন্তুদ ইতিহাস। "হানিফ, ফাতেমা ও তাদের দুই সন্তান জহুরা ও জোহার জীবন সংগ্রাম উন্মোচনের সূত্রে ঔপন্যাসিক দেশবিভাগ-পূর্বকালীন সমাজ বাস্তবতার অন্তর্সত্য স্পর্শ করেছেন।"[৭২]

'ক্ষুধা ও আশা' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র জোহা। বাস্তুত্যাগী দুর্ভিক্ষ পীড়িত অগনিত মানুষের বেঁচে থাকার নিশ্চিত সম্ভাবনায় শহরাভিমুখি গন্তব্যে জোহা তার পিতা চাষী হানিফ, মা ফাতেমা, বোন জোহুকে নিয়ে সহযাত্রা হয়েছে। যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের অবক্ষয়ী অভিশাপে জোহা পরিবারের শান্তির স্নিগ্ধতায় নেমে এসেছে নিষ্টুর নৈরাশ্য এবং কেন্দ্রচ্যুতির অভিশাপ। একারণে অনিশ্চিত সে গন্তব্যে তার জীবনাকাঙ্খা খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার মধ্যেই সীমত ছিল। শহুরে মধ্যবিত্ত চরিত্র মোহাম্মাদ আলীর বামপন্থী রাজনীতি চিন্তা চেতনার অধিকারী হয়েছে। ফলে শ্রেনীচ্যুত, গ্রামবিচ্ছিন্ন পরিবারের সন্তান জোহা শহরে পা-ফেলেই উপলব্ধি করে এর জান্তা ও অন্তর্শূন্য রূপ দুঃখ ও যন্ত্রনার জটিল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পরিপক্ক হয়ে উঠতে থাকা জোহার অন্তর্জগতে একটা প্রত্যাশাও স্বপ্নের অনুরণন শুরু থেকেই লক্ষ্য করা যায় ঃ "জোহাও বসে মা'য়ের কোলের কাছে বাইরের একটু আলো, দূরের অস্পষ্ট কোলাহল আর কাছের ফিসফাস আলাপ, সব মিলিয়ে কেমন একটা অনিশ্চিত অনুভূতি। রাস্তায় পড়ে মরতে হবে? গেঁগেরাম থেকে যারা আসে, তাদরে বোধ হয় এই গতি, নইলে যে বললে সে জানবে কেমন করে। আসুক তবু সকলে তো আর মরে না। যারা বাঁচতে জানে, তারা মরবে কেন এবং বাঁচবার জন্য চেষ্টা করতে হবে সাধনা। হাত পা গুটিয়ে থাকলে চলবে না। শরীরে এখনো কিছু জোর আছে, কাজের ফিকির দেখা দরকার। ভিক্ষা? এর প্রতি প্রচন্ড ঘৃণা, পন্ডিত বলতেন, অন্যের কাছে হাত পাতা নিজেকে ছোটো করা। এতে আত্মার অপমান, সেজন্যে সত্যের পথে, পূর্ণতার পথে কেহই চলতে পারে না। মিথ্যায় ভরা দুনিয়া, কাজেই একমাত্র সংগ্রামের মধ্যেই সত্যের প্রতিষ্ঠা। সত্য মানেই সংগ্রাম। মহাপুরুষরা তা উপলব্ধি করেন, তাই সত্যের জন্য জীবন দিতেও কুন্ঠিত হন না। সে জীবন দেয়া নয় জীবন সৃষ্টি করা। আলো দিয়ে আলো জ্বালা।"[৭৩]

'ক্ষুধা ও আশা' উপন্যাসের প্লট বিন্যাসে ঘটনার কার্যকারণ শৃঙ্খলার উপর তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। চরিত্র চেতনার সূত্র ধরে নির্দিষ্ট কালখন্ডে সংঘটিত বিচিত্র ঘটনা বিধৃত হয়েছে। এপিক ফর্মের উপন্যাসে সাধারণত চরিত্রের বহির্জাগতিক সক্রিয়তাই ঘটনাকে করে গতিশীল ও প্রাণবন্ত। কিন্তু এ

Dhaka University Institutional Repository


উপন্যাসে প্রধান চরিত্র জোহা এবং অন্যান্য চরিত্রের আন্তরজাগতিক প্রতিক্রিয়ারই রূপায়ণ ঘটেছে। ঘটনা নয়, ঘটনার প্রতিক্রিয়ার চরিত্র চিত্রের অস্থিরতা, উদ্বেগ, যন্ত্রণা ও রক্তপাত প্রাধান্য লাভ করেছে। এ প্রসঙ্গে ডক্টর রফিকউল্লাহ খানের বক্তব্য স্মরণীয়-"ইতিহাস-অবলম্বী উপন্যাসের কাহিনী সাধারণত মোটা দাগে অংকন করা হয়। 'ক্ষুধা ও আশা'য় অনেকটা সূক্ষ্ম টানে ঘটনার বিন্যাস ঘটেছে। কখনো কখনো অতীত ও বর্তমান অঙ্কিত হয়েছে সমান্তরাল রেখায়। বর্তমান বহিঃর্বাস্তবতা সংলগ্ন আর অতীত উৎসাহিত হয়েছে মনোজাগতিক স্মৃতি রোমন্থনে। জোহার অস্তিত্ব সংগ্রামের ব্যর্থতার সঙ্গে পরস্পরিত হয়েছে বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের ব্যর্থতা।"[১৪]

'ক্ষুধা ও আশা'র অধিকাংশ চরিত্র ঘটনা নিয়ন্ত্রিত ও সময়শাসিত। অভিজ্ঞতার দ্বন্দ্বাত্মক গতিধারায় জোহা চরিত্র সার্থক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু আর কোন চরিত্রই ব্যক্তিস্বত্তার আত্মোপলব্ধির মধ্য দিয়ে হয়ে ওঠেনি। বরং সময়-স্বভাবের নেতিবাচক প্রবণতার নিষ্ক্রিয় শিকারে পর্যবসিত হয়ে উঠেছে। জোহার শ্রেণী অবস্থান এবং মানস গড়নের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তার আন্তরসক্রিয়তা বহুলাংশে সঙ্গতিহীন। অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে সোনা হয়ে ওঠে না বরং অভিজ্ঞতার জ্বালা তার চেতনাকে অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করেছে। ঘটনা অপেক্ষা ঘটনার প্রতিক্রিয়ার চরিত্রানুগ বিন্যাসের প্রয়োজন এ- উপন্যাসের চরিত্রায়ণ কৌশলকে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করেছে। নাগরিক জীবনে উৎপীড়িত অপাংক্তেয় জোহা শহরের প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে লিনা'র রাজনৈতিক চেতনায় প্রভাবিত হয়ে জেগে উঠেছে। নতুন সত্য দর্শন তাকে নব জীবন দিয়েছে। বামপন্থী রাজনৈতিক চেতনা হয়েছে তার জীবন দর্শন। লিনার ভাই রেজা অসম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বস্ত হয়েও জীবন অভিজ্ঞতার আলোকে স্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তাকে সমর্থন করেছে ঃ "সে ঘৃণা বিচ্ছিন্নতার বীজ আমরা নিজের হাতে বোপন করেছি তা বড় গাছ হয়ে উঠেছে। তার ফল আমাদেরকে ভোগ করতে হবে। তবে কোনদিন ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠবেনা তা নয়, তবে সে হবে সমমর্যাদা, সমঅধিকার ও সমমূল্যের ভিত্তির উপর।"[১৫]

অঘোর চ্যাটার্জি আত্ম-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়ে অকপটে স্বীকার করেছেন, বখতিয়ার খিলজীর গৌড় বিজয়ে সময় থেকেই হিন্দুরা মুসলমানদের মানুষ মনে করেনি, 'নেড়ে' বা 'ম্লেচ্ছ' বলে ভূষিত করেছে। তিনি আরো স্বীকার করেছেন যে, যখন হিন্দুরা মুসলমানদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছে তখন তাদেরকে প্রতারণা করাই ছিল উদ্দেশ্য। তারা তার দৃঢ় বিশ্বাস পাকিস্তান অপরিহার্য। তিনি নিজে পাকিস্তানে থাকতে পারবেন না, থাকতেন না : তবু-সেই দেশই চিরকাল নিজের দেশই হয়ে থাকবে তার কাছে। মায়ার উদ্দেশ্যে উচ্চারিত তার সংলাপে বাঙালী হিন্দুর দুই শত বছরের আত্ম-বিশ্লেষণের স্বরূপ, বিধৃত ঃ "আজকেই আমি হঠাৎ উপলব্ধি করলাম মুসলমানদের আমরা কতটা ঘৃণা করে এসেছি। সেই বখতিয়ার খিলজির গৌড় বিজয়ের সময় থেকেই। যেখানে ভালো ব্যবহার করেছি সেখানে হয় আছে কোন স্বার্থ

আদায়ের চেষ্টা নয় কোন নিশ্চিত প্রতারণা।"[১৬] জীবন জ্ঞান সচেতন মোহাম্মদ আলীর প্রেম জীবন ও দ্বিধাজীর্ণ। প্রথমে লিনা এবং পরে সুজাতার প্রতি প্রেমাকর্ষণের মধ্যে এক ধরণের দ্বন্দময় চারিত্র্য বৈশিষ্ট নিহিত। প্রেমের আগুনে লিনা আত্মাহুতি দিলো, আর আমোর বাবুর মেয়ে সুজাতাকেও তার অধিকার করা সম্ভব হলো না। অবশেষে পাকিস্তানে না থেকে ভারতে ফিরে যেতে হয় তাকে।

বস্তুত, এ উপন্যাসে নাগরিক জীবনে উৎপীড়িত অপাংক্তেয় জোহা শহরের প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে লিনার রাজনৈতিক চেতনায় প্রভাবিত হয়ে জেগে উঠেছে। নতুন সত্য দর্শন তাকে নব জীবন দিয়েছে। বামপন্থী রাজনৈতিক চেতনা হয়েছে তার জীবনদর্শন। লিনার ভাই রেজা অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বস্ত হয়েও জীবন অভিজ্ঞতার আলোকে স্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তাকে সমর্থন করেছে। "নাগরিক মধ্যবিত্তের এ জীবনরূপ সমাজ বিকাশের অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে অনিবার্যসূত্রে গ্রথিত। আলাউদ্দিন আল আজাদের জীবনার্থের মর্মমূলে এ পর্যায়ে হ্যা-ধর্মী উপলব্ধির উপস্থিতি সুস্পষ্ট তার 'ক্ষুধা ও আশা' এই উপলব্ধিরই মহাকাব্যিক শিল্পরূপ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও সর্বব্যাপ্ত সামাজিক অবক্ষয়ের পটভূমিতে জোহা ও তার পরিবারের অস্তিত্ব সংগ্রাম সময় ও সমাজের সমগ্রতাকে স্পর্শ করে। শ্রেণী স্বার্থের অন্তর্দ্বন্দে যে সমাজ বিকশিত হয়-এ সত্য আলাউদ্দিন আল আজাদে সচেতনভাবে উচ্চারিত হলো।"[১৭]

মোহাম্মদ আলী প্রগতিশীল রাজনৈতিক চরিত্র, সচেতন দেশ প্রেমিক। দুর্ভিক্ষের পর স্বাধীনতা তার কাছে অর্থপূর্ণ মনে হয়নি। কারণ এ দেশের স্বাধীনতার অর্থ ধোয়া দিয়ে শূন্যতাকে ঢাকবার চেষ্টা। দেশের মুক্তি কোন পথে হবে, কি রূপ নিয়ে আসবে স্বাধীনতা ? তারা নতুনভাবে শোষণের শিকার হবে বিদেশীর জায়গায় দেশীয় প্রভুর। স্বাধীনতার অর্থই হবে নিরর্থক। মূলত আলাউদ্দিন আল আজাদের এ উপন্যাসের কাহিনীতে "যুদ্ধ দুর্ভিক্ষসহ সাধারণ মানুষের আশাবাদী জীবন সংগ্রামের কাহিনী চিত্র ধরা পড়েছে রাজনীতির বৈধ অবৈধ চেতনা, নগর সংকট, হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক, দুর্ভিক্ষের নির্মমতা। রাজনীতি চেতনায় ধরা পড়েছে মধ্যবিত্ত চরিত মানস"[১৮]

আলাউদ্দিন আল আজাদ ইতিহাসের ঘটনা ধারাকে নয় তিনি সন্ধান করেছেন ইতিহাসের সত্যকে। জোহা তার ভাসনী জহুকে খুঁজে না পাওয়ার ব্যর্থতার মধ্যে এক মৃত্যুমুখ "জননীর গায়ে গা চেপে এবং শিশুটিকে পরম যত্নে আগলে দারুন শীতে অন্ধকারে বসে থাকে ভোরের প্রতীক্ষায়।"[১৯] বস্তুত, 'ক্ষুধা ও আশা' উপন্যাসে যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের অবক্ষয়ী-অভিশাপে জোহা পরিবারের স্বাভাবিক জীবনাচারে এসেছে নিষ্ঠুর নৈরাশ্য এবং কেন্দ্রচ্যুতির অভিশাপ। এ বিপর্যয়ে তারা গ্রাম ছেড়ে শহরে এসেছে। কিন্তু অনিবার্য অবক্ষয় থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেনি। ফলে হানিফ পথ হারিয়েছে, জহু হারিয়ে গেছে শহরের কদর্য পঙ্কিল গণিকালয়ে, কালের বিভ্রান্তিতে ফাতেমা হারিয়েছে নিজের কাছে। জোহা পরিবারের সামগ্রিক একাত্মতায় নেমেছে মৃত্যুর অন্ধকার, মোহাম্মদ আলীর আশ্রয় হয়েছে লৌহকবাটের অন্তরাল।

Dhaka University Institutional Repository


অঘোরবাবু যুগব্যাপী ঐতিহাসিক অন্যায়ের খেসারত দিয়ে চলে যাচ্ছে কলিকাতায়। লেখক 'ক্ষুধা ও আশা'য় একটি অস্থির যুগের মর্মন্তদ মর্মবেদনা এভাবেই রূপায়িত হয়েছে।

## ২. ঘ. জেগে আছি

চল্লিশের দশক বাংলা কথা-শিল্পের এক অতি উল্লেখযোগ্য দশক। ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসানের কারণে চরম বিপর্যয়ের মধ্যেও মানুষের জন্মগত স্বাধীনতাকামী মনে আশাবাদ সঞ্চারিত হয়। ইতিমধ্যেই বাঙালী মানসে ইউরোপীয় সভ্যতার বিকাশ শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিপ্লবে জোর প্রভাব বিস্তার করে। দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে ভারত স্বাধীন হয়। কিন্তু, হিন্দু-মুসলমানদের জাতিগত বিদ্বেষ খণ্ডিত ভারতের রাজনৈতিক পরিবেশ ঘোলাটে করে তোলে। ফলে সমাজ ও মানুষ এক নির্মম পরিবেশের শিকার হয়। ভাগ্য লাঞ্ছিত সমাজ ও মানুষের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে অন্যান্য কথাশিল্পীর মত আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯)-এরও এই প্রেক্ষাপটে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাব ঘটে। বস্তুত, "সংগ্রামী মানুষের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার আলাউদ্দিন আল আজাদকে নিঃসন্দেহে সম্মানিত করা যায়। সাধারণ মানুষের ঘনিষ্ঠ চিত্র তাঁর মত আঁকতে পেরেছেন খুব কম লেখকই। গ্রামীণ জীবন ছাড়াও তিনি শহুরে জবিন যাত্রার নিম্নবিত্ত শ্রেণীটিকে তুলে এনেছেন তাঁর লেখায়"[৮০] আলাউদ্দিন আল আজাদের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'জেগে আছি' গল্পের সংক্ষিপ্ত কাহিনীর মধ্যে লেখক অর্থ, লোভ ও লালসার বশবর্তী হয়ে কিভাবে নিজের শ্রেণী মানুষকে শোষণ ও নির্যাতন করতে পারে এবং সব শ্রেণীর শত্রুতে পরিণত হয় তা সুনিপুণভাবে বিন্যস্ত করেছেন। গল্পটিতে শ্রেণী দ্বন্দ্বের তীব্র ছাপ বিদ্যামান। একটি নেপথ্যে রাজনৈতিক আবহ ঐ দ্বন্দ্বকে আরও প্রাণময় করে তুলেছে।" এ রকম একটি ঘটনা বুর্জোয়া সভ্যতার আবেষ্টনী শুধু ১৯৪৮ সালে নয়, যে কোন সালেই ঘটা সম্ভব। বাস্তব ক্ষেত্রে সে সময়ের মত এখনও এরূপ ঘটনা ঘটে থাকে। অতএব গল্পটি যে বাস্তব তা স্বীকার্য।"[৮১]

৫৫৪৭৭৫

'সৃষ্টি' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র জনৈক শিক্ষক। এ-গল্পে পনেরো টাকা মাসিক বেতনের গ্রাম্য স্কুলের ম্যামুদ পণ্ডিতের সঙ্গে ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বর কাশেম আলী চৌধুরীর দ্বন্দ্বের ফলাফল বর্ণিত হয়েছে। সরকার গাঁ-গেরামের প্রাইমারী স্কুল তুলে দেবে-এই জনরবের পরিপ্রেক্ষিতে চৌধুরী তার নিজের জমিতে প্রতিষ্ঠিত স্কুল তুলে দিতে চান। পণ্ডিত তাতে বাঁধা দিলে চৌধুরীর লোকজন পণ্ডিতের মাথা ফাটিয়ে দেয়। ইতিমধ্যে স্কুল তুলে দেবার বিরুদ্ধে অন্যান্য শিক্ষকরাও প্রতিরোধ সৃষ্টির চেষ্টা করে। পণ্ডিত প্রাণনাথ মণ্ডল, আব্দুল মজিদ প্রমুখ শিক্ষক-সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধের নতুন ইতিহাস রচনার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। এটিই 'সৃষ্টি' গল্পের মূল বিষয়। এ গল্পে শিক্ষকদের দুর্দশার চিত্র নিপুণভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository


'রঙিলা' গল্পে অশীতিপর বৃদ্ধা দয়ার মুখাপেক্ষী রঙিলার পিতাকে সামান্য কারণে জমিদারের লোকজন ধরে নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন করলে তার মৃত্যু হয়। রঙিলার স্বামীর মৃত্যু হয় বিয়ের দু'বছর পরেই। এ জগতে তার আপন বলতে কেউ নেই। গ্রামের পাশেই নায়েব-কাছারী, অত্যাচারী নায়েবের দৌরাত্মে অতিষ্ঠ গ্রামবাসী কাছারী পুড়িয়ে দেয় এবং সংবাদ সংগ্রহের জন্য বুড়িকে বেছে নেয়। কিন্তু তাতে কোন কাজ হয় না। উল্টো সে গ্রামবাসীকে আত্মরক্ষার জন্য বলে আসে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে বিত্তবান ফজর আলী আত্ম-রক্ষার জন্য গ্রামবাসীদের পুলিশের অত্যাচারে সাহায্য করেছে। কিন্তু বিত্তহীন বৃদ্ধা রঙিলা গ্রামবাসীদের সমস্ত অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্য রঙিলা নিজে প্রতিরোধ করতে গিয়ে অবশেষে গ্রেফতার হয়। সে কাছারী ঘর পোড়ানো, জমিদার ও নায়েবকে গালিগালাজ, গ্রামবাসীকে কর্কশ করে দেওয়া প্রভৃতি সমস্ত দোষ নিজের ঘাড়ে টেনে নিয়েছে। ফলে, গল্পের রঙিলা সাধারণ বুড়ি হলেও পরিশেষে এক অসাধারণ সংগ্রামের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। বর্তমান সমাজে জমিদারী প্রথার প্রচলন না থাকলে এ-গল্পের রঙিলা চরিত্রের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সময়ে জমিদারী প্রথার কষাঘাতে জর্জরিত খেটে খাওয়া মানুষের জীবন্ত চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

'ছুরি' গল্পের নায়ক ঢাকায় থাকে। পরিবারের অন্য সদস্যরা থাকে কোলকাতায়। সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের কারণে তার পরিবারের অনেক সদস্যকে হিন্দু উগ্রপন্থীরা খুন করে। বাড়ি-ঘর, দোকান-পাট ধ্বংস করে। মনসুর একটি শান্তি মিছিলের আয়োজন করতে থাকে। কিন্তু তার পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুতে হত বিহ্বল মনসুর পাশের বাড়ির হিন্দুদের হত্যা করতে উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে। যথারীতি পিতার সাথে রাত্রে পাশের বাড়ির গৃহকর্তাকে না পেয়ে কৃহকত্রীর হিরন্ময়ীকে খুন করতে যায়। কিন্তু পরিচিত এই বাড়িতে হিরন্ময়ীকে হত্যার বদলে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে। এ দিকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা পিতা মনসুরের বিলম্ব দেখে ঘরে ঢোকার চেষ্টা করলে মনসুর পথ আগলে রাখে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে পিতা মনসুরকে ছুরিকাঘাত করে। অতিরিক্ত রক্তপাতের ফলে এখানেই তার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর পূর্বে পকেটে থাকা ছুরি সে হিরন্ময়ীকে হাতে তুলে দিয়ে জানিয়ে গেল, সে এসেছিল তাদের রক্ষা করতে নয়, হত্যা করতে।

'শিকড়' গল্পে বিভাগোত্তর কালের মুসলিম-অমুসলিম সর্বহারা শ্রেণীর সামাজিক-অর্থনৈতিক অসহায় অবস্থার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। 'শিকড়' হচ্ছে শেকড়ের টানে দরিদ্র মানুষের একতাবদ্ধ হওয়ার কাহিনী। দেশ বিভাগের পর হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা অনেকে গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে, অনেককে চলে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে। গ্রামের বড় মিয়া তার ক্ষেতের মুনিষ হাফিজকে উস্কে দেয় কানাইয়ের বিরুদ্ধে। কানাই যেন এদেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয় এবং যাবার সময় তার বসতবাড়ীটা যেন বড় মিয়ার কাছেই বিক্রি করে। নইলে ফল ভালো হবে না। তিনি একই সঙ্গে প্রলোভন এবং ভীতি প্রদর্শন করেন হাফিজকে। হাফিজও লোভী হয়ে ওঠে, কিন্তু পরক্ষণেই তার সম্বিত ফেরে। তাই সে কানাই, জিনু, ভজহরি, নিতাইকে নিয়ে যুক্তি করে তারা

Dhaka University Institutional Repository


কেউ দেশ ছাড়বে না। বড় মিয়ার হুমকি বা প্রলোভন কোনটাতেই আর টলবে না। কারণ "এতদিন কিছুই অজানা থাকেনি। কারো কাছে চাপা থাকেনি এতটুকু, বড় মিয়ার কথিত আজাদী যে কি জিনিস তা আজ দিনের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মিথ্যা ভাওতায় আর ভুলবে না।"[৮২]

'জেগে আছি' গল্পগ্রন্থের অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে এবং আর্থ-পারিবারিক জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে। এ-গ্রন্থে তাঁর প্রখর সমাজ সচেতনতা ও বাস্তব জীবনবোধ পরিলক্ষিত হয়। "বস্তুত 'জেগে আছি' গ্রন্থের গল্পসমূহ যে সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবন সমস্যা চিত্রিত হয়েছে তা এই সভ্যতার চিরন্তন সমস্যা এবং সে কারণেই গল্পগুলোর প্রয়োগমূল্য আজও বর্তমান।

## ২. ঙ. ধানকন্যা

আলাউদ্দিন আল আজাদের পরবর্তী গল্পগ্রন্থ 'ধানকন্যা'। প্রকাশকাল ১৯৫১ হলেও মুখবন্ধ উল্লেখ করা আছে গল্পগুলোর রচনাকাল ১৯৪৯ থেকে ১৯৫০ এর মধ্যে। এ-কারণে এ-গ্রন্থের গল্পগুলো ১৯৪৭-৫০ কাল পর্বের অন্তর্ভূক্ত বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। এ-গ্রন্থের 'রোগমুক্তির ইতিবৃত্ত' গল্পটি উত্তম পুরুষে রচিত।

এ-গল্পে কলকাতাবাসী মুসলমান তরুণ দাঙ্গার সময়ে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এক সময়ে প্রাণভয়ে পালিয়ে আসে পূর্ব-পাকিস্তানে। অসুস্থ অবস্থায় ঢাকার হাসপাতালে ভর্তি হলে নার্স মনীষার সাথে তরুণের পালিয়ে আসার কথা শুনে মনীষা তাকে তিরস্কার করে। যারা রায়ট বাঁধায় তাদের বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়িয়ে কেন যে চলে এলো। মনীষার মতে প্রাণের ভয় যতই থাকুক প্রাণটা আদর্শের চেয়ে বড় কিছু নয়। অনেক পরে মনীষার জীবনের কাহিনী উদ্বাস্তু যুবকটি শুনতে পায় হাসপাতালের এক দিদি-মনির কাছ থেকে, মনীষার বিজ্ঞানের অধ্যাপক পিতার ল্যাবরেটরীতে কাজ করত। অশোকদার সঙ্গে মনীষার হৃদয় বিনিময় হয়েছিল। সাহসের সঙ্গে দাঙ্গা-প্রতিরোধ করতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে অশোকের প্রাণ যায়। শুধু মনীষাকে বলে যায়-"তুমি কিছুতেই দেশ ছেড়ে কোথাও যাবে না।"[৮৩]

'ধানকন্যা'র 'শিষফোটার গান' গল্পে তৎকালীন ক্ষেতমজুরদের প্রতি জোতদার ভূস্বামীদের শোষণের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। মধুপুর অঞ্চলের জোতদার ভূস্বামী 'মিয়া'রা মজিদ-মনছুরালীর মত গরীব ক্ষেত-মজুরদের হাসি আঁধা বর্গা বাবদ অর্থ আদায়ও করে। মজিদ ও তার স্ত্রী মমিনা এই রকম একটি শোষিত পরিবার। মজিদ বৌয়ের গয়না বেঁচে অর্থ জোগাড় করে সেলামী দিয়ে দু'কানি জমি বর্গা পেয়েছে মিয়াদের। ফসল ভালো হয়েছে। তার আশা ফসল পাকলেই তাদের অভাব-অনটন দূর

Dhaka University Institutional Repository


হবে। স্ত্রীর শাড়ি, পেটের ভাত, কুপিতে কেরোসিন তেল যোগাড় করা যাবে। ফসল পাকতে থাকে। এর মধ্যে জোতদারকে ফসল না দেয়ার জন্য গঠন করা হয় পঞ্চায়েত। চলতে থাকে পাহারা। একরাতে সড়কি হাতে পাহারারত মজিদকে হুকো দিতে এসে স্ত্রী মমিনা বলে, "যে টেহা দিয়া অলঙ্কার বানাইবা, তা করলেই আমি সুখী অইয়াম। আর ও অনেক সুখী।"[৭৪] তার এ উক্তিতে মজিদ নতুন শক্তিতে উজ্জীবিত হয়। সে শুনতে পায় চড়া গলার সাবধান বাণী। 'পাহারা', 'হুঁশিয়ার'। মজিদ আর অপেক্ষা করে না। সে গাছের গুড়িতে ঠেকানো সড়কিটা হাতে তুলে নিয়ে ছুট দেয় ক্ষেতের দিকে। মমিনা দেখে "উঁচিয়ে ধরা সড়কির ফলাটা ঝকঝক করছে মশালের আলোর আভায়।"[৭৫] বস্তুত, এ-গল্পে ১৯৪৯-৫০ সালে ভাওয়ালের মধুপুর অঞ্চলে সংঘটিত তে-ভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট রচিত। এ-গল্পে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের নৈতিক অধিকারের চিত্র বিধৃত হয়েছে।

মলাট গল্পে লেখক প্রকৃতপক্ষে সমাজে নারীদের অসহায়তার চিত্র তুলে ধরেছেন। পুঁজিবাদী সমাজের কাছে একজন নারী একটি ম্যাগাজিনের মলাটে যেভাবে অর্ধ-উলঙ্গ হয়েছে, তেমনি কাদের তার নিজ স্ত্রীকে প্রমোশনের জন্য বড় সাহেবের সামনে উপস্থাপন করতে দ্বিধাবোধ করেনি। সমাজ বাস্তবতায় এ ধরণের চিত্র বিরল নয়।

'মেঘনা' গল্পের নায়ক সেকেন্দার আলীকে 'মেছুয়া' বলে খান্দানীরা একঘরে করে রেখেছে। তাতে সেকেন্দার বিন্দুমাত্র দুঃখিত হয় না। বরং মেঘনার জেলে মাঝিদের সঙ্গে তার সাম্প্রদায়িক আত্মীয়তা। সে সারারাত ঘাটের খবর রাখে। কারণ, জায়গাটা বড় ভয়াবহ। "জাহাজ-ঘাটের জেটিতে দাঁড়ানো দশজন লোকের মধ্যে সাতটিই গুণ্ডা, কাঁধে গামছা ফেলে যে গাট্টা লোকটা ছুঁচোর মত নেমে আসার দুরাবস্থার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ঘুরে বেড়াচ্ছে, আগামী রাত্রিতে কাদের আক্রমণ করবে, তারই ফন্দি আটছে মনে মনে। সবাই জানে জায়গাটা ভয়ঙ্কর।... এখানে রাত্রি নামে গলি ঘুপচিতে। পাটের গুদামের অপরিসর রাস্তায়, আলকাতরার পিপায়, গণিকালয়ের চাপা অট্টহাসিতে, দেশী মদের দোকানের, আর রাত্রি নামে মেঘনার কালো ঢেউয়ে।"[৭৬] তবুও তাদের গ্রামে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আঁচ লাগেনি। তাই গণেশের দেশত্যাগের প্রস্তুতি সবাইকে অবাক করেছে। যখন সবাই বুঝতে পেরেছে। এ কাজের জন্য গণেশ নয়, রমজানই দায়ী। তখন রমজানকে শাস্তি দিয়েছে সেকেন্দার। সেকেন্দার আলীর ভূমিকা একজন নিরীহ হিন্দু ঘাট মাঝিকে, তার স্বদেশ-ভূমিতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করে ব্যর্থ হয়ে যায় মহাজনের চক্রান্ত।

'মেঘনা' গল্পে লেখক শ্রেণীগত সহমর্মিতার অকৃত্রিম প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এ-গল্পের মূল্যে তৎকালীন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং বিরাজমান পরিস্থিতির ছায়াপাত ঘটেছে। ফলে গল্পটির বাস্তব ও সামাজিক ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। এ-গল্পের নামগল্প 'ধানকন্যা' গ্রামীণ জমিদার পরিবারের

Dhaka University Institutional Repository


অত্যাচারের কাহিনী। এতে তৎকালীন সাম্রাজ্যবাদী ভূ-স্বামী শ্রেণীর শোষণ-অত্যাচার ও অবিচারের চিত্র সুস্পষ্ট। এ-গল্পে নামহীন গাঁয়ের অধিবাসী গরীব কৃষক শেখ ফরিদ। 'সামান্য এক প্রস্থ জমি'-ভিটে বাড়ী ছাড়া আর কিছুই নেই তার। দু'বছর-ভাল ফসল না হওয়ায় এবং কাজের অভাবে-খাজনা দিতে পারেনি। সে অজুহাতে গ্রামের দেওয়ান বাড়ির ভূ-স্বামী তার জমি নিলাম করে নেয়। তার অতি প্রিয় কাজলী গাইটাকে নিতে গেলে সে আত্মজ্ঞান হারিয়ে মাথায় লাঠি মারে। ফলে,''দেওয়ান বাড়ীর কর্মচারীর এই রক্ত তার জেলে যাবার পথ চিহ্নিত করে দিল।''[৮৭] শেখ ফরিদের খুনের দায়ে তিন বছরের জেল হয়। এ জেল সে মেনে নেয় বাগদত্তা কনকতারার কথায়। 'কনকতারা' একটি ধানের নাম, একটি মেয়েরও নাম। শেখ আব্দুরে মেয়ে। ''তুমি ফিইরা যাও, আর কোন গোলমাল কইরো না। তোমার পথ চাইয়া থাকুম আমি। তোমারই পথ চাইয়া থাকুম।''[৮৮] এই আশ্বাসে সঞ্জীবিত শেখ ফরিদ তিন বছর বাড়ি ফিরে দেখে, উপায়হীন বুড়ি মা ভিক্ষে করে। কনকতারাকে নিয়ে গেছে যারা ফরিদের জমি নিয়েছে। দেওয়ান বাড়ির ছোটবউ কনকতারা কোন প্রতিবাদ করতে পারেনি। কিন্তু দেওয়ালে দাগ কেটে কেটে তিন বছরের হিসাব করে। যেদিন সত্যি সত্যি তিন বছর শেষ হয় সেদিন সে কিসের টানে বাইরের ইট খসে পড়া দেয়ালের পাশে জামরুল গাছটার নিচে এসে দাঁড়ায়। তার আলগা চুলের গোছা ওড়ে বাতাসে।''[৮৯] এ সময় জেল থেকে মুক্তি পাওয়া শেখ ফরিদও এসে দাঁড়ায় তার সামনে। কিন্তু মুহূর্তের ভুল বুঝাবুঝির এক পর্যায়ে ফরিদ ছুরি বের করে কনকতারাকে মারতে উদ্যত হয়। পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বলে-''যাও, ছাইড়া দিলাম। তোমার মত আরও মাইয়া মানুষ আছে দুনিয়াতে, যাও।'' কনক তখন ''আর্তনাদ করে-লুটিয়ে পড়লো মাটিতে।...ও দেয়াল টপকে অদৃশ্য হয়ে গেল।''[৯০] ফরিদের ভুল ভাঙাবার জন্য সে শোকে-দুঃখে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে।

এ গল্পে আলাউদ্দিন আল আজাদ একটি বিশেষ সময়ে এদেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতার চিত্র সুনিপুণভাবে উপস্থাপন করেছেন। সেকালের জমিদার-জোতদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের অত্যাচারে কিভাবে সাধারণ নিম্নবিত্ত মানুষ সর্বশান্ত হয়ে পড়েছিল। তার এক বাস্তব আলেখ্য তিনি রূপায়ণ করেছেন এ-গল্পে।

'সুরমা' গল্পে গ্রাম্য মাতব্বর, অবক্ষয়ী সামন্ত পুরোহিত শ্রেণীর প্রতিনিধি, হাজী আলী আখন্দের কাম-লোলুপতার ক্যানভাসে, বাসার চাকর আবু নয়ীম ও তার সুন্দরী স্ত্রী গুলনাহারের ঐকান্তিক প্রেমের দ্বন্দ্ব সংঘাতের চিত্র নিপুণ শিল্প-সৌকর্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ-গল্পে সমাজে প্রচলিত ধর্মীয় বিধি বিধান উপেক্ষা করে নয়ীম-গুলনাহারের গভীর রাতে পালিয়ে গিয়ে নতুনভাবে সংসার গড়ার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository


## ২. চ. উজান তরঙ্গে

আলউদ্দিন আল আজাদের 'উজান তরঙ্গে' গল্পগ্রন্থের 'উজান তরঙ্গে'-গল্পে দু'টি ভিন্ন সম্প্রদায়ের দু'টি নর নারীর নিখাদ ভালবাসার গল্প বিষয়কে গল্পরূপ দেওয়া হয়েছে। এ গল্পের নিতাই বর্মন একজন নিরেট দেশ প্রেমিক। পঞ্চাশের দাঙ্গার পরে মেঘনা পাড়ের জেলে পাড়ের অনেক সবাই চলে গেলেও সে যায়নি । কিন্তু এক রাতে তার একমাত্র কন্যা যমুনা ধর্ষিত হলো গুন্ডাদের হাতে। পরদিন যমুনার স্বামী তাকে ত্যাগ করে চলে যায় ভারতে। এদিকে নিতাই সন্তানকে ত্যাগ না করার কারণে একঘরে হয়। পেটের দায়ে যমুনা পতিতাবৃত্তিতে নাম লেখালে নিতাই যথার্থ নিঃসঙ্গ হল, কন্যার মুখ আজীবন দর্শন করলো না। এদিকে আবাল্যের খেলা সঙ্গী জুলমত যমুনাকে ভুলতে পারেনি, তিনটি শিশু সন্তানসহ বিপত্নীক জুলমত যমুনার কাছে যায়। কিন্তু যমুনার টাকার কাছেও দরা দেয় না। এমনকি বিয়ের প্রস্তাবও রাজী হয় না। নিতাই বর্মনের অন্তিম সময়ে যমুনাকে সবভুলে আসতে হয় জুলমতের নৌকায় চড়ে । বাপের মৃতদেহ সৎকার করে যমুনা জুলমতের নৌকায়ই ফিরে। রাতের গভীরতায় তখন চারদিক নিৎস্তব্দ পিতৃলোক কাতর যমুনা নেওকায় ঘুমিয়ে পড়ে। তখন নির অতন্ত্র জুলমতের মনের গভীরে জীবন-মৃত্যু আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ সব একাকার হয়ে গেছে। তার পাশব প্রবৃত্তিতে তখন মৃত। যমুনার একবিন্দু সংস্পর্শে তা যে প্রবৃত্তি এক সময় সাপের মতো ফুসে উঠতো, সে কোথায় মিলিয়ে গেল। জেগে উঠে যমুনা অনুভব করে জুলমতের ভালোবাসার গভীরতা। জুলমতের মাতৃহারা ছোট্ট শিশুর কান্না তার সুপ্ত মাতৃত্ববোধকে জাগিয়ে তোলে। এ পশ্চিম জীবন ছেড়ে জুলমতের সঙ্গে নতুন কোথাও ঘর বাঁধার প্রস্তাবে অবশেষে যমুনা সম্মত হয়।

বস্তুত, আলাউদ্দিন আল আজাদের ''প্রথম পর্বের গল্পে দেশকাল-শ্রেণী সচেতন মানসতার সুস্পষ্ট প্রকাশ লক্ষণীয় -এ পর্যায়ের গল্পে শ্রেণী চেতনায় সজাগ থেকে তিনি নির্মাণ করেছেন মানবতার অপরাজেয় গৌরব গাঁথা। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বের গল্পে মার্কসীয় শ্রেণীধারণা বিচ্যুত হয়ে তিনি জীবনের অন্তঃঅসঙ্গতি সন্ধানে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন ও যৌন ধারণায় আকৃষ্ট হলেন। জীবনদৃষ্টির এই পশ্চাৎগতি তাঁর তাঁর গল্পের শিল্পসিদ্ধিকেও করেছে ক্ষুণ্ন। মনোবিকলন ও মনোগ্রহের শিল্পরূপ হিসেবে তাঁর 'অন্ধ সিঁড়ি(১৯৫৮), 'উজান তরঙ্গে' (১৯৫৯) 'যখন সৈকত' (১৯১৭) জীবন জমিন(১৯৮৮) প্রভৃতি সঙ্কলন ভুক্ত গল্পগুলোর কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি।''[৯১] তাঁর ছোটগল্প সমকালীন সামাজিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতার চিরন্তন দলিল।

Dhaka University Institutional Repository


## ৩. শওকত ওসমান

বাংলা কথা-সাহিত্যের ইতিহাসে বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকগত নিরীক্ষার সবচেয়ে উৎসাহী লেখক শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮)। চল্লিশের দশকের লেখনী ধারণ করলেও তিনি খ্যাতি লাভ করেন বিভাগোত্তর বাংলায়। তার লেখা প্রথম উপন্যাস 'বনী আদম' এর পাণ্ডুলিপি অনাবিষ্কৃত থাকায় 'জননী' (১৯৫৮)- কেই প্রথম উপন্যাস হিসেবে মনে করা হত। ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ- এই তিন আমলের দ্রষ্টা শওকত ওসমান নিজের সাহিত্যিক মানস গঠনের ক্ষেত্রে যুগ পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর সাহিত্যে বিভাগোত্তর এদেশের আর্থ-সামাজিক জীবন প্রপাত, রাজনৈতিক স্রোতধারা, সংগ্রাম আর নানা সংক্ষুব্ধতার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। এ প্রসংঙ্গে সমালোচক শিরিণ আখতার বলেছেন "উপন্যাসকার হিসেবে তার খ্যাতি সমাধিক বিস্তৃত। গ্রামীণ সামাজিক পরিবেশের বাস্তব রূপকার শওকত ওসমান বিরল কৃতিত্বের দাবিদার। বিষয়বস্তু ও চরিত্রের ক্ষেত্রে বৈচিত্র সৃষ্টি ও তার উপন্যাসে আরো একটি লক্ষণীয় দিক।"[১২] তাঁর গল্পও উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক চেতনা, ধর্মীয় পরিপ্রেক্ষিত,অর্থনৈতিক অনুসঙ্গসহ বিভিন্ন দিক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাস ও গল্পে ফুটে উঠেছে বিভাগোত্তরকালের এদেশীয় সামাজিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতার চিত্র।

### ৩. ক. জননী

আর্থ-সামাজিক চেতনানিষ্ঠ শওকত ওসমনের প্রথম উপন্যাস 'জননী' (১৯৬১)। এ উপন্যাসের কিছুঅংশ 'শওগাত' পত্রিকায় ১৯৪৪-৪৫ সালে ছাপা হয়। তখন তার নাম ছিল 'জিন্দান'। ১৯৬১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় মুখবন্ধে এই উপন্যাস রচনা প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন ঃ "বৃটিশ আমলের পটভূমিকায় বিধৃত এই গ্রামকাহিনী অনেকের কাছে আজ রূপকাহিনী মনে হতে পারে। ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই রচনার সূত্রপাত। স্বাধীন স্বদেশে এর সমাপ্তি। কাহিনীর পটভূমি চল্লিশ বছর আগেকার।"[১৩]

শওকত ওসমানের 'জননী' উপন্যাসের পটভূমি পশ্চিম বঙ্গের একটি গ্রাম, গ্রান্ড-ট্রাংক রোড়ের ধারে মহেশডাঙ্গা গ্রাম, ঘটনার সময় ও কাল বিভাগ পূর্বকালের। এই প্রসংঙ্গে শিরিণ আখতার আরো বলেছেন, "দরিদ্র চাষী-বউ দরিয়া-বিবির সন্তান বুবুক্ষু হৃদয়ের অনবদ্য কাহিনী সমৃদ্ধ 'জননী' বাংলাদেশের উপন্যাসের ধারার একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন দরিয়া আজহারের জীবন কাহিনী পাশাপাশি এ উপন্যাসের পল্লী প্রতিবেশী মানব জীবনের নানা ভাঙ্গাগড়া, অর্থনৈতিক নিষ্পেষণ, অন্তর্দাহ নানা নিপীড়নের চিত্র অঙ্কিত

Dhaka University Institutional Repository


হয়েছে।"[৯৪] আবু ইসহাকের 'সূর্যদীঘল বাড়ি' উপন্যাসের জয়গুণ বিবির মতই 'জননী' উপন্যাসের দরিয়া বিবি সারা জীবন অশেষ দুঃখের সঙ্গে লড়াই করেছে। দরিয়া বিবি সকল অত্যাচার ও আঘাত সহ্য করে। বস্তুত, এ-উপন্যাস গ্রাম্য রসনীর নীরব সহনশীলতাও আত্মত্যাগের কাহিনী।

'জননী' উপন্যাসে লেখকের ঐতিহ্য সন্ধানী মানসের পরিচয় মেলে। এই ঐতিহ্য অন্বেষা রক্ষিত হয়েছে উপন্যাসের প্রধান পুরুষ চরিত্র আজহারের পূর্বপুরুষের ঐশ্বর্যময় বংশ পরিচয়-বর্ণনায়। আজাহার বাঙালী হলেও তার পূর্ব-পুরুষেরা বাঙালী ছিলেন না। লেখকের ভাষায়, "আজাহারের প্রপিতামহ আলী আজাহার খাঁ সওয়া'শ বছর আগে এই গ্রামে "অকস্মাৎ নাজেল হইয়াছিলেন। এই বংশের তিনিই আদি-পিতা। শান-শওকত দবদবা তার আমলেই ছিলো। তারপর খাঁ পরিবারের অধঃপতনের যুগ"[৯৫] আজহারের তেজোদীপ্ত পূর্ব-পুরুষেরা শুধু সম্পদশালী ছিলেন না, ব্রিটিশ-শাসিত ভারতে ওহাবী-ফরায়েজী আন্দোলনেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। মূল উপন্যাসের কাহিনী শুরু করার আগে আজহার খাঁর বংশ পরিচয় ও প্রেক্ষাপট অংকনের পেছনে লেখকের একটি উদ্দেশ্য কাজ করেছে। তা হলো, এককালে বহিরাগত বিজয়ী মুসলমানদের কেউ কেউ এদেশে ইংরেজ অধিকারের পর শাসন ও দাপটে বাধ্য হয়েই যে ক্রমে এখানকার জনজীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছে তা দেখানো। সেই সঙ্গে লেখক সম্ভবত এই দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন যে, "ব্রিটিশের দুঃশাসন গ্রাম বাংলার স্বচ্ছল শান্ত নিরুদ্বিগ্ন জীবনের ভিত শুধু নাড়িয়ে দেয়নি, মানুষের সম্পদশালী অতীতকেও খড়োঘরে নামিয়ে এনেছিল। এক সময় ইংরেজদের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে আত্মদানকারী শহীদ আলী আজহার খাঁর অধঃস্তন চতুর্থ পুরুষ আলি আজহার খাঁ ও তার সন্তানদের দু'বেলা আহার পর্যন্ত জোটে না, সেটি সেই ইতিহাসের ইঙ্গিত বহণ করে।"[৯৬]

'জননী' কাহিনী প্রধান নয়, চরিত্রপ্রধান উপন্যাস। তাই উপস্থাপন অপেক্ষা চরিত্রের বর্ণনা ও উপস্থিতি আখ্যানে জোরালোভাবে লক্ষ্য করা যায়। এই উপন্যাসে আজহার খাঁ সংসার জীবনে অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে হেরে যাওয়া ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত মানুষের প্রতিনিধি। শুধু তাই নয়, বিশের দশকের মুসলিম সমাজের গ্রামীণ জীবন বাস্তবতার জীবন কৃতি যেন সে। আজহার খাঁর পরিবারের নাম ডাক ছিল। পূর্ব-পুরুষের ঐতিহ্যময় একটা ইতিহাস ছিলো। কিন্তু তার বংশবর্ণকে এক সময় খর্ব করেছে অর্থনৈতিক টানাপোড়েন। আর এই টানাপোড়েনে আজহার খাঁ যন্ত্রণাক্লিষ্ট হয়েছে। অথচ তার যন্ত্রণা থেকে, অভাব-অনটনের পরিবেশ থেকে, উত্তরণের পথ খুঁজেছে সংসারে কৃষি ক্ষেত্রে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে, ব্যবসায় আত্ম-নিয়োগ করে, রাজমিস্ত্রির কাজ করার জন্য সংসার ছেড়ে শহরে আশ্রয় নিয়ে। কিন্তু সে যেন নিয়তি তাড়িত। কেননা, আজহার খাঁর প্রাণান্তকর পরিশ্রম সংসারের অভাব মেটাতে ব্যর্থ হয়েছে। আর এর কারণ তৎকালীন আর্থ-সামাজিক পটভূমি।

Dhaka University Institutional Repository


আজহার খাঁর চরিত্রের একটি বিশেষ দিক হলো সে পরিশ্রমী মানুষ। নিজের পেশীর আদিমতায় পরিশ্রম করলেও লাভের দায় ভাগে সে কোন দিনই ফায়দা লুটতে পারেনি। ক্ষেতে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেও যখন ছেলে মেয়েদের পেটপুরে খেতে দিতে পারেনি, তখন সে ব্যবসা করেছে-শহরে গিয়ে রাজমিস্ত্রির কাজ করেছে। কিন্তু কোন কিছুতেই সে সফলতা খুঁজে পায়নি। আর এ থেকেই তার মনে জন্ম নিয়েছে অভিমান। সাংসারিক দুঃখ কষ্ট মোচনের প্রচেষ্টা একে একে ব্যর্থ হলে স্ত্রী দরিয়া বিবির সঙ্গে তার মাঝে মাঝে বচসা হয়েছে। সাংসারিক দারিদ্র্য আর বংশের আভিজাত্য নিয়ে দরিয়া বিবিও আজহার খাঁকে টিপ্পনি কেটেছে। তাই স্বল্পতায় আজহার খাঁ নীরব প্রতিবাদের মধ্যে সুতা- কন্নিক হাতে বাড়ি থেকে উধাও হয়েছে বারবার।

তবে চাপা অভিমানের মধ্যেও আজহার খাঁর পৌরুষ মাঝে মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দরিয়া বিবি তার দারিদ্র্য নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করলেও সেটা আজহার খাঁর সহ্য সীমার মধ্যেই থাকতো। কিন্তু ইয়াকুবের অনুগ্রহ প্রদর্শনকে সে ভালভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। ইয়াকুবের আনাগোনা এবং তৎসঙ্গে আনীত উপঢৌকন-মোনাদির প্রতি দরিয়া বিবির আগ্রহ বরাবর আলী আজহার খাঁর পৌরুষে আঘাত হেনেছে। এ জন্য ইয়াকুবের দ্বারা বাড়িতে আয়োজিত পলান্ন কিংবা উন্নত খাবার আজহার খাঁ স্পর্শ করেনি। আজহার খাঁর ম্রিয়মান জীবন পদ্ধতি ও কর্মপটু দরিয়া বিবির চাপল্যের মাঝে বারবার আমরা একটা ফাঁক লক্ষ্য করি। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে সর্বদাই যে খিটিমিটি লেগে থাকতো তার ফলাফল আজহার খাঁ কিংবা তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের জন্য শুভপ্রদ হয়নি। এ প্রসঙ্গে অনীক মাহমুদ বলেছেন-"পারিবারিক অশান্তি র সঙ্গে অর্থনৈতিক বিপর্যয় আজহারকে নিরবিচ্ছন্ন শূন্যতার মাঝে ঠেলে দিয়েছে। তাই সে ঘরের সুখ বাইরে পেয়েছে আর সুতা-কন্নিক হাতে একটু ছুতো পেলেই ঘর-ছাড়া হয়েছে। সব দিক থেকে বিচার করে বলা যায়, 'জননী' উপন্যাসে এই চরিত্রটি গতানুগতিক জীবন বাস্তবতা থেকে অনেকটাই আলাদা বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক হয়ে প্রতিপন্ন হয়েছে।"[৯৭]

'জননী' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র দরিয়া বিবি। এই উপন্যাসের মর্মমূলেই উপন্যাসের লক্ষ্যবিন্দু আবর্তিত হয়েছে এবং এই চরিত্রের উত্থান-পতনের সঙ্গে পরিপূরক হিসেবে আন্যান্য চরিত্র বিকশিত হয়েছে। এ উপন্যাসের লেখক "দরিয়া বিবির চরিত্রের জননী হৃদয়কে শৈল্পিক দক্ষতার এমনই দোষে-গুণে চিহ্নিত করেছেন যা বাংলা সাহিত্যে এক উজ্জ্বল চরিত্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।"[৯৮]

শওকত ওসমান দরিয়া বিবির চরিত্রের মাধ্যমে বাঙালি মাতৃ হৃদয়ের জাজ্জ্বল্যমান প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। সে মাতৃত্বের দায়বোধের জন্য ইয়াকুবের সাহায্য নিতে বাধ্য হয়েছে। সে নষ্ট করেছে নারীর পবিত্রতা। ফলে পরিণতি তাকে নিয়ে যায় তার দ্বারপ্রান্তে। "হাজার দারিদ্র্যের মধ্যে সে নিজেকে অন্যের সাহায্যের হাত থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করে চলে, কিন্তু আজহার খাঁর মৃত্যুর পর, আজহারের দুঃসম্পর্কের

Dhaka University Institutional Repository


ফুফাত ভাই-এর লোভ থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে না এবং যার ঔরসের সন্তানকে জন্মদানের পর গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে।"[৯৯] বস্তুত, এ-উপন্যাসে যাবতীয় স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে সন্তানের জন্য মায়ের যথাসর্বস্ব ত্যাগের মধ্যে জননীত্বের যে মহিমা সন্নিবিষ্ট থাকে, শওকত ওসমান তারই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। লেখক জননী হৃদয়কে শৈল্পিক দক্ষতায় দোষে-গুণে দ্রবীভূত করে প্রকারান্তরে সমাজ ও বাস্তব জীবনের প্রতিচিত্রই প্রতিস্থাপন করতে বিশিষ্ট স্বাক্ষরতার পরিচয় দিয়েছেন। "উপন্যাসটিতে বিস্তৃত ক্যানভাস ব্যবহৃত হলেও অধিকাংশ রঙের ব্যবহার ঘটেছে দরিয়া বিবির চরিত্র অঙ্কনে। এই শিল্প সৃষ্টির দ্বন্দ্ব বৃহত্তর জীবনের অর্থাৎ সামন্ত সমাজের অন্তঃঅসঙ্গতিজাত দ্বান্দ্বিক অগ্রগামী চিত্ররূপ হতে গিয়েও 'জননী'র দরিয়া বিবি হয়েছে ট্র্যাজেডিতে পরিণত হয়েছে। মাতৃত্বের গৌরবই হচ্ছে সারকথা। দরিয়া বিবির চেতনায় জীবনসংগ্রাম মাতৃত্বে উৎসজাত।"[১০০] 'জননী' উপন্যাসের পুরুষ চরিত্র গুলোর মধ্যে নিঃসন্দেহে চন্দ্রকোটাল ব্যতিক্রমী চরিত্র। চন্দ্রকোটাল সময় ও সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে লালন করেছে। চন্দ্রকোটাল "ফুর্তিবাজ, দিলখোলা, চন্দ্রকোটাল তার উদার হৃদয়, অফুরন্ত প্রাণ সম্পদ ও আবেগ-উচ্ছ্বাসের স্নিগ্ধ মাধুর্যে সহজেই পাঠকের মন ভোলায় তার মুখের অনাবিল প্রাণঢালা হাসি, স্বতঃস্ফূর্ত গানের মুর্চ্ছনা, হিল্লোলিত শিষ্যধ্বনি, আর মনখোলা কথাবার্তা তাকে অপূর্ব প্রাণশক্তিতে ভরপুর করে তুলেছে। তার চরিত্রে কৌতুকময়তার সঙ্গে মিশে আছে রহস্যপ্রিয়তা, উদারতার সঙ্গে মিলেছে প্রীতিময়তা।"[১০১] বৈষয়িক ক্ষতি হলেও হৃদয়বান চন্দ্রকৌশল নির্দ্বিধায় কখনো ক্ষেতের তরমুজ, কখনো চিংড়ি মাছ, কখনো অকাতর শ্রম দিয়ে আজহার পরিবারের পাশে দাঁড়ায়।

জলাশয় নিয়ে দুই শ্রেণীর জমিদারের সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা ভুলে গিয়ে আজহারের বন্ধুত্বের সম্পর্কে অমর্যাদা করেছে কিন্তু শিবু ও ইসমাইলের মৃত্যুতে সে ধর্মীয় নীতিবোধে আরো প্ররোচিত না হয়ে পরিশুদ্ধ হয়েছে। মহেশডাঙ্গা গ্রামের অভাবগ্রস্ত পরিস্থিতি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তাকে প্রতিবাদী করেছে। ব্রিটিশ শাসকের ও জমিদার শ্রেণীর শোষণ নির্যাতনে গ্রাম-বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা যে নাজুক হয়ে পড়েছে তা চন্দ্রকোটাল উপলব্ধি করতে পেরেছিল। "খেয়ালী মানুষ। সংসার নিয়ে কষ্ট পায়। তাই মাঝে মাঝে ঐ সব ভাবে দুঃখ যাবে। কিন্তু দুঃখ কি সহজে যায় ? ব্রিটিশ রাজত্ব, আগে ব্রিটিশ যাক, রোহিনী হাকেম বক্স ঐ শালারা যাক, তবে না দুঃখ যাবে।"[১০২] চন্দ্রকোটাল মানব ধর্মের কাছেই নিজেকে সমর্পণ করেছে বলেই ধর্মীয় নীতিবোধকে বিসর্জন দিতে পেরেছে। দুই সন্তানসহ চন্দ্রমনিকে তার কাছে আশ্রয় দিয়ে তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিয়েছে। আর এই উপার্জনের জন্য কৃষিকাজ ছাড়া কখনো মাছ ধরেছে, কখনো বা ভাঁড় নাচের আসরে সঙ সেজেছে, তাড়ির ব্যবসা করেছে। দারিদ্র্য নিত্যসঙ্গী হলেও সব সময় সে প্রাণোচ্ছল, হাস্যমুখর, পথ চলতে শিষ দেয়, অকারণে হাসে, গান গায়, ঠাট্টা করতে পারে, তাড়ি খায়, কখন তার মুখে বিদ্রোহের আস্ফালন, কখনবা

Dhaka University Institutional Repository


বন্ধুত্ব-বাৎসল্যে সে উদাসীন। সে অন্যের দুঃখে যেমন বেদনাহত, তেমনই সামান্য প্ররোচণায় গভীর বন্ধুত্বেও ফাটল সৃষ্টি করেছে। কোটালের সারল্য ও দুরন্তপনার সঙ্গে তাকে আরো আবেগপ্রবণ ও স্নেহাতিশয্যপূর্ণ করেছে। চন্দ্রকোটালের এই অদ্ভুত মানসিকতা তার চরিত্রকে করেছে প্রাণবন্ত ও বৈচিত্র্যধর্মী।

চন্দ্রকোটাল শ্রেণীবিভক্ত সমাজের মূল হেতুটা বুঝতো। সমাজে নিরন্ন মানুষের সৃষ্টি অন্নপূর্ণরাই করে থাকে এই উপলব্ধি কোটালের ছিল। তাই সে মাঝে মাঝে অপ্রিয় সত্যকথা বলেছে। চন্দ্র ক্ষোভের সংগে তার ছোট ভাই ভাগ্নেদের প্রসঙ্গে আজহারকে বলেছে-"ছেলেগুলোকে লুটেপুটে খাবে, খেটেতো খেতে পাবে না। নিজেও ডাকাতের দলে ঢুকবো।.... এত মেহনত করে লাভ কী ? ধর্ম টর্ম ভগবান ওসব আমি মানিনে। খেটে খেতে না পাওয়ার চেয়ে চুরি করায় পাপ নেই।"[১০৩]

চন্দ্রকোটালের মধ্যে সহজ সরলতা অটুট থাকলেও সমাজের বিপর্যস্ত মূল্যবোধগুলো সম্পর্কে সে অত্যন্ত সচেতন। একদিকে বিত্তহীন মানুষের হাহাকার, অক্ষমতা অন্যদিকে বিত্তবানদের অহংকার এই শ্রেণী সংগ্রামের অর্থটুকু ধরতে পেরেছে। তাই সে ভাগ্যকে বিশ্বাস করেনি। তাই সে আজহার পুত্রের কচি মুখ দেখেও নৈরাশ্য পোষণ করেনি, কিন্তু নিজের জীবনোপলব্ধির ক্ষেত্র থেকেই কোটাল ভাগ্যের অসারতা সম্পর্কে আজহারকে বলেছে ঃ "ফের কপালের কথা তুলেছ। এই দেখ আমার সঙ্গে পাঠশালে সেই যে হরি চক্কোত্তির ছেলেটা ছিলো, একদম হাবা, কত কান মলে দিয়েছি, মানসঙ্ক পারত না, সেটা হাকিম হয়েছে। গাঁয়ে ত আর আসে না আর আমি পাঠশালের সেরা ছেলে মজাই তাড়ি আর নেশা, মাঠে মাথার ঘাম পায়ে।"[১০৪]

চন্দ্রকোটালের বাইরের রূপ যাই হোক, তার অন্তরের গভীরে জীবনের তিক্ত স্বাদ উপচে পড়ে। কোটালের জীবনে সে তিক্ততা জ্ঞাত হয়ে উঠেছে। অনীক মাহমুদের বক্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়-"এ চরিত্র চিত্রণে লেখকের কৃতিত্ব এই যে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণ প্রক্রিয়া লেখক তার মুখ দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন। বর্তমান পুঁজিবাদী শোষণের যুগে একদল মানুষ অর্থ-সম্পদে ধনের পাহাড় গড়েছে। যারা পরিশ্রম করে রক্ত ঘামের পড়তে সাজাচ্ছে ঐশর্যের বিজয় সৌধ, তারাই ভোগ বঞ্চিত হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকছে। অন্য একদল মালিক মহাজন সেজে সেগুলো ভোগ করছে। ধনীক শ্রেণীর মূল্যবোধের অবক্ষয় আর দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার চন্দকোটালকে ধর্ম ও ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাসী ও বিদ্রোহী করে তুলেছিল। অর্থনৈতিক বৈষম্যের বেড়াজালটা যে মানুষেরই তৈরী, চন্দ্রকোটালের কাছে সামাজিক বৈষম্যের রেখা তা স্পষ্ট ছিল।"[১০৫] চন্দ্রকোটাল জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে নিরাশ হয়ে বারে বারে বিপর্যস্ত অর্থনীতির ভাঙা মেরুতে অবস্থান করে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে সর্বদাই লুটোপুটি খেয়েও মুক্তি পায়নি।

বস্তুত, চন্দ্রকোটাল 'জননী' উপন্যাসে একটি ব্যতিক্রম চরিত্র। স্বভাবে চলায় বলায় এবং জীবনাচারণে কারও সাথে মিল নেই। 'জননী'র দুঃখপূর্ণ কাহিনীর মধ্যে সেই একমাত্র হাসি-আনন্দের ধারা সিঞ্চন করেছে। উপন্যাসে তার উপস্থিতি ও বিশেষত্ব সহনীয় ও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

'জননী' উপন্যাসে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ইয়াকুব। ইয়াকুব আজহারের ফুফাতো ভাই। গঞ্জে সে ব্যবসা-বাণিজ্য করে। বাড়িতে দুই স্ত্রী ও সন্তান রয়েছে তার। আরো একটি বিয়ের চেষ্টা সে করেছিল। কিন্তু প্রতিবেশী ও স্ত্রীর আত্মীয়রা বাধা দেওয়ায় তা হয়নি। আজহারের বাড়িতে এসে লোলুপ দৃষ্টিতে সে দরিয়ার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে চেষ্টা করে। কিন্তু দরিয়া বিবির কাছ থেকে সে কোন প্রশ্রয় পায়নি। আজহার প্রায়ই বিবাগী, দরিয়ার সংসারে অভাবের কালোছায়া। এমন অবস্থায় ইয়াকুব প্রায়ই আসে হাতে নিয়ে ক্ষুধার অন্ন ও টাকা। সে দরিয়া বিবিকে নানা ছল-চাতুরী করে বলে আনতে চায় এবং অবশেষে সে নানা ইঙ্গিতময় উপঢৌকন ও প্রাচুর্যে দরিয়া ও তার সন্তানদের যে বশীভূত করে। দরিয়াকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা তার সীমাহীন। তাই একদিন নির্জন দুপুরে নিদ্রারত দরিয়াকে সে ভোগ করে। অসহায় দরিয়া ইয়াকুবকে ঘৃণা করলে সহ্য করতে বাধ্য হয়। লেখকের ভাষায়-''ইয়াকুবের কৌশলের অন্ত ছিলো না। রক্তের স্বাদ পাওয়া শিকারী প্রাণীর মত সে এই বাড়িতে যাতায়াত করিতে লাগিল। অসতর্ক ও অসহায় মুহূর্তের সুযোগের সে কোন অসদ্ব্যবহার করিত না। সংগতি ভেলা ভাসাইয়া কিরূপ নদী পারাপার করিতে হয়, সে জানিত বৈ কি ?''[১০৬] কিন্তু মহেশডাঙ্গায় সে আর বেশীদিন থাকতে পারেনি। তার দুই স্ত্রী তাকে নিয়ে যাওয়ার পর দরিয়া বিবির নীরব প্রত্যাখান ও মহেশডাঙ্গা ত্যাগকালে দুই স্ত্রীর কলহের কারণে সে আর কোনদিন মহেশডাঙ্গায় আসতে সাহস করেনি।

'জননী' উপন্যাসে বাংলার বিশের দশকের সামাজিক জীবনের নানা চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। অভাব অনটনের জন্য দরিয়া বিবি ও আজহারের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। আমিরণ চাচির দেবর তাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করেছে। পেটের জন্য খলিলের মত শিশুকে কাজ করতে হয়েছে। কোটালকে ভাড় নাচের দল সাজাতে হয়েছে। দরিয়া বিবির পদস্খলন ঘটেছে, সেখানে ইয়াকুব, রোহিনী বাবুদের ঠাট-বাট, জাক-জমক অব্যাহত রয়েছে। সামাজিক এ হেন অসামঞ্জস্য ও ভেদবুদ্ধি লেখক চন্দ্রকোটালের জবানীতে স্পষ্ট করে তুলেছেন। আমিনুর রহমান সুলতানের মতে-''শওকত ওসমান গ্রামীণ সমাজ রূপান্তরের মধ্য দিয়ে 'জননী' উপন্যাসে স্থবির সময়ের সেই নির্মম সত্যকেই ধারণ করে দুর্লভ দায়িত্ব পালন করেছেন।''[১০৭]

বাংলাদেশের আধুনিক ও বাস্তববাদী উপন্যাসের ধারায় শওকত ওসমানের 'জননী' 'মানবতাবাদী চেতনা প্রবাহের ঔপন্যাসিক শিল্পরূপ'। এ-উপন্যাসে আর্থ-সামাজিক জীবন দৃষ্টি গভীর ও শৈল্পিক নৈপুণ্যে পরিব্যপ্ত হয়ে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository


# ৩. খ. বনী আদম

আর্থ-সামাজিক চেতনা নির্ভর শওকত ওসমানের দ্বিতীয় উপন্যাস 'বনী আদম'। এ উপন্যাসটি লেখকের প্রথম রচনা। ১৯৪৬ সালে আজাদ পত্রিকার ঈদ সংখ্যায় এটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। বইটি মুদ্রণের আগে লেখক লিখেছেন-"পয়তাল্লিশ বছর পূর্বে-প্রায় দুই প্রজন্মের কাল-এই উপন্যাসের কিয়দংশ বেরিয়েছিল অবিভক্ত বঙ্গে 'আজাদ' পত্রিকার ঈদ সংখ্যা। তারপর নানা কারণে 'বনী আদম' আর পুস্তকাকারে বের হয়নি। পাণ্ডুলিপি পাওয়াই দায় ছিল। সৌভাগ্য ক্রমে পাণ্ডুলিপি আবার হাতে আসায় বইটি শেষ করতে পারলাম।"[১০৮]

'বনী আদম' বৃহৎ বাংলার বিশেষ করে পশ্চিম বঙ্গের ত্রিশের পটভূমিতে রচিত। "গ্রাম ও শহরের পটভূমিতে নানান মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য তৎসঙ্গে ফাঁপা কিন্তু ভণ্ডের জীবন দর্পণ হচ্ছে শওকত ওসমানের 'বনী আদম'। ১৯২০ এর দশকের শেষ এবং ১৯২০ দশকের প্রথম দুটি বছর এই উপন্যাসের ঘটনা প্রবাহের সময়কাল।"[১০৯] 'বনী আদম' উপন্যাসে চরিত্র ও বিষয়ের যে পরিচয় ছিল, পরবর্তীকালে লেখক তা থেকে সরে এসেছেন অনেক খানি। এ উপন্যাসে শহরের যান্ত্রিকতার আহবানে গ্রাম ছেড়ে ছুটে আসা হারেসের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সেই সঙ্গে শহরের বস্তি জীবনের বাস্তব আলেখ্য উন্মোচন করেছেন ঔপন্যাসিক। উপন্যাসের শেষে নায়ক স্বদেশীদের দলে যোগ দিয়েছেন। এই বিভিন্ন ঘটনাপুঞ্জকেই সাবলীল ভাষায় বাস্তব সম্মত রূপদান করা হয়েছে 'বনী আদম' উপন্যাসে।

নতুন জীবনের সন্ধানে সে পোশাক-পরিচ্ছেদ কিনে কিছু উপঢৌকনসহ বন্ধু আরিফের বাড়ি সামগড়ে যায়। বন্ধুপত্নী মালেকা, ছেলে রসুল-এই তিন সদস্যের সংসারে ও হারেস লক্ষ্য করে অভাব দারিদ্র্য নির্মমভাবে তাদের বিপর্যস্ত করেছে। তবুও আত্মীয়তা ও মেহমানদারিতে আরিফ ও তার পরিজনরা অকৃত্রিম। হারেস সাধ্যমত আরিফের সাংসারিক দারিদ্র্য মোচনে সাহায্য করে। বন্ধুত্ব ও কুটুম্বিতায় আরিফ ও হারেস খুবই ঘনিষ্ঠ হয়। বন্ধুপত্নী মালেকার উদ্দ্যোগে পিতৃ-মাতৃহীন 'সোহাগ খাতুন' নামক এক যুবতীর সঙ্গে হারেসের বিয়ে হয়। আবারও রুটি-রুজির তাগিদে হারেস ফিরে আসে ধলা বিবির বস্তিতে। কামলা খাটা ছাড়াও কাগজের ঠোঙ্গা বিক্রির ব্যবসা করে। চেষ্টা চারিত্র্য করে সামগড়ে নায়েবের কাছ থেকে দুই বিঘা জমি সে পেয়েছিল।

কলকাতার সামগড়ে যাওয়ার পথে একবার প্রবল বন্যা হয়। ফসল ও জীবন হানি, মানুষের অশেষ দুর্গতি হারেস এসময় প্রত্যক্ষ করছিল। এসময় সোহাগ আর মালেকার গহনাপত্র-তামা-কাসার বাসন-কোসন মাটির দরে বিক্রি করে দেয়। হারেসের সংসারেও আসে নতুন মুখ। সে নবজাতকের নাম রাখে 'কিব্‌রিয়া'। এক পর্যায়ে কলকাতার বস্তি জীবন মিইয়ে আসে। কয়েক বছরের মধ্যে নানা পরিবর্তন ঘটে। বাড়িওয়ালা

Dhaka University Institutional Repository


মেহেরালি হাঁপানি আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। দস্তরি খেয়ে কাছেদ মিস্ত্রি অনেক পয়সার মানুষ হয়েছে। এখানকার বন্ধু আলিও নিষিদ্ধ পল্লীতে করিমের আস্তানায় আশ্রয় নিয়েছে। বন্ধু আলির খোঁজে পতিতালয়ে গিয়ে হারেস দেখেছিল দেহ-ব্যবসায় নিযুক্ত দুই বোনকে। দারিদ্র্যের ছোবলে ভাই বোনদের এনে এ পেশায় নাম লিখিয়েছিল।

এর পর শুরু হয় দেশব্যাপী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের জোয়ার। কলকাতার পথে-পার্কে বক্তৃতা। শোনা যায় বোমা, পুলিশ ও স্বদেশী সেবকদের সংঘর্ষের খবর। এর এক পর্যায়ে একদিন হারেস কলকাতা থেকে ফিরে জনশূন্য গ্রাম দেখে পুলিশী তল্লাসী ও তাণ্ডবের কথা বুঝতে পারে। নিজের স্ত্রী-পুত্র ও বন্ধু পরিবারের খোঁজে গ্রাম-গ্রামান্তর খুঁজতে গিয়ে একটি ধনচে বনের ভিতর সে সন্ত্রাসী স্বদেশী কর্মী শেখরদা, বিনোদ, পাঞ্জাবী মেয়ে দিলশাদ, পরিতোষ, বোমা তৈরীর কারিগর পাঞ্জাববাসী আশফাক প্রমুখের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী আস্তানায় পরিচিত হয়। পুলিশী তল্লাসীর সময় দিলশাদ ও আশফাক উভয়েই এক গ্রামে আক্রান্ত হয়। আশফাক কর্ডন ভেঙে পালাতে সক্ষম হয়। বিপ্লবীদের আস্তানায় ফিরে আসে দিলশাদ। নির্মমভাবে তার নারীত্বের অবমাননা করা হয়। অসহ্য যন্ত্রণায় সে উড়না দিয়ে আত্মহত্যা করে। এখানে আশফাক ও হারেস দু'জনে কবর খুঁড়ে দাফন সম্পন্ন করে ফেলে। মোনাজাতের সময় আশফাক কান্নায় ভেঙে পড়লে বিপ্লবী নেতা শেখরদা তাকে নিবৃত করে।

বনী আদম উপন্যাসের হারেস সমাজের নিম্নবিত্ত ও প্রান্তিক মানুষের প্রতিনিধি। সে বালক থেকে যুবকে পরিণত হয়েছে গ্রামের এক ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়িতে। হারেসের জন্ম এক তাঁতি পরিবারে। বাবা মারা যাবার পর মা সলিম মুন্সির বাড়িতে দাসীর কাজ নেয় এবং তার মৃত্যু-হলে হারেস ঐ বাড়িতে ভৃত্যের ভূমিকা পালন করে চলে। দেখতে দেখতে হারেস বড় হয়। কিন্তু মানসিক ভাবে খুব একটা বাড়েনি, সে কিছুটা হাবা টাইপের। এ-ধরণের লোকদের মালিক খুব পছন্দ করে। হারেসের জন্যে শুধু খাওয়া আর বছরে দুটো লুঙ্গি-গামছা বরাদ্দ। গুদাম ঘরে ছেড়া মাদুর ও কাঁথাই তাদের ঘুমানোর একমাত্র উপকরণ। অথচ এই যন্ত্র-মানব হারেস এক দিন সলিম মুন্সিকে বলে বসে, "পনের বছর আপনার গোলাম-তার কি কোন দাম নেই,বেতন নেই।"[১১০] তাই সে রাত্রে অন্ধকারে খাচায় বন্দী পাখিটি ছেড়ে দিয়ে নিজেও গায়েব হয়ে যায়, শেষ পর্যন্ত সে সামগড়ে এসে পাড়ার কাউকে পায়না, পুরো গাঁ খালি। পুলিশের অত্যাচারে সবাই পালিয়ে গেছে। হারেস এখন পরিবারের সদস্যদের খোঁজ করছে। তখন কখনো কখনো তার নিজের পুরাতন জীবনের কথা ভাবে। এই ভাবনার এক ফাঁকে পাঠক জানতে পারে যে হারেস শুধু সলিম মুন্সিকে বেতনের কথা বলেনি, হাত মুচড়েও ধরেছিল এবং একটা লাথিও মেরেছিল পেছনে... ফলে তাকে গ্রাম ছাড়তে হয় আত্মরক্ষার জন্য।

সামগড় থেকে বেশ দূরে নদীর ওপারে গঞ্জের বাঁধের ওপর লোকজন আশ্রয় নিয়েছিল। সেখানে হারেস স্ত্রী, সোহাগ ও তিন বছরের পুত্র কিবরিয়াকে পায়। সাথে বন্ধু আরিফ ও পরিবারকেও। দুই বন্ধু তর্ক

Dhaka University Institutional Repository


করে শহরে যাবে না গ্রামে। এক পর্যায়ে "পল্লীর জনবিরল পথে সে হাটে। শূন্য মন খাঁ খাঁ করে। আর একদিনের কথা মনে পড়ে, যেদিন সে সলিম মুনশীর বন্দীশালা ছেড়ে পথে নেমেছিল। সেদিন ছিল মুক্তির নিঃশ্বাস বাতাসে। আজ ভারাক্রান্ত আঁখি পল্লব পথের রেখা ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করে না। হারেস জানত, এই সব এলাকায় ঘন বসতি। কিন্তু এখন তার চিহ্ন গায়েব। পথিক দু'একজন সামনে পড়ে। কোন কথা জিজ্ঞেস করলে, দায়সারা জওয়াব মেলে তখন তার সভার কথা মনে পড়ে। সেখানে বৃদ্ধা অগ্নিবর্ষী শব্দে বর্ণনা দিচ্ছিল, বৃটিশের পুলিশ গ্রামে গ্রামে কী রকম জুলুম চালিয়েছে।"[১১১]

বস্তুত, এ উপন্যাসের "সবদিক দিয়ে বিচার করলে অশিক্ষিত হারেসকে মানবিক বলেই মনে হয়। সবচেয়ে বড় কথা সমকালীন গ্রামীণ সাধারণ মানুষের জীবন এবং শহুরে বস্তী জীবনের একটা সরল চিত্র এই চরিত্রের সংস্পর্শে থেকে প্রতিফলিত হয়েছে। সুতরাং উপন্যাসের আখ্যানে এবং সমাজ বীক্ষণে হারেস চরিত্রের গুরুত্ব অবধারিত।"[১১২]

'বনী আদমে' খান বাহাদুর এরফান চৌধুরীকে লেখক সামন্ত শাসনের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। "জমি আর কৃষকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে খান বাহাদুর এরফান চৌধুরীও একসময় মারাঠি বাইজি পুষতেন। নৃত্য সম্বলিত মদ্য পানের সময় সে বাইজি মারা যায়।"[১১৩] যে মুহূর্তে প্রজা সাধারণের দু'বেলা দু'মুঠো ভাত জুটছে না, সেই সময়ে তার খেয়াল হয়েছে বাড়িতে চিড়িয়াখানা নির্মাণের। স্বদেশী সন্ত্রাসবাদী কর্মী নবীনের মা জানে এই জমিদারদের জন্য তাদের জীবনে এই দারিদ্র্যের কষাঘাত নেমে এসেছে। সে প্রসঙ্গে নিশ্চিতভাবে হারেসকে বলেছে-"এই দেখনা বাবু, জমিদারদের জন্যই ত এই দশা। মাছ ধরব তারও জলকর দাও। পেটে ভাত আছে দু'মুঠো।"[১১৪] গান্ধিজীকে বৃদ্ধা গালিগালাজ করে। স্বদেশী আন্দোলন তাদের সাজে। গরীবের এতে কোন উপকার নেই। এ কথা এই বৃদ্ধা উপলব্ধি করেলেও সমস্ত ব্যবস্থা এভাবেই নিষ্পেষণ করেছেন আদম সন্তানদের।

'বনী আদম' উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে আলি স্বাতন্ত্র্যধর্মী। একদিকে তার চরিত্রে সহমর্মিতা, পর দুঃখকাতরত যেমন লক্ষ্য করা যায়, তেমনি জবেদা থেকে শুরু করে পতিতালয় পর্যন্ত নিয়ে গেছে। আবার হারেসের অসুখের সময় সাগু কিনে রান্না করে এনে খাইয়েছে। অন্যের দুঃখে সহজে অভিভূত না হওয়ার জন্য সে হারেসকে বলেছে ঃ "তোমার বহু আগে শহরে এসেছি। দেখে দেখে সব সয়ে যাবে। গণ্ডারের চামড়া না হলে রোজ মড়তে ইচ্ছা করবে।"[১১৫] হারেস ও আলীর মধ্যকার হাসি তামাশার মাঝে মাঝে হারেস মন খারাপ করেছে। কিন্তু আলিই তাকে সরল সদা ছেলে হিসেবে বুঝতে পেরেছিল। প্রথম পরিচয়ের পর কলাবিবির বস্তির বাসায় নিয়ে এসে আলী তার একমাত্র বালিশে ভাগাভাগি করে শোয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। অসুখের সময় ভূলবশত গুকুর ঘরামির ধুতি হারেস গায়ে জড়িয়েছিল। এটা নিয়ে ঘরামি উচ্চ বাচ্য করলে আবি তাকে থামিয়ে দিয়েছে। সে হারেসের দুঃখকাতর স্বভাব দেখে বলেছে ঃ

''তোমার চিন্তা ছাড়া কথা নেই। এই আমার দিকে তাকাও, আমি ভেবেছি একদিনও ছোট ভাইগুলোর পড়াশোনা হবে না নিশ্চিত। আমি আর কি করতে পারি।তার চেয়ে এখন থেকেই খুঁটে খেতে শিখুক। এক পয়সা দিই না বাড়িতে। চকচকে খিলনওয়ালা দালান দেখে প্রথমে আমিও তোমার মত করত কী মনে করতাম। আস্তে আস্তে সব বিলকুল ঠাণ্ডা, পাতা-চাপা কপাল দু'এক জনের হয়ত আছে। লক্ষ, লক্ষ লোকের কপাল তা হয় না। একদম জগদল পাথর।''[১১৬]

'বনী আদম' উপন্যাসে শওকত ওসমান সমাজের চাহিদা বঞ্চিত মানুষের অপরিসীম দুঃখ কষ্টের চিত্র নিপুণ তুলির আঁচড়ে অংকন করেছেন। তিনি এই উপন্যাসে জমিদারের বিলাস-বাসন ও ভোগ লিপ্সার চিত্র ছাড়া উচ্চ হারে খাজনা, ঘুষ দিয়ে নায়েবের কাছ থেকে জমি গ্রহণসহ সমাজের নানা অসঙ্গতি তুলে ধরেছেন।

## ৩. গ. ক্রীতদাসের হাসি

ষাটের দশকের স্বাধীকার, গণতন্ত্র এবং সর্বপ্রকার মানবিক অধিকার বঞ্চিত জনজীবনের সুপ্ত আকাঙ্খাসমূহ শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি' (১৯৬২) উপন্যাসের বিষয় ভাবনার কেন্দ্রে অবস্থিত। দূর ইতিহাসের একটি বিশেষ ঘটনা অবলম্বন করে ষাটের দশকের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে তীর্যক প্রতিবাদ হিসেবে উপন্যাসটির ঘটনাংশ নির্মিত হলেও প্রকৃতপক্ষে এ উপন্যাসে মানব আকাঙ্খার এক শাশ্বত সত্য উন্মোচিত হয়েছে। ক্ষমতা, আথ এবং শক্তিবলে যে মানুষের মুক্ত-স্বাধীন চিত্তলোক অধিকার করা যায় না 'হাসি মানুষের আত্মারই প্রতিধ্বনি'-এ সত্যই এ উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য হয়ে উঠেছে। মূলত এ উপন্যাসেই লেখক সামন্তবাদী সেই বাগদাদের সাথে ধনতন্ত্রী সমাজের কোন পার্থক্য খুঁজে পাননি। পাকিস্তানী শাসন আমলের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর অবরোধমুখীনতার প্রতিবাদে ক্রীতদাসের হাসি উপন্যাসে শ্রেণী সংগ্রামের চিরন্তন সংঘাত চিত্রটি বাস্তব অভিজ্ঞানে তুলে ধরেছেন।

শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসের ঘটনাংশ নির্মিত হয়েছে খলিফা হারুন-অর-রশীদ ও তার সমকালীন বাগদাদের পারিপার্শ্বিক চেতনার উপরে ভিত্তি করে। এ ঘটনার সঙ্গে ''পাকিস্তানী একনায়কতন্ত্র ও স্বৈর শাসন শৃঙ্খলিত বাংলাদেশের সমাজ জীবনের সমস্যা ও সংকটের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। এ কালের ব্যক্তি মানুষের পরাধীনতার সঙ্গে বাগদাদের নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর সমস্যার সামঞ্জস্য নির্দেশিত হয়েছে। ঔপন্যাসিকের জীবনার্থের মূলে রয়েছে মানুষের ব্যক্তিসত্তার স্বাধীনতার স্বীকৃতি। মানব সত্তার মহিমা করোজ্জ্বল ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীকার চেতনাকে শত নিপীড়নেও স্তব্ধ করা সম্ভব নয়। এভাবেই শওকত ওসমান 'ক্রীতদাসের হাসি' কে জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository


করেছেন।"[১১৭] এ উপন্যাসের লেখকের বাগদাদ নগরীর কাহিনী উপস্থাপনের পিছনে সমস্ত পাকিস্তানে স্বৈরশাসনের কার্যকর নিহিত। অত্যচারী খলিফার শাসনাধীন বাগদাদনগরী রূপকের আবহে সারা পাকিস্তানের সামরিক শাসনের ফলে যে অভিশপ্ত নগরীতে পরিণত হয়েছে তা লেখক সুকৌশলে উপস্থাপন করেছেন। "তৎকালীন পূর্ব-বাংলার জনগণের উপর চেপে বসেছিল যে সামরিক জান্তা, তার নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা ও অমানবিকতাকে তিনি 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসে শাসক খলিফা হারুণ চরিত্রে প্রতিফলন করেছেন এবং এভাবে তৎকালীন স্বৈরাচারী শাসক আয়ুব খানের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে ইঙ্গিতময় করে তুলেছেন। খলিফা যেমন অর্থের টোপ ও কোড়ার আঘাতের ভয় দেখিয়ে মানুষের মনুষত্বকে কিনে নিতে চেয়েছিলেন, তেমন করে সেকালের সামরিক জান্তা ও এক দিকে নানা রকম প্রলোভন দেখিয়ে অন্যদিকে নিষ্ঠুর নির্যাতনের আশ্রয় নিয়ে পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয় আশা আকাঙ্খাকে ধুলিসাৎ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।"[১১৮] বস্তুত, সামন্তবাদী সেই বাগদাদের সাথে আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজের এবং তার কৃতদাসের সাথে ধনতন্ত্রী সমাজের বাদী মানুষের কোন পার্থক্য তিনি খুঁজে পাননি। পাকিস্তানী শাসন আমলের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর অবরোধ স্বাধীনতার প্রতিবাদে 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসের গোলাম চরিত্রটির সৃষ্টি। সময় সতর্কতা তাকে বাগদাদের ভূমিতে নিয়ে গেলেও শ্রেণী সংগ্রামের চিরন্তন অভিজ্ঞানে উপন্যাসে সম্পৃক্ত থেকেছে।

'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসের মুখবন্ধী চরিত্র রউফন। কাহিনীর গভীরে অনুপ্রবেশের পূর্বদ্বার সংক্ষিপ্ত কাহিনী সূত্রে রউফনের পরিচয় মেলে। তার পিতা উকিল। আরবী কিতাবের অনুরাগী। রউফনের দাদু ফরিদ উদ্দিন নব্বই বছরের বৃদ্ধ। বর্মা যুদ্ধে তিনি লুসাই অঞ্চলে লড়াই করছেন। গৃহত্যাগ করে গিয়েছেন যুক্ত প্রদেশে। আরবী ফারসীতে সুপণ্ডিত মৌলানা অগণিত শিষ্য নিয়ে আত্মার সাধনায় বহির্জগতের আকর্ষণ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন থেকে আরব্য উপন্যাস 'আলিফ লায়লা ওয়া লায়লানে' গ্রন্থটি সংগ্রহ করলে লেখক নাটকীয়ভাবে তার অতিরিক্ত কাহিনী হিসেবে 'ক্রীতদাসের হাসি' গল্পটি সংযোজন করে উপন্যাসে দ্বিতীয় একটি অংশ লিপিবদ্ধ করেন। উপন্যাসের কাহিনীতে বাগদাদের খলিফা হারুণ-অর-রশীদের বেগম জুবায়দা তার বাদী মেহেরজানকে গোলাম তাতারীর সাথে প্রেম প্রণয়ে উদ্বুদ্ধ করেন। বিত্তহীন দরিদ্র তদুপরি পরিপূর্ণ দুই ক্রীতদাস-দাসী তাদের আত্মার স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রেখেছিল। তাই নিশীথ রাতে দাস-দাসীর মিলোৎসবে তাদের অকৃত্রিম স্বতঃস্ফুর্ত হাসি শুনে স্তম্ভিত হয়েছিলেন। প্রকাশ দিবালোকে বিশ্বাস সম্পদ এবং পতিপত্তির বিনিময়ে তিনি যে হাসি শুনতে চাইলে মেহেরজানকে হারিয়ে তাতারাকে হাসি শোনাতে অপারগ হয়। নিষ্ঠুর নির্যাতনের পরও খলিফা হারুণ তার দরবারে আমন্ত্রিত কবি আবু নওয়াজকে ক্রীতদাসের স্বতঃস্ফুর্ত সে হাসি শোনাতে পারেননি। জল্লাদ শশুরের নির্মম অত্যাচারে

Dhaka University Institutional Repository


অবশেষে তাতারীর মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে শাশ্বত জীবন বাণী উচ্চারণ করে যায় তাতারী 'দিরহাম দৌলত দিয়ে গোলাম বাঁদী কেনা গেলেও মানুষের হাসি শোনা যায় না'।

শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র খলিফা হারুন-অর-রশীদ। তার মধ্যে মানুষের মৌলিক গুণাবলী থাকলেও আছে খেয়ালীপনা, স্বেচ্ছাচার এবং দাম্ভিকতা। তথাকথিত আলেম আবদুল কুদ্দুসের মাধ্যমে ভূয়া ফতোয়া জারী করে তাতারী মেহেরজানের বিয়ে অস্বীকার করে মেহেরকে আপন বেগম করার ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছে বাদশাহ'র কপটচারিতা ও লাম্পট্য। খলিফা চরিত্রের এই রূপায়ণ ইতিহাসনিষ্ঠ নয় তবে তা প্রতীকী প্রয়োজন মিটিয়েছে। হারুণ চরিত্রের ঔদার্য্য, দয়া ও সহনশীলতা থাকলেও তার বিশ্বাস, লোকবল, অস্ত্রবল নীতির মাপকাঠি। তিনি মনে করেন রাজত্বের লোভের আগুনের কাছে হাবিয়া দোযখ সাক্ষীদানের রিলিফ মাত্র। শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাস দু'টো ঘটনার সন্নিবেশ ঘটেছে। "প্রথমটির উত্তর বাংলার একটি প্রেমের কথা। দ্বিতীয়টি আরব্য উপন্যাসীয় বাগদাদের কথা। প্রথমটিতে লেখক হয়ত প্রস্তাবতার আকারে পেশ করেছেন, কিন্তু আমার কাছে একে উপলক্ষ্য মনে হয়নি। বরং পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল, এর চরিত্রগুলিকে যেন গ্রন্থাকার বাক্সবন্দী করে রেখে দিয়ে-দ্বিতীয় ভাগের বাক্স খুলে আরেক সেট চরিত্র বার করে দিলেন জাদুকরের মতো। কৌতুহল রয়ে গেল আমাদের প্রথম ভাগের মানুষ গুলির জন্য।"[১১৯]

'ক্রীতদাসের হাসি'তে নায়ক তাতারী ছাড়াও হারুণ-অর-রশীদ, কবি নওয়াস, মেহেরজান বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ইতিহাস খ্যাত আব্বাসীয় বংশের খলিফা হারুনর রশীদ-এর চরিত্র একটু অন্য ভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। অনেক সমালোচক বলেছেন-"হারুণ-অর রশীদ চরিত্রে কোন নতুনত্বের স্বাদ নেই।"[১২০] কেউ তা খলিফা হারুণ-অর-রশীদকে বিকৃত অবয়বে হাজির করার জন্য ক্ষুব্ধ হয়েছেন "খলিফা হারুন-অর-রশীদ জালীমের প্রতীক আর তাতারী গোলাম মজলুমের প্রতীক। তা থেকে আধুনিক বুর্জোয়া প্রলেতারিয়া সমস্যা দাঁড় করান যেতে পারে। এই ত। এবং তা যদি হয় তবে পুরাতন ইতিহাস ঘাটার দরকার ছিল কি?"[১২১]

উপন্যাসের প্রথম থেকেই হারুণ-অর-রশীদ চরিত্রের নিঃসঙ্গতা ও গভীর শূন্যতাকে শওকত ওসমান অত্যন্ত পর্যায়ক্রমিকভাবে সুগভীর ব্যপ্তি দিয়েছেন। হাসির উৎস অনুসন্ধানের জন্য খলিফা অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত অপেক্ষা করে। বাগানে পায়চারীরত অবস্থায় নিজ মহলের কাছে "কোথাও সুখ ডগমগ হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশ থেকে বক্ষঝর্ণা উৎসারিত সংগীত লহরীর মতো হাসির অনুরণন শুনতে পেয়ে বিস্মিত, আকৃষ্ট ও উদ্বেলিত হয়ে ওঠেন।"[১২২] এক অদ্ভুত আজ্ঞাময় আকুলতা প্রকাশ পায় তাঁর কথায়। "কে এই সুখীজন ! আমার হিংসা হয় মসরুর। আমি বাগদাদ অধীশ্বর, সুখ ভিক্ষুক। সে ত আমার তুলনায় বাগদাদের ভিক্ষুক তবু সুখের অধীশ্বর। কে সে?"[১২৩] একদিন রাত্রে খলিফা হারু আকস্মিকভাবে লোকলস্করসহ গোলাম বস্তিতে হানা দিয়ে তাতারীর ঘরে মেহেরজানকে হাতে নাতে ধরে ফেলেন ও তাতারীকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন। তাতারী যে কোন শাস্তি মাথা পেতে

Dhaka University Institutional Repository


নিতে প্রস্তুত হয়। সকলকে বিস্মিত করে বাদশা হারুন দু'জন কেই ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তি দেন। তিনি তাতারীকে এই শর্তে বাগদাদ শহরের পশ্চিম বাগিচার মালিক করে দেন যে, বাদশাহের মন ভারাক্রান্ত হলেই গোলাম হাসি শুনিয়ে তাকে ভারমুক্ত করবে। আর বাঁদী মেহেরজানকে তিনি প্রাসাদে ফিরিয়ে আনেন। আপাত দৃষ্টিতে বাদশাহের এই পদক্ষেপ উদার বলে প্রতীয়মান হলেও পরে বুঝা যায় আপাত এই উদারতার আড়ালে রয়েছে এক স্বৈরাচারী বাদশাহের গোপন লিপ্সা এবং পরিভোগ প্রবৃত্তিরই খেয়ালি বহিঃপ্রকাশ। বস্তুত ভোগ করা আকাঙ্ক্ষা থেকেই ক্রীতদাসী অবস্থা থেকে মেহেরজানকে মুক্তি দিয়ে তাকে হেরেমে স্থান দেন বাদশা। নিজের ভোগাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্যেই তিনি তাতারীর কাছ থেকে মেহেরজানকে চিরতরে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন।

এদিকে অগাধ সম্পত্তির মালিক হয়ে বাদশাহের পশ্চিম বাগিচার অঢেল সুখের পরিবেশ থাকা সত্বেও মেহেরজানকে ছিনিয়ে নেওয়ার ফলে তাতারীর হাসি শুনতে আসেন। কিন্তু কবিদের কাছে গোলামের হাসি দেখাতে ব্যর্থ হয়ে খলিফা হারুন শেষ পর্যন্ত বাগদাদ শহরের উচ্চ মহলের অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত নর্তকী অমিত-যৌবনা বুসায়নাকে তাতারীর কাছে পাঠান দুঃখ ভারাক্রান্ত তাতারীর মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে। কিন্তু তাতারীর ব্যক্তিত্বের কাছে পরাজিত এবং নারীত্বের মর্যাদার আত্ম-জাগরিত বুসায়না আত্মহত্যা করলে বোধান্দ খলিফা তাতারীকে হাজিরা কয়েদখানায় পাঠিয়ে দেন। এরপর তার উপর চলে প্রচন্ড দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন। কিন্তু প্রতিবাদী, বিদ্রোহী তাতারীর হাসি এমনকি কথা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। নানা প্রলোভনেও কোন কাজ হয় না।

সকল চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর খলিফা এক দিন তার বর্তমান বেগম ও তাতারীর এক কালীন প্রেমিকা ও স্ত্রী মেহেরজানকে কৌশলে তাতারীর মুখোমুখি করে। বিভ্রান্ত মেহেরজান যখন তাতারীকে চিনতে পারে তখন তাতারীর যন্ত্রণা ও নীরবতার সমস্ত ব্যাপারটি তার সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং গভীর সমবেদনা নিয়ে উদভ্রান্তের মতো কোড়াঘাতের যন্ত্রণা লাঘব করতে তাকে স্পর্শ করতে এগিয়ে যায়। কিন্তু খলিফার নির্দেশে প্রহরীরা মেহেরজানকে জোর করে সরিয়ে নেয়। বাদশা হারুণের নিরন্তর কোড়ার আঘাত সইতে সইতে তাতারী ঘৃণা ও অবজ্ঞা ভরে যায়। দিরহাম দৌলত দিয়ে ক্রীতদাস, গোলাম বাঁদী কেনা যেতে পারে কিন্তু ক্রীতদাসের হাসি কেনা যায় না।

প্রকৃত প্রস্তাবে লেখক খলিফা হারুণের চরিত্রের মাধ্যমে তৎকালীন সামরিক জান্তার পরিচয়ই তুলে ধরেছেন। তাতারীর ব্যক্তিত্বের জাগরণের মধ্য দিয়ে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের জেগে ওঠার আহবান সুস্পষ্ট। "বাঁদী মেহেরজান স্বৈর-একনায়কতন্ত্র পীড়িত বাংলাদেশের এবং ক্রীতদাস তাতারীর হাসি স্বাধীনতার প্রতীক, সমগ্র উপন্যাসকে যে রূপকতত্ব উন্মোচিত হয়-তা হলো কোন জাতি কিংবা ব্যক্তির আত্ম-নিয়ন্ত্রণহীন জীবন মুক্তি এবং আনন্দের চেতনায় উদ্দীপিত হতে পারে না। স্বাধীনতা কখনো আরোপ করা যায় না-তা হয়ে ওঠে সত্য।"[১২৮] সমাজ সচেতন লেখক শওকত ওসমান এক অঙ্গীকারাবদ্ধ দায়িত্বশীল শিল্পী হিসেবে আইয়ুব খানের সামরিক তন্ত্রের রক্ষ চক্ষু এড়িয়ে সুকৌশলে তুলে ধরেছেন।

Dhaka University Institutional Repository



# ৩. ঘ. জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প

শওকত ওসমান উপন্যাসের মত ছোটগল্পেও প্রগতিশীল ধারার প্রতিনিধি। তাঁর ছোটগল্পে আর্থ-সামাজিক চিন্তার ব্যাপকতা পরিদৃষ্ট হয়। তাঁর অসংখ্য ছোটগল্পে এদেশের রাজনৈতিক উত্থান-পতন, বিবর্তনের বিচিত্র ধারাক্রম ফুটে উঠেছে। ক্ষুধা-দারিদ্র্য-অভাব-দুর্ভিক্ষ, শোষণ, বঞ্চনা, সামাজিক অবক্ষয়, নারী নিগ্রহ ও নারী নির্যাতন,পারিবারিক জীবনের-নান সুক্ষ্ম ঘটনাপুঞ্জ, শ্রেণী চেতনা ও শ্রেণী সংগ্রাম এবং ধনতান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতাবাদ আর্থ-সামাজিক চেতনা শিল্প সফলভাবে চিত্রিত হয়েছে তাঁর গল্পে। বিভিন্ন গল্পে উদার প্রাগ্রসর অসাম্প্রদায়িক মানস ধরা পড়েছে অতুজ্জ্বল প্রখরতায়। "সাধারণ মানুষের প্রতি আন্তরিক দরদ এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ভন্ডামীর ওপর দ্বিধাহীন কষাঘাত এর গল্পের অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট।"[১২৫]

শওকত ওসমানের গল্পে ক্ষুধা-দারিদ্র্য, অভাব দুর্ভিক্ষের চিত্র ফুটে উঠেছে। তাঁর গল্পে উপনিবেশিক আমলের দারিদ্র্য-পীড়িত মানুষের মৌলিক চাহিদার অভাব ছাড়াও নানা অনুসঙ্গ ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি জীবনকে নিয়ে কখনো কৌতুক-ব্যঙ্গের আবহে বাস্তব চিত্র অঙ্কন করেছেন।

শওকত ওসমানের বেশ কয়েকটি গল্প গ্রন্থের মধ্যে 'জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প' (১৯৫১) দ্বিতীয় গল্প গ্রন্থ। 'জুনু আপা', 'সাদা ইমারত', নতুন জন্ম', 'গেহু', দুই চোখ কানা'- এই পাঁচটি গল্প নিয়ে শওকত ওসমানের 'জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থটি সংকলিত।

'জুনু আপা ও অন্যান্য গল্পের' প্রথম গল্প 'জুনু আপা'। এ গল্পের জুনু চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক এক নারীর অন্ধকার জীবনের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রেম প্রত্যাখ্যাত হবার পর জুনু আপা ঘর বাঁধতে চেয়েছিল। কিন্তু এক বছরের মধ্যে তার সে স্বপ্নের ঘর ভেঙে যায়। পুরনো প্রেমিক জসিমও তাকে গ্রহণ করেনি। এখান থেকে শুরু হয় তার অন্ধকার জীবন।

শওকত ওসমনের এ গল্পের কথক সেলিমের বাড়িতেই থাকত জুনু আপা তার দুর সম্পর্কীয় খালাতো বোন হত সে। সেলিমের চাচাতো ভাই জসিমের সাথে তার সম্পর্ক হয়েছিল। কিন্তু চাচী ছেলেকে অন্য জায়গায় বিয়ে দিলে মোটা অংকের টাকা যৌতুক হিসেবে পাবে এ কারণে জসিমের সঙ্গে জুনুর বিয়েতে সায় দেয়নি। তার এ বাঁধা ও বিরোধিতার কারণে এক পর্যায়ে দু'জনকে সরে যেতে হয়েছে দু'দিকে। এদিকে জুনুর বিয়ে অন্য জায়গায় হলেও সে দুশ্চরিত্র স্বামীকে তালাক দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু সংসারের শুধু ভাইটি বাদে সবাই ঘৃণা করতে থাকে। জসিম আবার সম্পর্ক পাতানোর চেষ্টা করলে একদিন সে উধাও হয়ে যায়। তার পর দীর্ঘ সাত বছর জীবনের নানা চড়াই-উৎরাই পার হয়ে এক পৌঢ় লোক মালেক সাহেবের সঙ্গে এক জীর্ণ-পুরাতন দোতলা বাড়িতে সন্ধান পাওয়া যায়। তথাপিও জুনু এর মধ্যে জীবনের সুখনীড়

Dhaka University Institutional Repository


গড়তে চেষ্টা করেছে। নীরব, নিস্তব্ধ অথচ মনোরম সেই জায়গাটি তার কাছে একান্তই আপন। "চতুর্পাশে বাঁশবন ও নানা রকমের গাছ। মাঝে মাঝে সৌখিন ফুলের গাছ ও দেখা গেল। ঝুমকো লতার ফুল ফুটেছে একটা গাছে।"[১২৬] সেই দিন জুনুকে দেখে তার একান্ত ছোট ভাইটির কথা মনে হলো "তার হাসি আমার চোখ এড়ায়নি। হাসার সময় মনে হয় একজন অষ্টাদশী তরুণীর সামনে দাঁড়িয়ে আছি। নিটোল জুনু আপার স্বাস্থ্য।"[১২৭] এ গল্পে জুনুর অজ্ঞাত সাত বছরের বর্ণনা লেখক দেননি। তবে সে জীবনে যে কোন স্বাভাবিক বা আদর্শায়িত পথে চালিত হয়নি, তার ইঙ্গিত দিয়েছেন লেখক।

'জুনু আপা ও অন্যান্য' গ্রন্থের 'নতুন জন্ম' গল্পে শওকত ওসমান দুরন্ত-দুর্বিনীতা গোমতী নদীর সঙ্গে ফরাজ আলী ও তার ছেলে আক্কাস আলীর অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার চিত্র তুলে ধরেছেন। গোমতী নদীর তীরে ফরাজ আলী আর তার বালক পুত্র আক্কাস নৌকা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। ঢল নামলে বা বান আসলে তাদের ঘর ছেড়ে বাঁধে উঠে যেতে হয়-আক্কাস অনেক সময় বলে যে তাদের এখান থেকে চলে যাওয়া উচিৎ। কিন্তু ফরাজ আলী গোমতীর প্রেমে পড়েছে সে যেতে চায় না-ঝড়ের তাণ্ডব দেখে ফরাজ আলী বলে "হালী আইজ ক্ষেপছে'-তার এই ভালোবাসার টানে এখান থেকে যেতে পারে না। একদিন ঝড়ের রাতে বানও আসে, তারা ঘর ছেড়ে বাঁধে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এই সময় রাগে আক্কাস বলে-'আর- এখানে থাকুম না' যামু কই ? শহরে যামু। খাইবি কি ওহানে ? চুরি করমু, ডাকাইতি করমু, কাম করমু' বাবা অবাক ছেলের কথায়। ফরাজ আলীর ভিজে লুঙ্গি খুলে ফেলতে হয় এবং কাথায় নিজেকে ঢাকে। ঠাণ্ডায় হি হি করে কাঁপে আক্কাস। ফরাজ আলী সস্নেহে তাকে কাঁথার ভিতর মুড়ি দিতে দিতে অপরাধীর মত বলে, ' সরম না করম। আই তোঁয়ার পেলোনা বাজান' ?" [১২৮]

'সাদা ইমারত' গল্পে হাসিনা নাম্নী এক স্বামী পরিত্যক্তা নারীর মর্মন্তুদ চিত্র ফুটে উঠেছে। ব্যাধির কারণে স্বামী তাকে পরিত্যক্তা করলে বিত্তহীন বাবা কালুর বাড়ীতে তাকে আশ্রয় নিতে হয়। তার বাবা মাঝে মধ্যে লোকের বাড়িতে চুরি করত। একদিন হাসিনাকে তার বাবা কলা চুরি করতে সঙ্গে নিয়ে যায় কিন্তু মারাত্মক খেজুরের কাঁটা পায়ে বিদ্ধ হলে হাসিনা সাদা ইমারতের হাসপাতালে অবস্থান নেয়। পায়ের ব্যথা উপশম হলেও তার পায়ে বসন্ত রোগ দেখা দেয়। এ কারণে ডাক্তার তাকে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। বাড়িতেই বিনা চিকিৎসায় হাসিনার মৃত্যু হয়। একদিন শাক তুলতে মাঠে গিয়ে সাদা ইমারত দেখে সেখানে বাস করার স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু স্বামীর মতই এই সাদা ইমারত তাকে দুঃখের সময়ে পরিত্যাগ করেছে। হাসিনার সমাজ সংসার তাকে আশ্রয়চ্যুতই করেনি। বেঁচে থাকার শেষতম অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। লেখকের ভাষ্য ঃ "শ্বেত মর্মরের দৈত্যপুরী। কারা বিচরণ করে তার প্রাঙ্গণে ? তাল পাতা দাওয়া মাটির ঘরে যারা মাস, বর্ষ মন্বন্তর কাটায়। তাদের চোখে প্রাসাদের অঙ্গণ কেমন করিয়া

Dhaka University Institutional Repository


প্রতিভাত হয়"[১২৯] বস্তুত, শওকত ওসমান এ গল্পের মাধ্যমে সমাজের নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন চিত্রের প্রেক্ষণে এক নারীর আত্মরক্ষার অভিপ্রায় চিত্রিত করেছেন।

'জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থের 'গেহু' হিন্দিভাষী এক মজুর পরিবারের কাহিনী। মালগাড়ির বগীর ভেতরে ছিন্নমূল এই পরিবারটি সুন্দর সংসার পেতেছে। মানুষের জন্ম মৃত্যুর এক নিদারুণ উপলব্ধি সম্ভব হয় এ রকম পরিবার সমূহের মানবেতর জীবনাচরণের প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতায়। আর তার চিত্র ফুটে উঠেছে লেখকের বর্ণনায় ঃ "স্পষ্ট দেখা যায় বগীর অভ্যন্তর। একটা গেরস্থর সংসার রীতিমত। একটু জায়গা। তবু সান্নিধ্যের কি অপরূপ মহিমা। এক কোণে হাড়িকুড়ি, পায়খানার লোটা, রান্না অন্যান্য আসবাব, উঠোন চুলো, লাকড়ী, ন্যাকড়া, ফ্যান-গালা গামলা, কয়েকটি বাঁশের পাতলা চুপড়ী। অন্য কোণে কয়লা এবং এই জাতীয় ইতর স্তুপের বোঝা। একটা ছাগল বাঁধা রয়েছে দুই কোণের মাঝখানে। কয়লার উপর জমেছে ছাগলের লাদি।"[১৩০]

বাংলাদেশের শহরগুলোতে রেলগাড়ির পরিত্যক্ত বগীতে দিন মজুরদের পরিবার গড়ে তোলার এ রূপ দৃশ্য সব সময় চোখে পড়ে। শওকত ওসমানের বর্ণনায় তার তীক্ষ্ম দৃষ্টি শক্তির সঙ্গে মিলিত হয়েছে জীবনবোধের গভীরতা। সে জীবন অবশ্যই বাংলাদেশের খেটে খাওয়া অবহেলিত মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে। গেহু সেই উপেক্ষিত জীবনের গল্প, শিল্পীর জীবন বোধের ঔজ্জ্বল্যে ভাস্কর। বস্তুত, এ গল্পে ভারতের ইউপি রাজ্যের আজমগড় জেলা থেকে সাবের পাকিস্তানে আসা একটি ছিন্নমূল পরিবারের দুঃসহ জীবনের নানা ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সামান্য রুটির জন্য বৃদ্ধার কটুক্তি তার সন্তানের প্রতি 'তুমি কেমন মরদ যে গম আনতে পারো না।' এর জবাবে পুত্র বলল-"ঠিক কথা, মায়ি মরদামী উহা দেখানা চাহিয়ে, যো মেরা গেহু ছিন লিয়া যো হামকো ইস তরহ কা জানোয়ার বানায়া। উঁহি উঁহি।"[১৩১]

## ৩. ৬. সাবেক কাহিনী

শওকত ওসমানের তৃতীয় গল্পগ্রন্থ 'সাবেক কাহিনী' (১৯৫৩)। এ গল্প গ্রন্থের বেশ কয়েকটি গল্পে তিনি কৌতুকের স্পর্শ এনে একটি সামাজিক ভণ্ডামীর চিত্র উৎঘাটন করেছেন। সামাজিক অসঙ্গতি ব্যাভিচার আর নির্যাতনের বিষয়গুলোই মুখ্যত এ গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে।

এ গ্রন্থের প্রথম গল্প 'মোজেজা'য় লেখক কৌতুকের মাধ্যমে স্বার্থান্বেষী মানুষের লোক দেখানো ভক্তি প্রবণতাকে ব্যঙ্গ করেছেন। তিনি উদঘাটন করেছেন সামাজিক-মানুষের আসল চেহারা। এ গল্পে তিনি এক পীর কেবলার 'মোজেজা' বা অলৌকিক ক্ষমতার বুজরুকি তুলে ধরেছেন। উত্তম পুরুষের জবানীতে লেখক

Dhaka University Institutional Repository


গল্পের কাহিনী বিধৃত করেছেন। নির্বাচনে দাঁড়ানো এক ভোটার প্রার্থীর বেশী ভোট পাওয়ার আকাঙ্খায় স্মরণাপন্ন হয় সাহেবের কাছে। এ আশায় পীর সাহেবের এক ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। "সে একটি কারখানা, একদিকে তালপাতার ছাউনী দিয়ে রসুই ঘর প্রস্তুত করা হয়েছে। বড় বড় ডেগ , বাবুর্চিরা নিশ্চয় সেই অনুপাতেই এটি বড় ঘরে চাল, ডাল, কুমড়োর স্তুপ রেখেছে। কয়েকটি বিহার শরীফের খাসি দিখিলাম ঘুরিতেছে। অতিথিদের চয্যের শিকার কালই হয়ত জবাই হইবে ।"[১৩২]

'বকেয়া'গল্পে সামাজিক অসাম্যের চিত্র অঙ্কন করেছেন। এ গল্পে পাঁচু নামক এক দীনহীন চাষীর একমাত্র মেয়ে টুনি। তাকে ঘিরেই পাঁচু সব স্বপ্ন-আকাঙ্খা। এদিকে জমিদারের খাজনা বাকী হয়ে যাওয়ায় ভিটেটা নিতে চায় জমিদার। অপরদিকে টুনি বিনা চিকিৎসায় মৃতুবরণ করে। তখন পাঁচু তাকে কলার ভেলায় করে বাসিয়ে দেয় জমিদারের পুকুরে। পাঁচু তাঁর পুরোন ঋণ পরিশোধ করে নীরবে গ্রাম ছেড়ে চলে যায়।

'সাবেক কাহিনী' গ্রন্থের তৃতীয় গল্প 'ভাগাড়'। এ গল্পটি ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময়কার পটভূমিতে রচিত। কালোবাজারী করে পুকুর ধন সম্পত্তির মালিক হওয়া জমিদার মনসুর আলী ভোট পাওয়ার লোভে গরু জবাই করে গ্রামের সাধারণ লোকের মধ্যে বিলি করার ভণ্ডামীর চিত্র আঁকা হয়েছে এ গল্পে। মনসুর আলী গরু কিনে মাংস বিলি করে কিন্তু দেখা যায় পরদিনই সে সব মাংস পড়ে আছে ভাগাড়ে। তখন মনসুর আলীর না পালিয়ে আর কোন গত্যন্তর থাকে না। বস্তুত, শওকত ওসমান এ গল্পে হঠাৎ ধনিক শ্রেণীর প্রতিনিধিতে পরিণত হওয়া মনসুর আলীর উচ্চাকাংখার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন এ গল্পে।

সামাজিক বৈষম্যমূলক এ সব গল্পে লেখক সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষার বিষয়টি আভাসিত করার জন্য সমাজের নিচের তলার মানুষের পক্ষাবলম্বন করেছেন। দীর্ঘ সমাজ অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে লেখা গ্রামের নিম্ন শ্রেণীর মানুষের দুর্দশা ভরা জীবনের প্রতিচিত্র স্থাপন করেছেন লেখক। 'দেনা' গল্পের মধ্য দিয়ে লেখক এদেশে এক সময়ে কাবুলিওয়ালাদের দৌরাত্মের চিত্র অংকন করেছেন। এরা এতই নির্মম ছিলো যে ঋণের মূল্যের চেয়ে সুদের দিকেই ঝোক বেশী। এ গল্পে এক বিধবা তার নাতনির ফ্রক কেনার জন্য দু'টাকা ধার নিয়েছিলেন। মেয়েটি মারা যায়, কিন্তু কাবুলিওয়ালা সলিম আগা বিধবা নানির কাছ থেকে আদায় করে দ্রুত পালিয়ে যায়। 'বিবেক' গল্পে সিরাজ মেয়ে বিয়ে দিয়ে অসৎ জামাইয়ের পাল্লায় পড়ে সর্বশান্ত হয়। শেষে জীবন বাঁচানোর তাগিদে শহরে চাকরি নেয়। এক সময় অসুস্থ হয়ে পড়লে ঘরে ফেরার সময় নৌকার মধ্যে মারা যায়। যতক্ষণ জীবিত ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ কিছু বলেনি। কিন্তু মরার সঙ্গে সঙ্গে "মাঝিরা লাশ লইয়া যাইতে আপত্তি জানাইল। নানা জাতির যাত্রী নৌকায়... ।"[১৩৩] এবং তার পরিচিত লোকসহ লাশ চরে নামিয়ে দেয়। এ গল্পে মানুষের প্রতি মানুষের অবহেলার বিবেক হীনতার চিত্র ফুটে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository


## ৩. চ. প্রস্তর ফলক

শওকত ওসমানের 'প্রস্তর ফলকে'র অন্তর্ভুক্ত 'দুই মুসাফির' রূপকধর্মী গল্প। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে লেখক জীবনের নশ্বরতার সঙ্গে অধ্যাত্ম তত্ত্বের একটি সূত্র যোজনা করে তার চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। একজন লোক আর একজন লোকের পেছনে হাটছেন। পরে প্রথম পথিকের সঙ্গ কামনা করে দ্বিতীয় পথিক তার অন্তরঙ্গ হন। প্রথম পথিক দ্বিতীয় পথিকের অনুরোধে তাকে একটি গান শোনান। গানের সুরে মুগ্ধ হন দ্বিতীয় পথিক। এক জায়গায় এসে তিনি প্রথম পথিককে তার বাড়ি-ঘর, বিশাল বাগান দেখান। তখন সোলেমান মল্লিক নামক জনৈক ব্যক্তির সঙ্গে দ্বিতীয় পথিক তার নাম পরে জানা গেল সোবহান জোয়ার্দ্দার বলে। তার তত সব সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে তুমুল ঝগড়া শুরু হয়। দুজনেই সম্পত্তির দাবিদার। ঝগড়া শেষ পর্যন্ত উচ্চ বাক্য বিনিময়ের রূপে পরিগ্রহ করে। প্রথম পথিক তাদের তখন আর একটা গান শোনান। "মানুষের দেখরে ভাই দিব্যজ্ঞানে। পাবিরে অমূল্য নিধি, এই বর্তমানে। মলে পাবো বেহেস্তখানা, তা শুনে আর মন মানে না। লালন কয়, বাকীর লোভে নগদ পাওনা কে ছেড়েছে এই ভুবনে।"[১৩৪] তখনই চারিদিকে প্রচার হলো লালন ফকির ফিরে এসেছেন। হাজারে হাজারে জনতা গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে ছুটেছে। গেরুয়া বসন কবির কণ্ঠে গান শুনে তারা মুগ্ধ। এরপর নিরিবিলিতে লালন আর জোয়ার্দ্দারের এক সময় সব কিছু থাকলেও আজ আর তাকে কেউ চেনে না। কিন্তু লালন বলেন "একদিন তোমার কত কি, কত কে ছিল, আমার কিছুই ছিল না। আজ আবার সব আছে অথচ তোমার কিছুই নেই।"[১৩৫] শওকত ওসমান এ গল্পে সমাজ বাস্তবতায় একমাত্র অর্থ-বিত্তই যে সব কিছু নয় তার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। "ধন দৌলত বিত্ত সম্পত্তি মানুষকে অমরত্ব দিতে পারে না ; কেননা তা অবিনশ্বর নয়। অন্যদিকে মহামানব তার আধ্যাত্মিক সাধনায় যখন জীবনের উৎকর্ষ সাধন করেন, তখন সে জীবন অমরত্বের অধিকার অর্জন করে। লালন ফকির তাঁর গানের জগতে জীবনের সেই সাধনায় জয়ী হয়েছিল, ফলে মৃত্যুর পরেও তার অমরত্ব অক্ষুন্ন থাকে।"[১৩৬]

'উভসঙ্গী' গল্পে দুই বান্ধবীর জীবনের নানা টানা-পোড়েন লেখক অকৃত্রিম বিশ্বস্ততায় চিত্রিত করেছেন। এ গল্পে দুই বান্ধবীর মধ্যে একজন ধনীর স্ত্রী, অপর জন নিম্নবিত্ত ঘরের ঘরনি। অনেকদিন পরে দেখা হওয়ায় একজন আর একজনের জীবনের সুখ-দুঃখের গল্প করতে থাকে। এ সময় ধনীর স্ত্রী সোহেলী বলেই ফেলে তার স্বামী বাইরে কাজের নামে গিয়ে অন্য মেয়ে মানুষ নিয়ে ফুর্তি করে সময় কাটায়-আর অজুহাত দেখায় যে, বাইরে অফিসের কাজে ট্যুরে যাচ্ছে। আবার যাবার সময় স্ত্রীর দু'খানা শাড়িও নিয়ে যায়

Dhaka University Institutional Repository


এই বলে যে, এই শাড়ি দেখে সে স্ত্রীর কথা মনে করবে। বস্তুত, এ গল্পে উচ্চ শ্রেণীর মানুষের অন্তরসার শূন্য জীবনাচারের চিত্র লেখক নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন।

'বর্ণামৃত' গল্পে একজন চিত্রশিল্পী হাসিব চিত্রকর্মকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতো তার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। জীবন যাপনের তাগিদেই হাসিব শহর ছেড়ে মফস্বলের একটি গ্রামে এসেছিল। কয়েকবছর পর অপর বন্ধু মফস্বলে গিয়ে 'হাকিম গোলাম আরহাম মাজেন্দারান দেওবন্দী' সাইনবোর্ড দেখে সেখানে গিয়ে পাগড়ি পরিহিত শশ্রুমণ্ডিত হাসিবকে আবিষ্কার করে। পরদিন দুই বন্ধু বেড়াতে গিয়ে এক কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাবার সময় হাকিম হাসিব পাগড়ি দিয়ে মুখ ঢাকে। বেলায়েত এর কারণ জানতে চাইলে হাসিব নির্বিকার বলে-"আমি হাকিমী শিখিনি, হাকিমীর কিছুই জানিনে। কবরস্থানে যারা শুয়ে আছেন, তাদের অনেকে আমার রোগী। অনেকে তাড়াতাড়ি আগেই গেছে। অবশ্য আমাকে টাকা দিয়েছে সেই জন্য। আমার কি চক্ষু লজ্জা নেই ? চশমখোর হতে পারিনে। আমাকে মুখ ঢাকতে হয়"।[১৩৭] 'গন্তব্য' গল্পে কবি সাংবাদিক মাসুদ চৌধুরীর অভাবের তাড়নায় নিজের সখের অলংকার বন্ধক রাখায় কাহিনী বিধৃত হয়েছে। অভাব দারিদ্র্য যে কোন সুখ বা বিলাসিতার তোয়াক্কা করে না। এ টাই এ গল্পের মূল বক্তব্য হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। পাকিস্তান সৃষ্টির সাথে সাথে কিভাবে দৃশ্যপট পাল্টে যাওয়ায় হিন্দুদের সম্পত্তি পাকিস্তানে বেহাত হয়েছে। কবি সাংবাদিক মাবুদ চৌধুরী গহনা বিক্রির জন্য গৌরচন্দ্র পোদ্দার এর দোকানের খোঁজে ঠিকানায় গিয়ে দেখে দোকানের নম্বর ঠিক আছে কিন্তু সাইন বোর্ড আলাদা। গৌর পোদ্দারের জায়গায় শের আলী খান।

শওকত ওসমান তাঁর গল্পে সামাজিক অবক্ষয়, পঞ্চাশের মন্বন্তর,ক্ষুধা, দারিদ্র্য, শোষণ-বঞ্চনা ও শ্রেণী বিভক্ত সমাজে শ্রেণী সংঘাতের নানা পর্যায় অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে তার গল্পে রূপায়িত করেছেন। এগুলো মুক্তিকামী মানুষের প্রতিবাদ হিসেবে বিধৃত হয়েছে কখনো বা হয়েছে অনুপ্রেরণার আধার।

## তথ্য নির্দেশ ঃ

১। ডক্টর এস.এম. লুৎফর রহমান, 'বাঙলাদেশী কথা-সাহিত্যের তিন আমল' ; 'লালসালু' একটি সামন্তবাদী উপন্যাস, ধারণী সাহিত্য সংসদ, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ-২০০৫, পৃষ্ঠা-১২৬।

২। জীনাত ইমতিয়াজ আলী, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ঃ জীবন ধর্ম ও সাহিত্য কর্ম, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৯৯।

৩। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, মমতাজ উদ্‌দীন আহমেদ সম্পাদিত, আবু জাফর, 'লালসালু দেশ-কাল' মনন প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-২০০০, পৃষ্ঠা-১৫।

৪। সৈয়দ আকরম হোসেন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস ঃ প্রসঙ্গ ভয়, বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য

Dhaka University Institutional Repository


প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, ঢাকা পৃষ্ঠা-৪৯ ।

৫ । জীনাত ইমতিয়াজ আলী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৪৩ ।

৬ । সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ-১৯৮৬, পৃষ্ঠা-৭০ ।

৭ । দ্রষ্টব্য, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭১ ।

৮ । দ্রষ্টব্য, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৭ ।

৯ । দ্রষ্টব্য, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৮ ।

১০ । জীনাত ইমতিয়াজ আলী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১০০ ।

১১ । জীনাত ইমতিয়াজ আলী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ১০১ ।

১২ । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, লালসালু, পৃষ্ঠা- ৯ ।

১৩ । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, লালসালু, পৃষ্ঠা-৫ ।

১৪ । শিরীণ আখতার, বাংলাদেশের তিনজন ঔপন্যাসিক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা - ১৪১ ।

১৫ । সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত, চাঁদের অমাবস্যা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৪১ ।

১৬ । সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত, চাঁদের অমাবস্যা, পূর্বোক্ত ।

১৭ । সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত, চাঁদের অমাবস্যা, পৃষ্ঠা-৬৫ ।

১৮ । সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৬৬ ।

১৯ । আবদুল মান্নান সৈয়দ ; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, মুক্ত ধারা, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৮৪ ।

২০ । জীনাত ইমতিয়াজ আলী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১১৬ ।

২১ । সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত, চাঁদের অমাবস্যা, পৃষ্ঠা-৬৮ ।

২২ । সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত, চাঁদের অমাবস্যা, পৃষ্ঠা-৬৯ ।

২৩ । রফিকউল্লাহ্ খান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১১৭ ।

২৪ । আমিনুর রহমান সুলতান, বাংলাদেশের উপন্যাস নগর জীবন ও নাগরিক চেতনা, বাংলা একাডেমী , প্রথম প্রকাশ, পৃষ্ঠা ৭৫ ।

২৫ । জীনাত ইমতিয়াজ আলী, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জীবন দর্শন ও সাহিত্য কর্ম শিল্প তরু প্রকাশনী ঢাকা, পৃষ্ঠা-১১৬ ।

২৬ । জীনাত ইমতিয়াজ আলী ; পূর্বোক্ত - পৃষ্ঠা-১২২ ।

২৭ । রফিকউল্লাহ খান ; বাংলাদেশের উপন্যাস ঃ বিষয় ও শিল্পরূপ :পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২১৩ ।

২৮ । রফিক উল্লাহ খান ; পূর্বোক্ত; পৃষ্ঠা-২১২ ।

২৯ । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বচনাবলী -১, 'কাঁদো নদী কাঁদো', পৃষ্ঠা-১৯৯ ।

Dhaka University Institutional Repository


৩০ । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী-১, কাঁদো নদী কাঁদো, পৃষ্ঠা-২৩৩ ।

৩১ । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী -১, কাঁদো নদী কাঁদো ; পৃষ্ঠা-২৩৩ ।

৩২ । জীনাত ইমতিয়াজ আলী ; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ঃ জীবনদর্শন ও সাহিত্য কর্ম ; নবযুগ সংস্করণ-২০০১, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৩৬ ।

৩৩ । জীনাত ইমতিয়াজ আলী ; পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৮ ।

৩৪ । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী -১, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৬৫ ।

৩৫ । মুহম্মদ ইদ্রিস আলী, বাংলাদেশের উপন্যাসকে সাহিত্য মধ্যবিত্ত শ্রেণী, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা-১০৩ ।

৩৬ । মুহম্মদ ইদ্রিস আলী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৮২ ।

৩৭ । মুহম্মদ ইদ্রিস আলী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৮২ ।

৩৮ । বিশ্বজিৎ ঘোষ, বাংলা কথাসাহিত্য পাঠ, বাংলা একাডেমী, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ১৭৫ ।

৩৯ । আজহার ইসলাম, বাংলাদেশের ছোটগল্প ঃ বিষয় ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পরূপ, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ১১৯ ।

৪০ । আজহার ইসলাম , পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১২০ ।

৪১ । সৈয়দ আকরম হোসেন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্,১৯৮৮, পৃষ্ঠা-৭৫ ।

৪২ । আজাহার ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১২০ ।

৪৩ । সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনালী-২, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪ ।

৪৪ । সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনালী- ২, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮-৯ ।

৪৫ । নূর উল করিম খসরু, আধুনিকতা ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, ঐতিহ্য, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৫৩ ।

৪৬ । হায়াৎ মামুদ সম্পাদিত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র গল্পসমগ্র, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৬, পৃষ্ঠা- ৪ ।

৪৭ । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী-২, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮ ।

৪৮ । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী-২, পূর্বোক্ত, পরাজয়,পৃষ্ঠা-২০ ।

৪৯ । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী-২ পূর্বোক্ত, মৃত্যু যাত্রা, পৃষ্ঠা-৬৫ ।

৫০ । আবু জাফর, ওয়ালীউল্লাহ্র ছোটগল্প, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৭১ ।

৫১ । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী-২, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৭৫ ।

৫২ । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী-২, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৪১ ।

৫৩ । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী - ২ পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭৮ ।

৫৪ । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী-২, 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী', পৃষ্ঠা-৬৮ ।

৫৫ । নূর উল করিম খসরু, আধুনিকতা ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লুলাহ্, ঐতিহ্য, প্রথম প্রকাশ, ২০০২, পৃষ্ঠা-৭৩ ।

৫৬ । জীনাত ইমতিয়াজ আলী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭১ ।

Dhaka University Institutional Repository


৫৭। জীনাত ইমতিয়াজ আলী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭২।

৫৮। নুরউল করিম খসরু, পূর্বোক্ত,পৃষ্ঠা-৭৫।

৫৯। আবদুল মান্নান সৈয়দ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, পৃষ্ঠা-৫১- ৫২।

৬০। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্,পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭১।

৬১। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী-২, পৃষ্ঠা-৭৫।

৬২। মুহম্মদ রেজাউল হক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা উপন্যাস, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ-১৯৮৯, পৃষ্ঠা ২৫৯।

৬৩। মুহম্মদ রেজাউল হক, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৫৯।

৬৪। আলাউদ্দিন আল আজাদ, তেইশ নম্বর তৈলচিত্র, পঞ্চম প্রকাশ, ১৩৯০, মুক্তধারা , ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৬।

৬৫। আলাউদ্দিন আল আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১২।

৬৬। আমিনুর রহমান সুলতান, বাংলাদেশের উপন্যাস, নগরজীবন ও নাগরিক চেতনা, বাংলা একাডেমী প্রথম প্রকাশ-২০০৩, পৃষ্ঠা-১৯৫।

৬৭। আলাউদ্দিন আল আজাদ, কর্ণফুলী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৯৩।

৬৮। গিয়াস শামীম, বাংলাদেশের আঞ্চলিক উপন্যাস, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ২০০২, পৃষ্ঠা-২৬।

৬৯। আলাউদ্দিন আল আজাদ, কর্ণফুলী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৮।

৭০। আলাউদ্দিন আল আজাদ উপন্যাস সমগ্র, কর্ণফুলী, গতিধারা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০১, পৃষ্ঠা -১৪৩।

৭১। মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, আলাউদ্দিন আল আজাদ ও তাঁর উপন্যাস, জনকণ্ঠ সাময়িকী, ৫ মে, ২০০৩।

৭২। রফিকউল্লাহ খান, বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৭২।

৭৩। আলাউদ্দিন আল আজাদ, ক্ষুধা ও আশা, পৃষ্ঠা-৩৮,৩৯।

৭৪। ডক্টর রফিকউল্লাহ খান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২০১।

৭৫। আলাউদ্দিন আল আজাদ, ক্ষুধা ও আশা, পৃষ্ঠা-৬৯।

৭৬। আলাউদ্দিন আল আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৮১।

৭৭। সৈয়দ আকরাম হোসেন, বাংলাদেশের উপন্যাসঃ চেতনাপ্রবাহ ও শিল্প জিজ্ঞাসা প্রসঙ্গ, বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ-১৯৮৫, পৃষ্ঠা-১২-১৩।

৭৮। ফরিদা সুলতানা, বাংলাদেশের উপন্যাসে জীবনচেতনা, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৯- বা/এ, পৃষ্ঠা-১৪৪।

৭৯। আলাউদ্দিন আল আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৪১।

৮০। সৈয়দ সারোয়ার, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬১।

৮১। ডক্টর এস. এম. লুৎফর রহমান বাংলাদেশী কথা সাহিত্যের তিন আমল, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৪৪।

৮২। আলাউদ্দিন আল আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭৭।

Dhaka University Institutional Repository



৮৩। আলাউদ্দিন আল আজাদ, ধানকন্যা, পৃষ্ঠা-৭৮।

৮৪। আলাউদ্দিন আল আজাদ, ধানকন্যা, পৃষ্ঠা-১৫।

৮৫। আলাউদ্দিন আল আজাদ, ধানকন্যা, পৃষ্ঠা-১৬।

৮৬। আলাউদ্দিন আল আজাদ, ধানকন্যা, পৃষ্ঠা-১৫।

৮৭। আলাউদ্দিন আল আজাদ, ধানকন্যা, পৃষ্ঠা-৭৯।

৮৮। আলাউদ্দিন আল আজাদ, ধানকন্যা, পৃষ্ঠা-৯৫।

৮৯। আলাউদ্দিন আল আজাদ, ধানকন্যা, পৃষ্ঠা-১০০।

৯০। আলাউদ্দিন আল আজাদ, ধানকন্যা, পৃষ্ঠা-১০১।

৯১। বিশ্বজিৎ ঘোষ, বাংলা কথা সাহিত্য পাঠ, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ-২০০২, পৃষ্ঠা-১৮২।

৯২। শিরীণ আখতার, বাংলাদেশের তিনজন উপন্যাসিক, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৭।

৯২। শিরীণ আখতার, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৭।

৯৩। জননী, ঢাকা বুকস্, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬১, মুখ বন্ধ অংশ দ্রষ্টব্য।

৯৪। শিরীণ আখতার, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-৩০।

৯৫। শওকত ওসমান, জননী, পৃষ্ঠা-২।

৯৬। শিরীণ আখতার, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩১।

৯৭। অনীক মাহমুদ, বাংলা কথা-সাহিত্যে শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭৬।

৯৮। অনীক মাহমুদ,পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-৭৮।

৯৯। বুলবন ওসমান, কথাসাহিত্যে শওকত ওসমান, সময় প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ২০০৪, পৃষ্ঠা-১৭।

১০০। সৈয়দ আকরম হোসেন, প্রসঙ্গ ঃ বাংলা কথাসাহিত্য, মাওলা ব্রাদার্স, পৃষ্ঠা-১০১।

১০১। শিরীণ আখতার, পূর্বোক্ত,পৃষ্ঠা-৪।

১০২। শওকত ওসমান, জননী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৫৪।

১০৩। শওকত ওসমান, জননী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮৮।

১০৫। অনীক মাহমুদ, বাংলা কথা সাহিত্যে শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭৮।

১০৬। শওকত ওসমান, জননী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৮৯।

১০৭। আমিনুর রহমান সুলতান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫৪।

১০৮। শওকত ওসমান, বনী আদম, লেখকের কথা, পৃষ্ঠা-২।

১০৯। অনীক মাহমুদ, বাংলা কথাসাহিত্যে শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮১।

১১০। শওকত ওসমান, বনী আদম, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৮।

Dhaka University Institutional Repository



১১১। শওকত ওসমান, বনী আদম,পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১১০।

১১২। অনীক মাহমুদ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮৬।

১১৩। শওকত ওসমান, বনী আদম, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩১।

১১৪। শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬৩।

১১৫। শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪৩।

১১৬। শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪৫।

১১৭। রফিক উল্লাহ খান, বাংলাদেশের উপন্যাস ঃ বিষয় ও শিল্পরূপ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৩।

১১৮। শিরীণ আখতার, বাংলাদেশের তিন জন ঔপন্যাসিক, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫৫।

১১৯। রণেশ দাশ গুপ্ত শওকত ওসমানের ক্রীতদাসের হাসি, সংবাদ, ঢাকা, ৩রা জৈষ্ঠ্য ১৩৭১।

১২০। ইসমাইল মোহাম্মদ, ক্রীতদাসের হাসি, সমকাল, ঢাকা, ২য় সংখ্যা আশ্বিন, ১৩৬৯, পৃষ্ঠা-১৯৪।

১২১। মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী, কৃতদাসের হাসি, প্রসঙ্গ বিচিত্রা, মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-১৯৬৬, পৃষ্ঠা-৭০।

১২২। শিরীণ আক্তার, বাংলাদেশের তিনজন ঔপন্যাসিক, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৩।

১২৩। শওকত ওসমান, ক্রীতদাসের হাসি, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৯।

১২৪। রফিক উল্লাহ খান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২০৭।

১২৫। শান্তি রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ব পাকিস্তানের নতুন সাহিত্য, দীপায়ণ, কলকাতা, ১৩৬১, পৃষ্ঠা-২১৬।

১২৬। শওকত ওসমান, জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প, প্রথম প্রকাশ-১৩৫৮, পৃষ্ঠা-২৩।

১২৭। শওকত ওসমান, জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-২৩।

১২৮। শওকত ওসমান, নতুন জন্ম, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮৭।

১২৯। শওকত ওসমান, সাদা ইমারত, জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প, পৃষ্ঠা-৪১।

১৩০। শওকত ওসমান, জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প, গেহু, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৯০।

১৩১। শওকত ওসমান, জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭৭।

১৩২। শওকত ওসমান, সাবেক কাহিনী, মোজেজা, পৃষ্ঠা-৯।

১৩৩। শওকত ওসমান, সাবেক কাহিনী, পৃষ্ঠা-৭৯।

১৩৪। শওকত ওসমান, প্রস্তর ফলক, দুই মুসাফির, প্রথম প্রকাশ-১৯৬৪, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৭।

১৩৫। শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১০।

১৩৬। আজহার ইসলাম, বাংলাদেশের ছোটগল্প ঃ বিষয়-ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পরূপ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১১৩।

১৩৭। শওকত ওসমান, প্রস্তর ফলক, বর্ণামৃত, প্রথম প্রকাশ-১৯৬৪, পৃষ্ঠা-৬৬।

Dhaka University Institutional Repository


# পঞ্চম অধ্যায়

## বিভাগোত্তর বাংলা কথা-সাহিত্যে তিনজন লেখকের রচনায় সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার বাস্তব প্রতিফলন

Dhaka University Institutional Repository


# ১. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

'লালসালু' একটি সামন্তবাদী উপন্যাস'। বুর্জোয়া সমাজের আন্তর্জাতিক অসঙ্গতিবোধ ও স্বকাল-সংকটের প্রেরণায় যে পলায়নবাদী, নিঃসঙ্গ ও আত্ম-সন্ধানী শিল্প অভিজ্ঞানের জন্ম, তার নিগূঢ় উত্তরাধিকার বহ করেই গঠন হয়েছে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র শিল্পী মানস। তিনি এই অস্তিত্ব বিনাশক আর্থ-সামাজিক জীবনের রূপ ও স্বরূপ উন্মোচন করেছেন উপন্যাসের সূচনায় বলেছেন-"শস্যহীন জনবহুল এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের বেরিয়ে পড়বার ব্যাকুলতা ধোয়াটে আকাশকে পর্যন্ত কেন সদা সন্ত্রস্ত করে রাখে। ঘরে কিছু নেই। ভাগাভাগি, লুটোলুটি, আর স্থান বিশেষে খুনোখুনি করে সর্ব প্রচেষ্টার শেষ। দৃষ্টি বাইরের পানে, মস্ত নদীটির ওপারে, জেলার বাইরে-প্রদেশেরও, হয়তো বা আরো দূরে। যারা নলি বানিয়ে ভেসে পড়ে তাদের দৃষ্টি দিগন্তে আটকায় না। জ্বালাময়ী আশা, ঘরে হা-শূন্য মুখ থোবড়ানো নিরাশা বলে তাতে মাত্রাতিরিক্ত প্রখরতা। দূরে তাকিয়ে যাদের চোখে আশা জ্বলে তাদের আর তর সয়না, দিনমান ক্ষণের সবুর ফাঁসির সামিল। তাই তারা ছোটে, ছোটে।"[১]

এ-উপন্যাসে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ এমন একটি সমাজমূলের অসঙ্গতির চিত্র তুলে ধরেছেন যেখানে 'শষ্যের চেয়ে টুপি বেশী, ধর্মের আগাছা বেশী' সেই শস্যহীন এলাকায় মানুষেরা আধুনিক জীবন বাস্তবতা অস্বীকারের পরিবর্তে কর্মে ও বিশ্বাসে পশ্চাৎপদ, জীর্ণ ও নিশ্চল মধ্যযুগীয় অন্ধকারের মধ্যে বসবাস করে। তাই তারা বেরিয়ে পড়ে অর্থ উপার্জনের আশায়। সে-কথা ব'লতে গিয়ে লেখকের উক্তি "এরা তাই দেশ ত্যাগ করে। ত্যাগ করে সদলবলে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। নলি বানিয়ে জাহাজের খালাসী হয়ে ভেসে যায়, কারখানার শ্রমিক হয়, বাসাবাড়ির চাকর, দফতরীর এটকিনি, ছাপাখানার ম্যাশিনম্যান, টেনারীতে চামড়ার লোক। কেউ মসজিদে ইমাম হয়, কেউ মোয়াজ্জিন। ..... কেউ কেউ দূর দূরান্তে চলে যায়। হয়তো বাহে মুলুকে নয়তো মনিদের দেশে। দূর দূর গ্রাম যে গ্রামে পৌঁছুতে হলে কত চড়া-পড়া শুষ্ক নদী পেরোতে হয়। মোষের গাড়িতে খড়ের গাদায় ঘুমোতে হয় কত রাত। গারো পাহাড়ে দুর্গম অঞ্চলে কে কবে বাঁশের মসজিদ করেছিল-সেখানেও।"[২]

এর-ই প্রতিনিধি হিসেবে মহব্বতনগরে মজিদের আকস্মিক আবির্ভাব এবং সেই সাথে একটি জরাজীর্ণ কবরকে লালসালু দ্বারা সুসজ্জিত করে কামেল বুজুর্গ মোদাচ্ছের নামক এক পীরের মাজারবে কেন্দ্র করে আধ্যাত্মিক সংযোগ স্থাপনের পরিকল্পিত প্রয়াস এ বিষয়ে সমালোচক জনাব আবু জাফর লিখেছেন-"দূরাগত পশ্চিম পাকিস্তানী রাষ্ট্র নায়কদের পূর্বাঞ্চলীয় অংশে ধর্মকে সামনে রেখে সুপরিকল্পিত ভাবে যে শোষণ শাসন অব্যাহত ছিল তার সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়"[৩]

Dhaka University Institutional Repository


মহব্বতনগরের মানুষের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত মজিদ এখানে ধর্মীয় আচার আচরণের মাধ্যমে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও মাজার-পূজারী মুসলমানদের ভয় ও বিস্ময় সৃষ্টি করে শোষণের সু-নিপুণ ধারাটি বজায় রেখেছিল। সচেতন ভাবেই সে মহব্বতনগরের সাধারণ মানুষের মনেরভীতি সঞ্চয়ের জন্য কবরটিকে এতকাল অবহেলা করার কারণে প্রচণ্ড গালাগালির মধ্য দিয়ে সে গ্রামবাসীকে বিধর্মী ও দোষী সাব্যস্ত করে। ফলে জাগতিক কর্মযজ্ঞে ব্যস্ত ও তার গলাবাজিতে বিভ্রান্ত গ্রামবাসী তা মেনে নেয়। এমন কি তারা বিব্রত ও লজ্জাবোধ করে। তথাপি তারা মজিদের আকস্মিক এই গ্রামে আগমনের কারণ বা পরিচিতি নিয়ে প্রশ্ন করে না ; ভাঙা কবরের অতীত ইতিহাস আবিস্কারেও সন্ধানী হয় না। পুরুষ-পরম্পরায় তারা যে সংস্কার রক্তের ধারায় বহন করে চলে, তার মূলানুসন্ধানেও আগ্রহী হয় না। তাই তার পক্ষে আবাল্য নিবাস ছেড়ে মহব্বতনগরের অপরিচিত প্রতিবেশ আত্ম প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। এর মাঝেও আত্মপ্রতিষ্ঠার দূর্বার সংগ্রামে নিরত মজিদ কখনো কখনো ভেঙে পড়ে এমনকি মনের গহীনের গ্লানিবোধ থেকে মুক্তির অন্বেষায় দুবল মুহূর্তে সে ক্ষমা প্রার্থনা করে। লেখকের ভাষায় "খোদার বান্দা সে, নিবোর্ধ ও জীবনের জন্য অন্ধ। তার ভুলভ্রান্তি তিনি মাফ করে দেবেন।"[৪]

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ'র 'লালসালু' উপন্যাসে মহব্বতনগরের গ্রামীণ সমাজ সামান্তবাদী সমাজের বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। এখানে সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজ-সম্পর্কের চিহ্ন দেখা যায় না। গ্রামীণ জীবনের সামাজিক স্তর উপস্থিত। এর একদিকে রয়েছে ভূমি-সম্পদ ও ক্ষমতার অধিকারী কর্তৃত্ববান শ্রেণী। এই কর্তৃত্ববান শ্রেণী আবার দু'টি ভাগে বিভক্ত। একদিকে রয়েছে ভূমির মালিক জোতদার খালেক ব্যাপারী, অন্যদিকে রয়েছে আধ্যাত্মিক ক্ষমতার ধারক-বাহক নামধারী মজিদ। এদের একজনের আছে জমি, সম্পদ : অন্য জনের আছে মাজার। এই বৈশিষ্ট্য শাসক-সমাজের বৈশিষ্ট্য। লক্ষণীয় মহব্বতনগরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার দণ্ড-মুণ্ডের একমাত্র কর্তা। জোত জমির অধিকারী হওয়া সত্বেও খালেক ব্যাপারী যে গ্রামের দশজনের মধ্যেই মজিদকে মেনে নিয়েছিল, তার কারণ, দুর্জ্ঞেয় রহস্যে ভরা মাজার কেন্দ্রিক অলৌকিক যে ক্ষমতার কথা মজিদ জাহির করেছিল সে রকম ক্ষমতা খালেক ব্যাপারীর ছিল না, তাছাড়া তাকে বৈরী ভাবাপন্ন না করে, মজিদ নিজের প্রতিষ্ঠা অর্জনের পর তাকে নিজের কর্তৃত্বের বলয়ে আনার জন্য যে সব কৌশল একে একে অবলম্বন করেছিল তা বোঝার ক্ষমতা খালেক ব্যাপারীর ছিল না।

জমিলার আবির্ভাব উপন্যাসের মধ্যপর্বে। দ্বিতীয় বিয়ের আগে মজিদ একদিন খালেক ব্যাপারীকে বলেছিলো "ঘরে এমন একটি বউ আনবে যে খোদাকে ভয় করবে।"[৫] জমিলাকে বিয়ে করার পর মজিদের সে ধারণাই বর্তমান ছিল। তার মনে হয়েছিল মেয়েটি বিড়াল ছানার মত সবকিছুতেই ভয় করে। স্বামীগৃহে এসেই রহীমাকে তার কাছে শ্বাশুড়ী এবং মজিদকে দুলার বাপ মনে হয়। কিন্তু যখন সেটা তার কাছে মিথ্যা প্রমাণিত হয় তখনই সে স্বাধীন আকাশে শ্বাস গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ফলে তার সর্বভয় এমনকি

Dhaka University Institutional Repository


পরিশ্রম শূন্য আচরণ মজিদের অন্তর্লোকে এমন এক ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছে যা কোন বৃহৎ পর্বতের ফাটলের চেয়েও ভয়াবহ। জমিলা বহুবিবাহ প্রথার শিকার হয়েও সমাজের নিষ্ঠুর নিয়মের প্রতি নিষ্ঠাবান। নিজের অবস্থার জন্য বেদনাহত,অন্তর্যন্ত্রণায় আস্থির হয়েই জমিলা সব কিছুর বিরুদ্ধেই হয়েছে প্রতিবাদী, পরাভূত করেছে মজিদকে, ব্যঙ্গ করেছে মজিদ-খালেক ব্যাপারীর সমাজকে।

কিশোরী চঞ্চল মন মজিদের বদ্ধ প্রাচীরঘেরা সংসারে নিজের অসীম মনের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করে নিস্পন্দন হয়ে পড়ে। মজিদের মন হিংস্র হয়ে ওঠে। জমিলা নামাজ পড়েনি বলে মজিদ ক্ষিপ্ত বাঘের মত আচরণেও দ্বিধাবোধ করে না। জিকিরের সময় মজিদ অজ্ঞান হওয়ার পর জমিলা সবার অজান্তে বাইরে চলে যায়। বাড়ির পর্দা অমান্য করে তার স্ত্রী বিনা অনুমতিতে জনসম্মুখে যেতে পারে, এ-ঘটনা মজিদের কাছে অকল্পনীয়। তাই সে জমিলার প্রতি আরো ক্রোধান্বিত হয়ে পড়ে। তাড়াতাড়ি নামাজ পড়ার সময় জায়নামাজে ঘুমিয়ে পড়ায় আপন শাসন ব্যর্থতার ক্রোধে এবং স্ত্রীর সান্নিধ্য লাভের অক্ষমতায় মজিদ ক্রোধান্ধ হয়ে পড়ে। তাই সে জমিলাকে জোর করে মাজারের ঘরে নিয়ে গিয়ে খুঁটির সাথে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে ব্যর্থতার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য। এ সময় জমিলা মজিদের মুখে থুথু ছিটিয়ে গ্রামের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে অপমান ক'রে প্রতিবাদ করে। প্রকৃতির তাণ্ডবলীলায় জমিলা মেঝেতে পড়ে যায়। তার পা স্পর্শ করে মজিদের সর্বশক্তির মূল উৎস মাজারকে। এ প্রসঙ্গে ডক্টর শিরীণ আখতারের বক্তব্য স্মরণীয়- "উপন্যাসে জমিলাকে শাস্তি দানের জন্য তার আট-ঘাট বাঁধা উদ্যোগে তার ক্রুর কুটিল জিঘাংসা এবং তার ব্যর্থতা, উৎকণ্ঠা ও অজ্ঞাত ভীতির শিহরণে কণ্টকিত পরিবেশের পটভূমিতে তার চরিত্র অত্যন্ত বাস্তব হয়ে ফুটে উঠেছে।"[৬]

জমিলার প্রতি মজিদের নিষ্ঠুরতা নির্মম। মজিদ ভেবেছিল ভয় পেয়ে জমিলা সাহায্যের আশায় চিৎকার করে উঠবে। কিন্তু জমিলা সাহায্যের প্রার্থনা করেনি। সে মজিদের দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় প্রতিষ্ঠিত অবস্থাকে নিস্তব্ধ পদাঘাত করেছে। সে ধর্মীয় কুসংস্কার ও অন্ধ-বিশ্বাসের অচলায়তনের মধ্যে রহীমার মতো নীরবে বরণ করে নেয়নি। বরং নিজের নীরবতায় প্রচণ্ড শক্তিতে মজিদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মজিদকে থমকে দিয়েছে। ফলে, মজিদ-জমিলার স্বচ্ছন্দ হাসি বন্ধ করে বলে আমার সকল জবরদস্তি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। মূলতঃ 'লালসালু' উপন্যাসে জমিলা পুরুষ ও মোল্লা শাসিত সমাজে নারীর অধিকারহীনতার এক বেদনাবহ স্বাক্ষী। মজিদের বেদীমূলে ধুলিসাৎ হয়েছে তার জীবনের সকল স্বপ্ন, সকল প্রত্যাশা, তার জীবনের প্রচণ্ড ব্যর্থতার কাছে তাই মজিদের সকল উপদেশ ব্যর্থ হয়েছে, ধর্মীয় প্রভাব হয়েছে অকেজো। মাজার হয়েছে অশ্রদ্ধেয় এবং ধর্মীয় অনুশাসন হয়েছে নিরর্থক।"[৭]

Dhaka University Institutional Repository


বস্তুত, ধর্মের বেড়াজালে আটকিয়ে কিছু ভণ্ড ধর্মীয় নেতা কিভাবে অলৌকিক বিশ্বাসে প্রমত্ত হয়ে মানুষের সারল্য ও অজ্ঞতাকে সম্বল করে নিজেদের প্রয়োজনের জন্য সবকিছু করে। আসলে উপন্যাসের মূল কেন্দ্রিকতা মজিদের অস্তিত্ব সংগ্রাম, তার সফলতা ও ব্যর্থতা। এ প্রসঙ্গে জনাব নুরুল করিম খসরুর বক্তব্য-"লালসালু' একটি ভাব-চেতনায় কেন্দ্র প্রত্যাশী রচনা। ফলে কাহিনী একটি সরল রোমান্টিকতায় পরিচালিত না হয়ে অধিকতর খণ্ডিত ও ঐক্য সন্ধানী।"[৮] এ- উপন্যাসের খণ্ড কাহিনী উপন্যাসের অপরিহার্যতা ও অর্থময়তা নির্ণয় করেছে। এ-উপন্যাস সম্পর্কে ডক্টর এস.এম. লুৎফর রহমানের বক্তব্য স্মরণীয় "এ-উপন্যাসে সমাজ সচেতনতা কৃত্রিম, কাহিনীগত পাত্র-পাত্রীও অধিকাংশ অসুস্থ, অস্বাভাবিক। মজিদ নিজে ঘর ছাড়া, ছন্নছাড়া, রহীমা বন্ধ্যা ; হাসুনীর মা চরিত্রহীনা, হাসুনী বিধবা, আমেনা বিবি বন্ধ্যা, জমিলা নাবালিকা - মোটের উপর অধিকাংশ চরিত্রই জীবনের স্বাভাবিক গতিপথ বিচ্যুত। জীবন প্রবাহে তারা অস্বাভাবিক। তাই 'লালসালু'তে ঔপন্যাসিকের পূর্বালোচিত সামাজিক ঐতিহাসিকের দায়িত্ব পালনের নজীর নেই।"[৯]

'লালসালু' উপন্যাসে বদ্ধ-সমাজের শোষণ ও অত্যাচারের পটভূমিতে ব্যক্তির জীবন-জিজ্ঞাসার চিত্র রূপায়িত হয়েছে। এ-উপন্যাসটি শুধু সমাজের প্রতারণা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মাত্র নয়, এ উপন্যাসে ব্যক্তির নিরন্তর আত্ম-অন্বেষণ ভাষা পেয়েছে। এ-কারণে ঘটনা-নির্ভর-বিবরণ, প্রধান কাহিনীর স্রোতে উপন্যাসটি ব্যতিক্রম। "খাঁটি বা অখাঁটি ধর্ম-বিশ্বাস আর কাব্যময় পরিমণ্ডল, ঝড়ো হাওয়ার রাত আর শিলাবৃষ্টি, প্রচ্ছন্ন প্রভাতের নীল আকাশ আর জৈষ্ঠ্যের রৌদ্রতপ্ত দ্বি-প্রহর, ঘৃণা আর ভালোবাসা, নিসর্গ আর মানব মন, প্রখর বাস্তববোধ আর বাস্তব অস্বীকার আত্ম-প্রত্যয়ের নব সমন্বয়ে 'লালসালু'র বাতাবরণ রচিত। এই বাতাবরণে ব্যক্তির অন্বেষণ, তার নিঃসঙ্গতা, তার রূপায়িত।"[১০]

'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসটির সংক্ষিপ্ত কাহিনী হ'ল -কোপন নদীর তীরবর্তী চাঁদপরা গ্রামের জনৈক যুবক শিক্ষক আরেফ আলী শীতের এক জ্যোৎস্নালোকিত রাতে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিল প্রাকৃতিক প্রয়োজনে। প্রয়োজন মিটিয়ে ঘরে ফিরে না গিয়ে চন্দ্রালোকিত রজনীর রূপরাশিতে মোহাবিষ্ট হয়। হঠাৎ ছায়া-শরীরের আকর্ষণে সে-গ্রাম পথে বেরিয়ে পড়ে। বাঁশঝাড়ে নিহত এক নারীর মৃতদেহ আরেফ আলীর মনোলোকে আলোড়ন তোলে। প্রকৃত ব্যাপারটি ছিল আরেফ আলী গ্রামের যে বড়বাড়ীতে আশ্রিত গৃহ-শিক্ষক সেই বড়বাড়ির-ই অন্যতম কর্তা কাদের আলী নিম্নশ্রেণীর একনারীকে সম্ভোগের উদ্দেশ্যে বাঁশঝাড়ে যায় ; আরেফ সেই কাদেরের ছায়াকেই অনুসরণ করেছিল। আরেফের পদশব্দে কাদের রমনীকে গলা টিপে হত্যা করে। উপন্যাসের অধিকাংশ ব্যয়িত হয়েছে আরেফ আলীর মনের উক্ত ঘটনার প্রতিক্রিয়া বর্ণনায়। শেষ পর্যন্ত

Dhaka University Institutional Repository


ঘটনাটি সে প্রথমে দাদা সাহেবকে এবং পরে পুলিশকে জানায়। পুলিশ জেনে শুনেই কাদেরের বদলে তাকেই দোষী সাব্যস্ত করে।

এই সংক্ষিপ্ত কাহিনী দ্বারা মূল উপন্যাসটি সম্পূর্ণ ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। কেননা পুরো কাহিনীটি একটি অন্তর্মুখী বুননীর মাধ্যমে অগ্রসর হয়ে চলেছে যার বিস্তারণ বা সংক্ষেপণ অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। এই উপন্যাসের কাহিনী বর্ণনায় লেখক সর্বদর্শী দৃষ্টিকোণ অবলম্বন করেছেন। তবে সংবেদনশীল যুবক, শিক্ষক আরেফ আলীর সত্য-অন্বেষার ক্ষেত্রে তার মনোজগতে আলোড়নের ফলে যে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয় তা ফুটিয়ে তুলতে আরেফ আলীর দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হওয়ায় উপন্যাসে সেটি প্রাধান্য পেয়েছে। উপন্যাসের প্রায় পুরো অংশটা জুড়ে জগৎ,জীবন,ঘটনা,মানুষ ও প্রকৃতিকে ওয়ালীউল্লাহ্ দেখেছেন আরেফ আলীর অবস্থান থেকে। ফলে উপন্যাসের বাস্তবতার জগৎ অনেকাংশে হয়ে উঠেছে আরেফ আলীর চোখে দেখা বাস্তবতার জগৎ।

'চাঁদের অমাবস্যা'- উপন্যাসে ব্যক্তিসত্তা উন্মোচনের পশ্চাতে সমাজ সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ঔপন্যাসিকের কৃতিত্ব এখানেই যে, ব্যক্তির আত্ম-তদন্তে নির্দিষ্ট থেকেও সমাজ সত্তার পশ্চাদর্জমিতে সম্পূর্ণ নজর ছিলো তাঁর, ফলে ব্যক্তিকে তিনি বিচ্ছিন্ন, শূন্যচারী ও নিরলম্ব করে তোলেননি। যে-গ্রামটি তাঁর উপজীব্য তার সমৃদ্ধময় পরিবার, বড়োবাড়ি, স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ ; পুলিশ কর্মচারী ; সাব-ইন্সপেক্টর সবই যথাযথ পরিস্ফুট।.....লেখক ব্যক্তির আন্তর্জাগতিক প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশের গ্রামীণ মধ্যবিত্ত মানসের মধ্যে স্থাপন করেছেন। আর তা সম্ভব হয়েছে তার নিজের চৈতন্যে প্রবাহিত দেশাত্মবোধের কারণে।"[১১]

ব্যক্তিমনের জটিলতার গ্রন্থ উন্মোচন-ই এ-উপন্যাসে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র লক্ষ্য। তবে তা সমকালীন পাশ্চাত্য উপন্যাসের শিল্পভাবনায়। সেই সঙ্গে সমাজ-ভাবনার ছবিও এখানে স্পষ্ট। এর কারণ হিসাবে সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেছেন– "বাংলা ভাষায় আর কোন উপন্যাসের সঙ্গে এর ঘটনা ও ঘটনা সংস্থাপনে, বিষয় ও প্রকরণের মিল খুঁজে না পেয়েই এর প্রতি গুরুত্বারোপ করা থেকে বিরত থাকেন সমালোচকরা।"[১২]

বস্তুত, 'চাঁদের অমাবস্যা' যুবক শিক্ষক আরেফ আরেফ আলীর মনোজগতের শব্দময় উচ্চারণ ফুটে উঠেছে। এক অকল্পনীয় মানসিক দ্বন্দ্বে জীর্ণ, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মানসিক রূপায়ণ-ই এ উপন্যাসের মূল লক্ষ্য। ফলে উপন্যাসের পটভূমি আমাদের অতিচেনা এদেশের এক গ্রাম এবং উপন্যাসের ঘটনা সেই গ্রামেরই অতি সাধারণ যুবক আরেফ আলীর মানসিক পরিক্রমণকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হলেও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপস্থাপন এবং বর্ণনা-কৌশলে রয়েছে বিভিন্নতা। লেখকের ভাষায়- "তারপর একটি অদ্ভুত কারণেই সে হঠাৎ থেমে একটা আইলের পাশে উঁচু হয়ে বসে নিঃশব্দ রাতে সশব্দে হাঁপাতে থাকে। ওপারে ঝলমলে জ্যোৎস্না কিন্তু সামনে নদী থেকে কুয়াশা উঠে আসছে। কুয়াশা না আর কিছু হয়ত সে ঠিক বোঝে না। হয়তো এক দল সাদা বকরী দেখে যার শিং-দাঁত-চোখ কিছুই নাই। হয়তো মনে হয় রাত্রি গা মোড়ামুড়ি

Dhaka University Institutional Repository


দিয়ে উঠে বসেছে চোখ ধাঁধান অন্তহীন জ্যোৎস্নালোকে জীবনের আভাস দেখা দিয়েছে। হঠাৎ আশ্রয় লাভের আশায় তার উপন্যাস সমস্ত চোখ জ্বলজ্বল করতে শুরু করে।"[১৩]

প্রকৃত পক্ষে ঔপন্যাসিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ এক অনন্য কুশলতায় যুবক শিক্ষকের অন্তর প্রদেশের চেতন ও অবচেতনের টানাপোড়েন, তীব্রতা, নাড়ীছেঁড়াভাব এবং স্বপ্ন ও জাগরণকে বিলুপ্ত শূন্য-মাত্রিকতায় প্রতিস্থাপিত করে উপন্যাসকে দাঁড় করিয়েছেন। নতুন উদ্যম ও নব জীবনীশক্তিতে আবার প্রবাহিত করায় ব্রতী হয়েছেন।

যেহেতু 'চাঁদের অমাবস্যা' একটি চিৎ স্রোতবাহী উপন্যাস। ফলে চেতনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আর যুক্তি প্রতিযুক্তির ব্যবহার উপন্যাসকে শেষ পর্যন্ত পরিণতি পর্যায়ে টেনে নেয়। যুবক শিক্ষকের মানসলোক, স্বপ্নলোক, বাস্তব-অবাস্তব উপস্থিতি, কাদেরের স্বীকারোক্তি, যুবক শিক্ষকের প্রতি ভীতি প্রর্দশন সর্বোপরি ঔপন্যাসিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র ক্ষুরধার শিল্প উৎকৃষ্টতা মোহিত করে। এ- উপন্যাস সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আহমাদ মাযহার বলেছেন-"চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসের আরেফ আলী চরিত্রটি একটি সাধারণ অবস্থান থেকে চৈতন্যের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে অন্য একটি স্তরে উন্নীত হয়েছে। এ উপন্যাসের শিল্প সাফল্যটুকু এখানেই। কিন্তু 'চাঁদের অমাবস্যা' একটি তীব্র অভিজাত সৃষ্টিক্ষম উপন্যাস একথা সত্য হলেও মহৎ উপন্যাসের গুণাবলী এতে অনেকাংশে নেই। এ উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্র আরেফ আলী চরিত্রকে স্ফুট করার কাজে যতটা ক্রিয়া করেছে তার চেয়ে অনেক কম ক্রিয়া করেছে নিজেদের মূর্ত করার কাজে।"[১৪] এই উপন্যাসের আরেফ আলীকে খুব নিঃসঙ্গভাবে বেড়ে উঠতে দেখা যায়। তার আশেপাশের মানুষের জীবন এবং অন্যান্য চরিত্র (শুধুমাত্র দাদা সাহেব ও কাদের মিঞা ছাড়া) তার মনজগতে ক্রিয়াশীল ছিল না। জীবনের বিশাল প্রবাহমান ধারার অংশ হিসেবে সমাজের মাঝখানে আরেফ আলীকে দেখা যায় না। এই উপন্যাসে ব্যক্তির উত্তরণটি তাই একমাত্রিকই রয়ে গেছে।

এ উপন্যাসে জীবনের নিরর্থকতা খুব স্পষ্টভাবে দ্যুতিত হয়েছে। কাহিনী সংগঠনে ও উপস্থাপনার রীতি বহির্ভূত ও স্বতন্ত্রতার সৃষ্টিতে প্রয়াসী হয়েছেন লেখক। কিন্তু তীব্র ভাবে কেন্দ্র গ্রামীণ। ঔপন্যাসিক একটি স্থির লক্ষ্যের যাত্রী। এ-উপন্যাসে তিনি সর্বাঙ্গীণ আধুনিক ঔপন্যাসিক রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। উপন্যাসটি লেখকের ইউরোপ জীবনে রচিত হলেও এর ভিত্তি ভূমিতে বাংলাদেশের নিসর্গ ও মানুষ খুব স্পষ্ট রেখায় চিত্রিত। এ বিষয়ে অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন- "চাঁদের অমাবস্যা উপন্যাসে অস্তিত্ববাদী জীবন জিজ্ঞাসা প্রকাশিত। জটিল অসরল জীবন চিত্র বলে মনে হয়। ব্যক্তি মনের জটিলতার গ্রন্থি উন্মোচনই এখানে তাঁর লক্ষ্য। সমকালীন পাশ্চাত্য উপন্যাসের শিল্প ভাবনাই নয়, সেই সঙ্গে সমাজ ভাবনার ছবিও এখানে পাই।"[১৫] বাশঁবাড়ে 'যুবতী নারীর মৃত দেহ' এই অকল্পনীয় ঘটনা এবং অভাবনীয় অভিজ্ঞতার সংঘাত আরেফ আলীর অস্তিত্বমূল প্রবলভাবে বিচলিত করে। স্বপ্নচারী,রোমান্টিক এবং অর্ন্তময় মনোজগত-

Dhaka University Institutional Repository


এর ফলে রক্তাক্ত হয় এবং যখন তারই আশ্রয়দাতা বড়বাড়ির কাদেরকে হত্যাকারী হিসাবে শনাক্ত করে তখন, ঘটনার আকস্মিকতা ও বিশ্বাস ভঙ্গের যন্ত্রণায় এক আতঙ্কগ্রস্থ সত্তায় পরিণত হয় আরেফ আলী। তারপর আরেফ আলী দিকভ্রান্তের মত ছুটতে থাকে। আরেফ আলীর ঈষৎ স্বপ্নময় ও অর্ন্তমুখী চৈতন্যের এই নব অভিজ্ঞতা ষাটের দশকের সামরিক শাসন পীড়িত বাংলাদেশেরই প্রতিরূপ। কেননা যুবক শিক্ষক যেমন "জ্যান্ত মুরগী-মুখে হাংলা তামাটে রঙের শেয়াল দেখেছে, বুনো বেড়ালের রক্তাক্ত মুখ দেখেছে, মানুষের দুঃখ কষ্ঠ মহামারী হাহাকার দেখেছে। কিন্তু নির্জন রাতে বাঁশঝাড়ের মধ্যে, যুবতী নারীর মৃত দেহ দেখে নাই, হত্যাকারী দেখে নাই।"[১৬] আরেফ আলীর মধ্যে যে 'ভয়' ক্রিয়া করেছিল তার সাথে তৎকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক সত্যের নিগুঢ় সত্য অনায়াস সাধ্য। আর সেই ভয় ও সত্যকে অবরুদ্ধ করে রাখার অর্ন্তগত যন্ত্রণায় যুবক শিক্ষকের ভীতি শিহরিত চিত্ত ক্রমাগত অন্ধকারের দিকে ধাবিত হয়। অস্তিত্বের প্রশ্নে সে হয়ে পড়ে বিমিশ্র অবস্থান শিকার। তার মনে হয়, যুবতী নারীর হত্যাকারী 'কাদেরের পায়ের তলে সে যেন ঘৃণ্য বস্তু শিরদাঁড়াহীন নপুংসক কীট পতঙ্গ কিছু'। এ উপন্যাস সম্পর্কে সৈয়দ আকরম হোসেনের উক্তি স্মরণীয়-"এ ভাবেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ মানব অস্থিত্বের স্বরূপ নির্ণয় ও সত্তা উপলব্ধির প্রক্রিয়ায় যুবক শিক্ষক আরেফ আলীর প্রাত্যহিক নিশ্চেতন জীবনকে নিক্ষেপ করেছেন অর্ন্তচেতনার ঘূর্ণাবর্তে যেখানে সময় সুদীর্ঘ এবং শীতল ঢেউয়ের মতো বহমান, চোখের অন্ধকার ক্রমাগত প্রগাঢ়, সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রসারমান পাথরের মত স্তব্ধ। আরেফ আলী অনুভব করে অস্তিত্ব হলো 'নির্দয় ভীতি' কিংবা আতঙ্কস্পন্দিত কোন এক অতল গহবর । অথবা বলা যায় ব্যক্তি অস্তিত্বের মর্মগত স্বাধীকার বোধ। দায়িত্বচেতনা ও নির্বাচন অধিকার-ভয়-আতঙ্ক এবং মনস্তাপের প্রক্রিয়ায় মানুষকে করে অস্তিত্ব সতর্ক।"[১৭] এই সজ্ঞান সংবেদনা থেকেই আরেফ আলী মধ্যে জাগ্রত হয় 'মানব মূখী নৈতিক দায়িত্ববোধ। এক প্রকার নৈতিক দায়িত্ব চেতনা থেকেই যে যুবতী নারীর হত্যাকারীর পরিচয় সমাজ সম্মুখে প্রকাশ এবং তার বিচার ও শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করতে সচেষ্ট হয়। এ প্রসঙ্গে ডক্টর রফিকউল্লাহ খান বলেছেন-"শ্রেণী বিভক্ত ও শোষণমূলক সমাজের বিচিত্র শর্তবন্দি ও শৃঙ্খলিত জীবন প্যাটার্নের অনুগামী হওয়াই আরেফ আলীকে ও পরিণত করতে পারতো বিমিশ্র অস্তিত্ব বলয়ে বন্দি। কিন্তু সময় ; সমাজ ও জীবনের নিগুঢ় অনুভব থেকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সমকালের প্রাগ্রসর চেতনামূল স্পর্শ করেন। জীর্ণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সত্ত্বেও আরেফ আলী আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করে এবং অর্থনৈতিক কারণেই উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে ব্যর্থ হয়ে স্কুলের সামান্য আয়ের চাকুরি এবং বড় বাড়ির আশ্রয়ে পরিতৃপ্ত থাকতে হয় তাকে। কিন্তু এক অভুতপূর্ব ও মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা ও তার প্রতিক্রিয়া আরেফ আলীর চেতনা লোক ও জীবন মূলকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে। সে আলোড়নে কেবল ব্যক্তি চিত্ত নয় ; সমষ্টি ; এমনকি প্রশাসন যন্ত্রও প্রবলভাবে নাড়া দেয়। সমাজ বিকাশের ধারায় আরেফ আলীর অতীত বর্তমান ও সমকালীন সময়ের জীবনরূপ গোটা সমাজ ব্যবস্থায় অন্তর বাহিরে-সমগ্রতায় অভিব্যক্ত হয়েছে।"[১৮]

Dhaka University Institutional Repository


প্রকৃত প্রস্তাবে 'চাঁদের অমাবস্যা' ষাটের দশকের এক অস্থির সময়ে মফস্বল শহর ও আধাগ্রামের পটভূমিতে রচিত। সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এই উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্র একদিকে যেমন একটি প্রতীকী ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে উপস্থাপিত তেমনি আধুনিক অস্তিত্ববাদী জীবনবোধের আলোকে উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্র বিকশিত। এ উপন্যাসে যে গ্রামীণ সমাজ চিত্রিত সে সমাজের বাসিন্দারা শ্রেণী বিভক্ত। এখানে "প্রাক্তন জমিদার বা ভূমি মালিক অভিজাত শ্রেণী : উঠতি মধ্যবিত্ত ও বিত্তহীন শ্রমজীবী মানুষের একত্র অবস্থানে এই গ্রামে শ্রেণী বৈষম্য প্রকট। বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরাও মানসিকভাবে পরস্পর বিচ্ছিন্ন। আর এ শ্রেণীগত উচ্চ অবস্থানের কারণেই বড়বাড়ির সদস্য কাদের খুনের দায় থেকে রেহাই পায়। বড়বাড়ির মুখাপেক্ষী গ্রামীণ সমাজের নিম্নতম শ্রেণীর অধিবাসী যুবতী রমনীর বৃদ্ধা মা তাই হয়তো প্রভাবশালীদের ভয়ে হয়তো বা সত্য মিথ্যা ও অলৌকিকতার আশ্রয়ে এমন মনোভাব ব্যক্ত করেছে। সেই সাথে উপন্যাসের আগাগোড়াই আরেফের জাগ্রত বিবেকের রক্তাক্ত পথ অতিক্রমনের নিপণ অর্ন্তবিশ্লেষণ। এ উপন্যাস সম্পর্কে সৌদা আখতার বলেছেন– "সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ পাশ্চাত্য দর্শন চেতনা শিল্প সফলভাবে উপস্থিত হয়ে বাংলা উপন্যাসকে পশ্চিমের শিল্পরীতির সমান্তরাল হবার গৌরব দিতে পারলেও সমকালের পাঠকতা গ্রহণে অপ্রয়োগ প্রমাণিত হয়। এ উপন্যাসের শিল্প প্রকরণে বিশ্ব শিল্প ঐতিহ্য এবং উপাদানে এক অবিনাশী তত্ত্ব দর্শনের ছায়া সম্মতি আজকের পাঠক লক্ষ্য করলেও সমকালে তা পর্যাপ্ত পাঠক সমালোচকদের দৃষ্টি আর্কষণে ব্যর্থ হয়।"[১৯]

'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র জীবন দর্শন ও শিল্প অভিপ্রায়ের মূলে যুদ্ধোত্তর পাশ্চাত্য সাহিত্যাদর্শের ক্রিয়াশীলতা সন্দেহাতীত এবং এ সত্য ও উল্লেখযোগ্য যে : 'উপন্যাসটির বেশীর ভাগ ফ্রান্সের আলপ্স পর্যন্ত অঞ্চলে 'পাইন ফার এলম' গাছ পরিবেষ্টিত ইউরিয়াজ নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে লেখা হয়।' এ উপন্যাস সম্পর্কে রফিকউল্লাহ খান আরো বলেন- "সম্ভবত এ কারণেই এক নিয়াসক্ত সত্য দ্রষ্টা শিল্পীর ঐকান্তিকতায় তিনি সমাজ সত্যের অন্তঃপ্রদেশ এবং মৃত্তিকা মূলস্পর্শী জীবনের নিগূঢ় ইতিহাসকে শিল্পরূপ দানে সমর্থ হয়েছেন।"[২০] 'চাঁদের অমাবস্যা' আরেফের মানস বিদ্রোহের কাহিনী। প্রচলিত কায়েমী স্বার্থ, প্রথা, আভিজাত্য ও ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে তার অনুচ্চিত অথচ প্রত্যয়ী কণ্ঠের অনাস্থা এখানে ঘোষিত হয়েছে। বড়বাড়ির কাদের চরিত্র অস্পষ্ট ও রহস্যময় মনে হলেও শেষ পর্যন্ত তথাকথিত দরবেশী লেবাসের আড়ালে সাধারণের চোখে তার চরিত্রের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে। তবে "এ কথা সত্য যে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র নিঃসন্দেহে লেখকের আধুনিক জীবনবোধ ও বিশ্বাস নিয়ন্ত্রিত। আর এ কারণেই আরেফ আলীর মতো সাধারণ স্কুল শিক্ষকের মনোভাবনায় এক ধরনের দর্শনিকতা এবং তার মননে বুদ্ধি বৃত্তির সমুন্নত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।"[২১]

Dhaka University Institutional Repository


'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসের জটিল ও বহুকৌণিক ঘটনাস্রোতের মধ্যে দু'টি প্রধান প্রবাহ লক্ষণীয়। কুমুরডাঙ্গার জনগোষ্ঠীর অন্তর বহির্জীবনের বাস্তবতা, তাদের অতীত-বর্তমান, মূল্যবোধ-সংস্কার বিশ্বাস, ধর্ম-ধর্মহীনতা এবং সর্বপরি তাদের ভীতি শিহরিত ও ভীতিমুক্ত অস্তিত্বরূপে এ উপন্যাসের সদর্থক ও পরিণামী প্রবাহ। ঐ প্রবাহের সমান্তরালে, কখনো অন্তরালে সংঘটিত হয়েছে মুহাম্মদ মুস্তফার অস্তিত্ব বিনাশী অন্ধকার যাত্রা। এ প্রসঙ্গে ডক্টর রফিকউল্লাহ খান বলেছেন-"লেখক এ উপন্যাসে মানব অস্তিত্বের বিমিশ্র শুদ্ধ উভয় রূপকেই সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত করেছেন। বহির্জগত বিচ্ছিন্ন কুমুরডাঙ্গার ভীতিবিহ্বল জনজীবনস্রোত এবং নিজেকে খোদেজার আত্মহত্যা ঘটনার কারণ মনে করে মুহাম্মদ মুস্তফার অন্ধকার যাত্রার বিন্যাস অস্তিত্ব জিজ্ঞাসার ব্যক্তিক ও সামূহিক চেতনার ফল। 'অস্তিত্ব বিলুপ্তির উৎস' এবং 'অস্তিত্ব উজ্জীবনের শক্তিকেন্দ্র' হিসেবে ভয়-ভীতি ও মনস্তাপকে ব্যবহার করেছেন ঔপন্যাসিক। তবারক ভূইঞার স্মৃতি অনুষঙ্গবাহী শব্দস্রোতে উন্মোচিত হয়েছে কুমুরডাঙ্গার বহির্বিশ্ব বিচ্ছিন্ন আতঙ্ক শিহরিত জনজীবনের অস্তিত্বভীতি ও ভীতিমুক্তি।"[২২]

এ উপন্যাসে 'আমি' নামক কথকের স্মৃতিচারণার মাধ্যমে ব্যক্ত কাহিনীতে মুহাম্মদ মুস্তাফার বাল্য, কৈশোর ও যুবক বৃত্তান্ত জানা যায়। খোদেজার আত্মহত্যার জন্য 'সে-ই দায়ী'-এ অমূলক ধারণাকে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে কিন্তু ক্রমশঃ সে-ও এক সময় একই ধারণার বশবর্তী হয়ে নিদারুণ অনুশোচনায় আত্মহত্যা করে বসে। তবারক ভূইঞা কথিত উপাখ্যানটি থেকে জানা যায়, কুমুরডাঙ্গা নামক একটি মহকুমা শহরের দুঃসময়ের কথা। কুমুরডাঙ্গা গঞ্জ-শহরটির বহি:যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম বাকাল নদী পথ। এই নদীতে চড়া পড়ায় কুমুরডাঙ্গার ষ্টীমার ঘাটটি বন্ধ হয়ে যায়। এতে গঞ্জ শহরটির জনজীবনে এক নিদারুণ ভীতির ছায়া পড়ে। কুমুরডাঙ্গাবাসী দিশেহারা হয়ে নানা অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসে জড়িয়ে পড়ে। কেউ কেউ শহরটি ত্যাগ করার কথাও ভাবে। এক সময় সবই আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়। উপন্যাসে গঞ্জ-শহর কুমুরডাঙ্গা ও মুহাম্মদ মুস্তফার জন্মস্থান চাঁদবরণ ঘাটের পার্শ্ববর্তী গ্রামের কাহিনী সংশ্লিষ্ট হয়েছে। কাহিনীর প্রধান চরিত্র মুহাম্মদ মুস্তফার জন্ম ও কর্মস্থল হিসেবে। সংক্ষেপে এই হলো 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত কাহিনী। এ বিষয়ে শওকত আলী বলেছেন- "এর ভাঁজে ভাঁজে রয়েছে একটি জনপদের ইতিহাস: অতিপ্রকৃত বিশ্বাস এবং রহস্য ও অন্ধকারাচ্ছন্নতা। এ উপন্যাসের কাহিনী, ঘটনা ও চরিত্র চিত্রণ সকল যৌক্তিকতাই নির্ভর করছে এই পরিমণ্ডলটির উপর।"[২৩]

উপন্যাসের কাহিনী উপস্থাপনায় বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। আর তা হলো সময় বদলের ব্যাপারটি। এ উপন্যাসের বাস্তব সময়কাল মাত্র একটি দিনের অপরাহ্ন থেকে শুরু করে গভীর রাত পর্যন্ত মাত্র কয়েকটি ঘন্টা। কিন্তু উপন্যাসে বর্ণিত কাহিনীর সময়ক্রম মাত্র কয়েক ঘন্টায় সীমাবদ্ধ নয়। বর্তমান লোক তা সুদূর

অতীতে প্রসারিত। ষ্টীমারের উপরে বিশেষ স্থানে বিশেষ সময়ে কাহিনীর সূচনা ও শেষ হয়েছে। কিন্তু কথক 'আমি' ও তবারক ভূইঞার বর্ণনা ও স্মৃতির অনুসঙ্গের স্থান কালের গণ্ডি অতিক্রম করেছে কাহিনী। সঙ্গে-সঙ্গে চরিত্র ও চেতনা প্রবাহকে অনুসরণ করে স্থান কালের গণ্ডি পেরিয়ে গেছে। রফিকউল্লাহ খান আরো বলেছেন- "সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসে যে জীবন রূপ উপজীব্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে অর্ধ-শতাব্দীরও অধিককালের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের অন্তঃশ্রোত বিধৃত। কুমুরডাঙ্গার জনগোষ্ঠীর অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের স্বরূপ উন্মোচন সূত্রে কলোনিশাসিত, শ্রেণী বিভক্ত ও শোষণমূলক সমাজের সমগ্রতাকে স্পর্শ করেছেন তিনি। গ্রামীণ জীবনের মন্থর গতিপ্রবাহ, ক্রমবিকাশমান নগরজীবনের চারিত্র্য কলোনীর হাতবদলের মধ্য দিয়ে কিভাবে জটিল থেকে জটিলতর রূপ ধারণ করেছিল, সত্য সন্ধানী শিল্পীর মত তাকে বিন্যস্ত করেছেন ঔপন্যাসিক।"[২৪]

কুমুরডাঙ্গার বহির্জীবন বাস্তবতার চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক বাংলাদেশের ধীর-বিকাশমান নগরজীবনের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন- "কুমুরডাঙ্গা শহর এমনই এক অঞ্চলে অবস্থিত যেখানে রেলগাড়ীর মত লৌহ-দানব তো দূরের কথা, তেমন একটি সড়কও কল্পনাতীত যে-সড়ক বর্ষাকালে তলিয়ে যাবে না, বৃষ্টিতে ভেসে যাবে না। নদী-খাল-বিল এবং বিস্তির্ণ জলাভূমি পরিবেষ্টিত শহরটির জন্য দ্রুত যানবহন হিসেবে যে স্টীমার ছাড়া আর কোন গতি ছিলনা। তার সমৃদ্ধি শুধু যে স্তব্ধ হয়ে ছিলো তা নয়। দিন দিন অবনতির দিকেই যাচ্ছিলো। অনেক দিন ধরে ব্যবসা বাণিজ্যে ঘুন ধরেছিল, উকিল মোক্তার, হেকিম ব্যক্তিদের তেমন পসরা ছিলো না, কাছারি আদালত, ছোট একটি হাসপাতাল, হাইস্কুল, এমনকি মেয়েদের জন্য মহিলা স্কুল নিয়ে গর্ব করতে পারলেও যে রহস্যময় কল্যাণ স্পর্শে একটু জায়গা জীবিত থাকে, তার উন্নতি হয়, সে কল্যাণ স্পর্শে থেকে শহরটি সর্বদা বঞ্চিত তার ওপর স্টীমার ঘাটও বন্ধ হলে সভার ওপর দাঁড়ায় যা পড়ে আর কি।"[২৫]

'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ গ্রামীণ সমাজ জীবনের বাস্তব ছবি চিত্রিত করেছেন। গ্রামীণ সমাজে শঠতা, প্রতারণা ও জবরদস্তি আশ্রয় নিয়ে জমি জমা বসতবাড়ী দখল ও আত্মসাৎ মাড়োয়ারীদের পুঁজির দাপটের কাছে উঠতে বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের সর্বশ্বান্ত হওয়ার শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি যে কোন পন্থায় ধন-সম্পদের মালিক হয়ে 'সম্ভ্রান্ত' হওয়া, সেই সুবাদে স্ত্রী ছাড়াও একাধিক বাঁদি রাখার সুযোগ লাভ এবং গ্রাম জীবনে সম্ভ্রান্তদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও দাপটে প্রবৃত্ত রয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ এ উপন্যাসে "কুমুরডাঙ্গার বর্তমান লগ্ন ঘটনাপ্রবাহ অনুসন্ধান করতে গিয়ে 'আশি বছর' পূর্ববর্তী সময় কাল থেকে সংঘটিত ঘটনা ও তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া রূপায়ন ঘটেছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে' 'ইংরেজ ও হিন্দুদের মধ্যে প্রচণ্ড মনোমালিন্যের ভাব', জমিদারদের প্রতিশোধ স্পৃহা, পেশীশক্তির আধিপত্য, কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীদের অতিশয় হিংস্র প্রকৃতি', বর্হিবিশ্বে থেকে দূরবর্তী থাকার

Dhaka University Institutional Repository


ফলে অন্ধসংস্কার ও বিশ্বাসে আস্থা প্রভৃতি প্রসঙ্গ উপন্যাস অন্তর্গত মূল ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে অনিবার্য কার্যকারণ সূত্রে সংলগ্ন। বাকাল নদীতে চরা পড়ে যাওয়ায় কুমুরডাঙ্গার শহরে বিচিত্রমুখী ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। জনপদের ভীতি শিহরিত অস্তিত্ব এক সময় আবিস্কার করে নদীর তীক্ষ্ণ তীব্র ক্রন্দনধ্বনি, মানব অস্তিত্বের অজ্ঞাত এই ক্রন্দন প্রকৃতপক্ষে বর্হিজগত বিচ্ছিন্ন, বিবিশ্র অস্তিত্বে নিমজ্জিত কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীদের চেতনারই প্রতিচ্ছবি। [২৬] এ উপন্যাসে কুমুরডাঙ্গা নামে যে গল্প-শহরটি কাহিনীর পটভূমি হিসেবে এসেছে সেই শহরের সমাজ জীবনে নাগরিক আধুনিকতার পরিবর্তে সামন্ততন্ত্রের অবশেষে অন্তকালীন প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করা যায়। আশি বছর আগে যখন কুমুরডাঙ্গার স্টিমার ঘাটে উদ্বোধন করা হয়েছিল তখন এলাকাটিতে ছিল জমিদার ও লাঠিয়াল বাহিনীর প্রচণ্ড দাপট। আর মুহাম্মদ মুস্তফা ছোট হাকিমের চাকরী নিয়ে প্রথম যখন কুমুর ডাঙ্গার ষ্টীমার ঘাটে পৌছায় তখনও সেখানে আধুনিক শহরের কোন চিহ্ন সে দেখতে পায়নি। ষ্টিমার ঘাটের অর্থনৈতিক গুরুত্ব প্রধানত এতেই সীমাবদ্ধ যে, সেখান থেকে রাশি রাশি কলা চালান যায়। সেখানকার যাতায়াত ব্যবস্থাও শহরের মতো নয়। শহরের বাইরে থেকে যারা সেখানে আসে হেটে, গরুর গাড়ীতে করে কিংবা নৌকায় চেপে। এ শহরটির অধিবাসীদের মধ্যে ব্যবসায়ী, কর্মজীবী ছাড়াও কিছু ডাক্তার, উকিল, মোক্তার, শিক্ষক প্রভৃতি শিক্ষিত পেশাজীবী রয়েছেন। তবে শিক্ষিত হলেও এদের মধ্যে সংস্কারাচ্ছন্ন ভাব দেখা যায় না। এরা শহরবাসী হলেও যথার্থ নাগরিক চেতনা এদের মধ্যে বিকশিত হয়নি। বিকশিত হয়েছে আতঙ্কগ্রস্ত পশ্চাৎপদ গ্রামবাসীর অতিপ্রাকৃতি বিশ্বাস ও কুসংস্কার। তাই তারা সদ্যজাত বাছুর থেকে শুরু করে সোনাদানা, এমন কি ঘরের তৈজসপত্র পর্যন্ত অকাতরে নদীতে দান করে তারা আসন্ন অমঙ্গল থেকে রক্ষা পেতে চেয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসে মুহাম্মদ মুস্তফার মনোজগতে আলোক সম্পাতের পাশাপাশি কুমুরডাঙ্গা শহরের এবং প্রসঙ্গত চাঁদবরণ ঘাটের পার্শ্ববর্তী মুহাম্মদ মুস্তফার নিজ গ্রামের সমাজ ও প্রতিবেশের চিত্র আঁকতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি তার পেছনে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সমাজ বাস্তবতাবোধের পরিচয় আছে। [২৭]

সখিনা খাতুনের শোনা প্রথমে কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীদের মধ্যে ভয়ের নিদারুণ অমঙ্গল বোধের সৃষ্টি করেলেও এক সময় তা 'অপরূপ ভাবাবেগে আবির্ভূত হয়ে পড়ে'। কান্নাশোনা রীতিমত 'সৌভাগ্যে পরিণত হয়। এরই মধ্যে দর্জিপাড়ার রহমত শেখ একটি নবজাত বাছুরকে নদীতে কোরবানী দেয়। কুসুমডাঙ্গার অধিবাসীরা এ আচারণকে 'বিবেচনাহীন অবাচীনের কাজ' ভেবেও "দলে দলে তারা নদীর তীরে উপস্থিত হতে শুরু করে, হাতে এটা সেটা। যে যা পারে যা যার কাছে মূল্যবান মনে হয়, তাই নিয়ে আসে, হাড়ি-পাতিল, জামা-কাপড়, চাল-ডাল, টাকা-পয়সা এমন কি সোঁনা-রূপার গহনাও। এসব নদীর পানিতে ছুড়তে শুরু করে।"[২৮]

Dhaka University Institutional Repository


বাকাল নদীর নানা প্রকার মূল্যবান ও মূল্যহীন জিনিস পত্র নিক্ষেপের পর ধীরে ধীরে কুমুর ডাঙ্গার মানুষদের ভয় কাটে, তাদের অন্তরে বেদনার যে দীর্ঘ কালো ছায়া পড়েছিল তা অপসারিত হয়। অতঃপর বন্ধ হয়ে যাওয়া স্টীমার ঘাটের স্টেশন মাষ্টার খতিব মিয়া নতুন ভাবে কুমুরডাঙ্গার 'অধিবাসীদের মধ্যে জীবনের সঞ্চার করে। একদিন সে খবর পায়, কোম্পানির চাকরী থেকে তাকে অবসর দেওয়া হয়েছে। প্রথমে বিচলিত হলেও পরে সে মেনে নেয় এবং বাকী জীবন কুমুরডাঙ্গায় বসবাস করার সিদ্ধান্ত নেয়। খতিব মিঞা মৃত্তিকা প্রেম ও মানুষের প্রতি ভালবাসায় সুস্থির। কোন ভয় তাকে স্পর্শ করেনি, তার মধ্যে জন্ম হয়নি কোন পলাতক মনোভাবের। বহমান জীবন স্রোতের সঙ্গে শিকড়ায়িত হয়েই খতিব মিঞা খুঁজে পেয়েছে তার জীবনের পরামর্শ বেচেঁ থাকার অনিবার্য প্রেরণা।

প্রকৃত পক্ষে সৈয়দ ওয়ালীউল্লার 'কাঁদো নদী কাঁদো' তার পূর্বোক্ত দুটি উপন্যাস 'লালসালু' ও 'চাঁদের অমাবস্যা' লোক ভিন্নতর রূপকল্পে চিত্রিত। এ উপন্যাসে তিনি আরো অগ্রসর সমাজের মুক্তি অভিলাসী, স্বদেশ সংলগ্ন ও জনজীবন আশ্রিত, আর এখানেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর মৌলিকত্ব। কাঁদো নদী কাঁদো মুহাম্মদ মুস্তফার মধ্যে কোন নৈকট্যই ছিলনা। এমন কি নিজের অস্তিত্বের দায়িত্ব ও দায়ভার বহণ করে অস্তিত্বের ভয়ানক ও অগ্নিদাহময় সরণি শ্রান্তিক পরিস্থিতি অতিক্রমে ব্যর্থ হয়েই মুহাম্মদ মুস্তফা তার অস্তিত্ব থেকে পলায়ন করেছে। সে খোদেজার মৃত্যু অপরাধের দায়ভার বহন করেছে। এ প্রসঙ্গে জীনাত ইমতিয়াজ আলী বলেছেন- ''ফলে নীরব আত্ম-বিসর্জন, অলক্ষিত আত্ম-বিনাশই তার পরিণতি অনিবার্য করেছে। সে ক্ষেত্রে খতিব মিঞা তার অন্তর্গত চেতনায় যেমন স্থিত প্রান্ত ও মীমাংসিত তেমনি সামগ্রিক মঙ্গলচিন্তা জাগরিত এবং ব্যাপক জনগোষ্ঠীর সচেতনতা প্রসূতি অস্তিত্ব অভীপ্সু। এখানেই শুদ্ধি মেলে একটি সমাজ ও জনগোষ্ঠী প্রকৃত অর্থেই অর্জন করতে পারে তার মানবিক অস্তিত্বতায় রূপ ও চরিত্র। সে দিক থেকে বলা যায়, খতিব মিঞাই ঔপন্যাসিকের প্রতিপাদ্য, ক্ষুদ্র প্রাতিস্বিক অস্তিত্ব নয়, ব্যাপক সমাজ অস্তিত্ব অন্বেষাই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র লক্ষ্য শিল্পী জীবনার্থের প্রত্যয়। 'লালসালুতে যে জীবনবোধ, ঔপন্যাসিকের যে জীবন চর্চা ও মৌলিক প্রতিপাদ্যের সূচনা চাঁদের অমাবস্যা তার মধ্যপর্ব আর 'কাঁদো নদী কাঁদো'-তে এসে তা হয়েছে সমুদ্র সম্পর্কিত, পূর্ণাঙ্গভাবে বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত।''[২৯]

'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসে কুমুরডাঙ্গার জীবন ষ্টীমার চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জন মানসে হতাশা, উকিল কফিল উদ্দিনের ব্যাখ্যা, ফের ষ্টীমার চলাচলের জনশ্রুতি, আশা ও নিরাশা, এক রহস্যময় কান্নার শব্দে আলোকিত, ভীত, ত্রস্ত শহরবাসী সবকিছুই মুহাম্মদ মুস্তফার ব্যক্তি জীবনকে এক আত্ম-ঘাতি পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে যায়। অস্তিত্বে সুতীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসায় মুস্তফা পীড়িত। খোদেজার আত্মহত্যার কারণ সে নিজেই, কারণ মুস্তফা খোদেজাকে ভালোবাসেনি, তার

Dhaka University Institutional Repository


যোগ্য জীবন-সঙ্গিনী বলে মনে করেনি, অথচ পিতৃহীনা আশ্রিতা খোদেজার সমস্ত আশা সব স্বপ্ন স্নেহ মমতা পরজীবী উদ্ভিদের মতো মুস্তফাকে ঘিরে গজিয়ে উঠেছে, তাকে জড়িয়েই বেঁচেছিলো। "মুস্তফা আশ্রিতা লতাটিকে নিষ্ঠুরভাবে ছেদন করেছে। শহরের সব লোক যে বিচিত্র কান্না শুনেছিলো, তার উৎস খোদেজা, তার জন্য দায়ী মুস্তফা এই চিন্তাই মুস্তফাকে আত্মহননের পথে ঠেলে দিলো। ব্যক্তির সংকট ও সংকট মুক্তির প্রয়াস ও সাফল্যের নিপুণ বিশ্লেষণ 'কাঁদো নদী কাঁদো'।"[৩০]

আত্মহননের পথে নিঃসঙ্গ যাত্রী মুস্তফার অন্তর্লোকের একটি ছবিই এই উপন্যাসের অন্তর্বাস্তবতা ফুটে ওঠে। "এবার রাত যেন আদিম রূপ ধারণ করে, এমন রাত মানুষ চেনে না। দূরে দিগন্তের কাছে কয়েকবার বিদ্যুৎ ঝলক দিয়ে ওঠে,তবে নিঃশব্দ সে বিদ্যুৎ ঝলক চোখ ঝলসে দিলেও তেমন অসত্য মনে হয়। একটু পরে একটি বাদুর এসে নিকটে বার কয়েক ঘুরপাক খায়, তার পর রাতের অন্ধকারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ঠোঁটের পাশে কেমন বিদ্রুপাত্মক হাসি সামান্য তিরস্কারের আভাস যা খোদেজার মুখে কখনো দেখেনি। না, বিদ্রুপাত্মক হাসি বা তিরস্কারের ভাব নয়, তার মুখে গভীর দরদের ছায়া এবং যে বড় বড় চোখ খোদেজার চোখের মত ঠিক নয় সে চোখে উৎকণ্ঠা। তবে কি কিছুই হয়নি ? সে কোন অন্যায় করেনি খোদেজারও মৃত্যু হয়নি। সবই কি দুঃস্বপ্ন মাত্র ? এ সময়ে কী একটা প্রবল ভাবাবেগে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে মুহাম্মদ মুস্তফার তন্দ্রা ভাঙ্গে। তবে বাস্তব জগতে প্রত্যাবর্তন করলে সে বুঝতে পারে দুঃস্বপ্নটি ঘুমতন্দ্রার জগতের নয়, আসল জীবনেরই একটি অংশ যার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া সম্ভব নয়। এবার তন্দ্রাহীনতা চোখে বসে থাকে অর্থ উদ্দেশ্যহীনভাবে। তারপর একসময় তার মনে হয় সে যেন একা নয় ; অন্ধকারের মধ্যে কে যেন নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।"[৩১]

"সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কুমুরডাঙ্গার রূপকে ষাটের দশকের বাঙালী জীবনের অস্তিত্ব ভীতি ও অস্তিত্ব উজ্জীবনকে রূপায়িত করেছেন। সমকালীন অন্তমুখী নৈরাজ্যমগ্ন আত্মবনাশী সমাজ-রাজনৈতিক স্রোতাবর্তকে তিনি দিয়েছেন আলোকোজ্জল উত্তরণের দিক নির্দেশনা। ব্যক্তিকতাকে পরিণত করেছেন সমস্টিকতায়–কুমুরডাঙ্গাকে পরিনত করেছেন সমগ্র বাংলাদেশে এবং মানবীয় উত্তরণকে তিনি বিশ্বজনীন শিল্প ও দর্শনের অঙ্গীকারে করেছেন সমৃদ্ধ সম্ভাবনাময়।"[৩২]

Dhaka University Institutional Repository


সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ চল্লিশের দশকে ছোটগল্প রচনায় ব্রতী হন। বস্তুত, এ শতাব্দীর চারের দশক বিভিন্ন ভাবে আমাদের জনজীবন, শিল্প ও সংস্কৃতির বিকাশ, উৎপাদন ব্যবস্থা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মধ্য শ্রেণীর উদ্ভব ও অস্তিত্ব বিকাশ প্রভৃতি ক্ষেত্রে স্থায়ী প্রভাব ও তাৎপর্য অঙ্কিত করে। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এ সময়কাল একটি অনন্যতা যুক্ত, অসাধারণ পালানুক্রম। সামাজিক পরিবর্তনশীলতা, অস্থির বিভক্তি অনেক ঘটনা অঘটনা এ দশকের উল্লেখযোগ্য বিষয়, যার ফলে সংস্কৃতি ও জীবনযাপনে লক্ষণযোগ্য রূপান্তরের বিশিষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। আর এ ভিত্তি ভূমিতে বেশ কিছু লেখক বিভাগোত্তর কালে বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করে তাদের রচনা শুরু করেছিলেন।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ এই সময়-স্বভাবের জাতক, তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য লেখকের মধ্যে ছিলেন আবু রুশদ, সরদার জয়েন উদ্‌দীন, রশীদ করীম, শওকত ওসমান, শামসুদ্দীন আবুল কালাম প্রমুখ। এ প্রসঙ্গে নূরউল করিম খসরুর বক্তব্য স্মরণীয়–"অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ভাবে সত্য যে, তিনি একমাত্র ব্যতিক্রম যার রচনায় আধুনিক সময় সংক্রান্ত ও শিল্প চেতনা সফলভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। তার রচনায় এই শর্ত ও বিশিষ্টতাকে সঠিকভাবে আবিষ্কার করার জন্য আমাদের জানা প্রয়োজন যে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ মূলতঃ এক অবিনাশী বিশ্ব ঐতিহ্য রক্তে ও মেধায় স্বতঃবহন করেছিলেন, ইউরোপীয় ও ফরাসী শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিচিত্র শিল্প রূপান্তর ও প্রকরণ কুশলতার প্রতি ছিলো তার সজাগ অভিনিবেশ ও অনুসন্ধান।"[১১] তবে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, "সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বিষয়গত দিক থেকে কল্লোল যুগের লেখকের কাছে বহুলাংশে ঋণী হলেও তার রচনার স্টাইল ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মী। বহির্বাস্তব জগৎ থেকে মনোলোকে গমনাগমনের ব্যাপারটিতেও তাঁর স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট।"[১২]

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কোন বিশেষ চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া নির্মাণের পরিবর্তে মানবিক বিপর্যয়ের গভীরতা নির্দেশ করে দুর্ভিক্ষ পীড়িত ও যুদ্ধবিধ্বস্ত জনতার অন্তর্জ্বালা ; মনোযন্ত্রণা, বিভিন্ন শ্রেণী অবস্থানে বদ্ধ মানুষের মনোভঙ্গির স্বরূপ ও সত্য উদঘাটন করেছেন। তার গল্পে কখনোই মূল্যবোধের সামগ্রিক অবক্ষয়, মানবিক নীতি আদর্শের সর্বাত্মক ব্যত্যয় ও স্খলন কিংবা জৈব পঙ্কিলতার কোন মনোহর ছবি উপস্থাপিত হয়নি। তাঁর 'নয়নচারা' গল্পে এই সুস্থির ও আদর্শায়িত এবং দুর্ভিক্ষের ব্যক্তিচেতনা প্রবাহ আশ্রিত, অনুভূতি মান রূপেরই শিল্পকথা।

এ বিচিত্র শহরে আমু উদ্ভট সব স্বপ্নের দোলাচলে দ্বিধান্বিত হয়। ক্ষুধার জ্বালায় শহরের মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে সে শহরের মানুষের প্রকৃত পরিচয় উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও প্রতিবাদ কিংবা প্রতিরোধ সেখানে একেবারেই অসম্ভব। এখানে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করলেও 'আমুদের' দেখার লোক নেই। নির্দয় এ শহরে আমু তাই একদিন একটি বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে যখন ক্ষুধাতাড়িত হয়ে আর্তনাদ করছিল তখন দরজা খুলে একটা মেয়ে বেরিয়ে এলো। আমু দেখলো মেয়েটির হাতে রয়েছে ভাত। ত্রস্ত

Dhaka University Institutional Repository


ভঙ্গিতে ময়লা কাপড়ের প্রান্ত মেলে আমু ভাতটুকু নিলো। তারপর নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইলো সে মেয়েটির পানে। আশ্চর্য হয়ে দেখলো সে, এ মুখ তার চেনা। তার হঠাৎ মায়ের কথা মনে পড়লো এবং সেই নয়নচারা গ্রামকে। বললো সে 'নয়নচারা গ্রামে কি মায়ের বাড়ি ? মেয়েটি কোন উত্তর দিলো না, বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত শুধু তার পানে তাকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলো' ।

'নয়নচারা' গল্পটির গঠন শৈলীর মধ্যে গল্পকারের নিজস্ব ব্যক্তিত্বে ছাপ সুস্পষ্ট। এ গল্পে আমুর 'অন্তর্জগতের আত্মভাষণ, উপস্থাপন করতে গিয়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ যেন নিজের ব্যাক্তি সত্তারই উন্মোচন ঘটিয়েছেন। তিনি এ গল্প রচনায় সমাজ ও সমাজ সচেতন এবং মানবিক দায়িত্ব বোধের পরিচয় দিয়েছেন।

'জাহাজী' গল্পটি রচিত হয়েছে বৃদ্ধ করিম সারেঙের দৃষ্টিতে। করিম সারেঙ, মতিন, ছাত্তার, চীফ অফিসার, হামেদ লস্কর বিভিন্ন চরিত্র এসেছে। কিন্তু সবই করিম সারেঙের চোখ-মন দেখা। ঘটনাকাল ভোর রাত্রি থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। করিমের সারা জীবন কেটেছে জাহাজে। জীবনের গোধুলি বেলার হিসাব মেলাতে গিয়ে সে দেখেছে যে, সামান্য অর্থ ছাড়া তার জীবন খাতায় আর কিছুই জমা হয়নি। তাই সে বাংলার বন্দরে পৌছেই জাহাজী জীবনের অবসান ঘটাবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়। হঠাৎ রাত ও দিনের সন্ধিক্ষণে ফজরের নামাজ অন্তে একটি ঘটনার প্রতি তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। 'গত সন্ধে থেকে কার্গো উইঞ্চে কাজ করছিল লস্কর ছাত্তার। চীফ অফিসারের হুকুমে রাতের মধ্যেই কাজ শেষ করতে হবে। কিন্তু দ্রব্যের আধিক্য হেতু তা সহজ ছিলো না। তবু লস্করেরা আপ্রাণ চেষ্টা করে।' ভোরের দিকে অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত ক্লান্তির কারণে ছাত্তার হাচওয়ের আড়ালে একটু বিশ্রাম করতে চেয়েছিল। আর তখনই তার প্রতি দৃষ্টি পড়ে চীফ অফিসারের। ফলে ছাত্তারের প্রাপ্তি হয় কয়েকটি লাথি। ছাত্তার চীফ অফিসারের এ আচরণে অন্তরে গভীর অপমান ও পীড়ন বোধ করে। প্রতিকারের আশায় অতঃপর সে সারেঙের সঙ্গে দেখা করে। করিম সারেঙ তখন আলোছায়াময় সামুদ্রিক দুর্লভ এক পরিবেশের একান্তবর্তী বেদনাময় চেতনায় সম্মাহিত ছিল বলে ছাত্তারের জন্যে তার মাঝে সঞ্চারিত হয় গভীর পিতৃস্নেহ। আলাপচারিতায় করিম জেনেছে যে, ছাত্তার বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। এ আগমন স্নেহের সমুদ্রে অবগাহনে নয়, বিপদ-সমুদ্রে বিরতিহীন যাত্রা। করিম তাই কলকাতা বন্দরে জাহাজ ভিড়লেই ছাত্তারকে বাড়ি যেতে বলে। কিন্তু তার অবসর গ্রহণ হয় না। সে নতুন করে জাহাজে হয় চুক্তিবদ্ধ করিম সারেঙের একাকীত্ব নৈঃসঙ্গ ও উত্তরাধিকারহীন এক বেদনা-'জাহাজী'গল্পে রূপ লাভ করেছে।

'জাহাজী' নিঃসঙ্গ সারেঙ জীবনের এক মর্মান্তিক চিত্রকল্প ''সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র শিল্পী মানস অনুযায়ী এ গল্পেও অন্তর্জীবনের বিশ্লেষণ প্রাধান্য পেয়েছে। আত্মীয় সংসর্গবিহীন জাহাজী জীবনে বৃদ্ধ করিম সারেঙ এর মন বিচিত্র ভাবনার রাজ্যে সংশ্লিষ্ট হয়। কখনো শূন্যতায় হাহাকার করে ওঠে সে, কখনো বিনম্রচিত্তে

Dhaka University Institutional Repository


প্রার্থনা নিরত রাহামুনুর রহিমের প্রতি। জীবনের অন্তঃসার শূন্যতায় বিদীর্ণ হয়ে এক ধরনের অভিযোগসহ কখনো অসীমের উদ্দেশ্যে এ অপ্রতিরোধ্য জিজ্ঞাসার তাড়নায় উদ্বেলিত হয় তার মন।"[৩৫]

বেদনাকে নিঃশব্দের মধ্যে ধারণ 'পরাজয়' গল্পের সাফ্যালের অন্ততম প্রান্তবর্তী এলাকা। কুলসুমের মুখে গল্পকার তেমন কোন সংলাপ না দিয়ে লেখক তার বেদনাকে বর্ণনার মাধ্যমে হৃদয়স্পর্শী করে তুলেছেন 'পরাজয়' গল্পে সমাজ কেবল গৌণ, ব্যক্তিই মূখ্য হয়ে উঠেছে। ব্যক্তির আচার চরিত্র ,চেতনা বাসনা , দ্বৈত রূপ ও জীবনকে আলিঙ্গনের মানসিক তীব্রতা সব কিছুকে ছাড়িয়ে উজ্জল হয়ে উঠেছে এ গল্পে। "তাদের জীবন সম্পর্কতার সংযোগ ও বিভাজন, জীবন-মৃত্যুর অনুভব পুঞ্জী ও লতিয়ে লতিয়ে একটি ঘন গল্প মানচিত্র নির্মাণ করেছে। বস্তত জীবন এবং মরণ এ গল্পের প্রধান বিবেচনা।" [৩৬]

'খুনী' গল্পের কাহিনী এরকম ঃ এক চৈত্রের দুপুরে চর আলেকজান্দ্রার সোনাডাঙ্গা গ্রামের মৌলভী বাড়ীর ছেলে রাজ্জাক ফজু মিঞাদের বাড়ীর ছেলেকে খুন করে পলাতক। তারপর সে উত্তর বঙ্গের কোন এক মহাকুমা শহরের আবেদ দর্জির কাছে আশ্রয় নেয় দর্জির নিরুদ্দেশ-পুত্র মোমেন সেজে। দর্জির বিধবা পুত্রবধূ জরিনার জন্যে তার হৃদয়ে মৃদু আর্কষণ ও প্রেমের সঞ্চার হয়। তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেবার আগেই দর্জির নিরুদ্দেশ-পুত্র মোমেন ফিরে আসে। আর তখনই রাজ্জাকের অভিনয় জীবনের অবসান হয়, ঐ বাড়ী থেকে বিদায় নেয় সে। "রাজ্জাক বাইরে চলে এল চিরদিনের জন্যে। বেরবার আগে সে দক্ষিণ দিকের ঘরের পানে তাকালো, দেখল, দরজার কাছে পা মেলে জরিনা কাঁথা সেলাই করতে করতে হঠাৎ মোমেনের চেচামেচি শুনে বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে তার পানে।"[৩৭] এই গল্পের ভিতরে লেখক ধরেছেন একজন খুনীর মনসপ্রীতি ক্রিয়াগুলি। মূহের্তের ঝোকে খুন করে ফেলে রাজ্জাক আর কিছুতেই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারেনা, যদিও ঐ স্বাভাবিক জীবনের তার তৃষ্ণা দুর্নিবার। তাই সে বিয়ে করে আবার সংসার গড়তে চায়, স্বপ্ন দেখে। সে অনুশোচনা করে তার কৃতকর্মের জন্য। এ প্রসঙ্গে আজহার ইসলামের বক্তব্য স্মরণী–"আলেকজান্ডার চরের এক মূর্খ-খুনীর অবোধ মনের অনুশোচনার ভাষা যখন অশ্রুর ধারায় অনর্গল বেড়িয়ে আসতে শুরু করলো তখন তার ও-পিঠে যেন কথা বলছেন জীবনের সত্যে জারিত এক বিজ্ঞ দার্শনিক।"[৩৮] এক নিরাবেগ বর্ণনার মাধ্যমে তিনি চরাঞ্চলের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা প্রবাহ তুলে ধরেছেন। "আধুনিক শিল্পের এক কুলক্ষণ সমাজের অজ্ঞাত, অখ্যাত, অবহেলিত, ঘৃণিত ও পরিত্যক্তদের জন্য সহানুভূতি ও মমত্ব, তাদের সম্যসাকে মানবিক চোখে দেখা। খুনীর প্রতি সমাজের আচরণ, সুস্থ সহজ-স্বাভাবিক জবিনের জন্য খুনীর তৃজ্ঞা ও পরিশেষে ব্যর্থতা এই গল্পের মূল উপজীব্য।"[৩৯]

'খণ্ড চাঁদের বক্রতায়' গল্পে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ঢাকার এককালের বস্তিবাসীদের জীবনের কাহিনী বেশ কৌতূহল ও কৌতুকের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। এ গল্পে "সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ দৃষ্টি বৃহত্তর ক্ষেত্রে, তাঁর সমাজের বিস্তৃত ভূমিতে প্রসারিত। ফলে গল্পটি হয়ে উঠেছে নগরের উপান্তে পল্লবিত জীবনের এক বাস্তব

Dhaka University Institutional Repository


চিত্র যা শেখ জব্বারের হয়েও নির্বিশেষ বস্তি মালিকের, সেই সব স্ত্রীর যারা নিরুপায় হয়েও আত্মাহুতি দিয়েছে বহু বিবাহের নিষ্ঠুর গিলোটিনে।"[৪০] এ গল্পের শেখ জব্বার পাড়ার একজন ধনী লোক। তার দু'টি গাড়ী দুটি ঘোড়া আর অন্দর মহল ভর্তি চাকর-বাকর এবং চারটি বিবি। তিনি সেখানে ঘোড়েকা বাদশা নামেও পরিচিত। সেই পাড়ার অধিবাসীরা সব গাড়োয়ান। সারা বস্তি জুড়ে সেদিন বেজায় ধুমধাম চলছে। দু'বছর আগে বিয়ে করা ছোট বিবিকে জব্বার মিয়া আজ ঘরে তুলবেন। সে উপলক্ষে জীর্ণ গ্রামোফোনে কোনো কোনো এক অখ্যাত বাইজীর খ্যামটা নাচের গানের তালে তালে এক ছোকরার নৃত্য পরিবেশ। বস্তিবাসীদের উল্লাস, শেখ জব্বারের চার বিবির পারস্পরিক ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব হতাশা, মারামারি এ সব মিলে এ গল্পের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'দুই তীর' গল্পে আফসার উদ্দিন ও তার স্ত্রী হাসিনার দাম্পত্য সমস্যাকে প্রধানত জীবনের দুই তীর থেকে বিশ্লেষণে প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে "প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তর সমাজ সংকট তার এই বিচ্ছিন্নতাবোধ ও নৈঃসঙ্গ্য চেতনাকে করেছে আরো তীব্র সুচিমুখ। এ কালের মানুষ মাত্রই যন্ত্রনাবিদ্ধ, অসহায়, অপরাধমনা, ভাবাবেগ কম-বেশি আবিষ্ট এবং অপার নাস্তির মধ্যে নিক্ষিপ্ত।"[৪১]

এ পর্যায়ে আলোচিত প্রথম গল্প 'দুই তীর'-এ এই বিচ্ছিন্ন চেতনায় শব্দরূপ পেয়েছে আফসারউদ্দিন ও তার স্ত্রী হাসিনার দাম্পত্য জীবনের মাধ্যমে। আফসারউদ্দিনের শ্বশুর আরশাদ আলও নিজের মরুজীবনে মরুদ্যান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কন্যাকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন। কিন্তু হাসিনাকে বেশী দিন রাখতে পারেননি। কেননা সেই ছোট বয়সেই তার মায়ের মেজাজ পেয়েছে। হাসিনা বড় মায়ের কাছে চলে যায়। এক সময় আরশাদ আলীও কর্মজীবন থেকে অবসর নেন। দাম্পত্য জীবনে অসুখী হয়ে বিত্তশালী ও খানদানী বংশের প্রতি তার যে বিতৃষ্ণা জন্মে সেই অনুভব থেকে তিনি মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান আফসার উদ্দিনের সঙ্গে হাসিনার বিয়ে দেন। স্ত্রী মরিয়মের কাছ থেকে বাঁধার সম্মুখীন হন। কিন্তু কবির পরিশ্রমী অধ্যবসায়ী ও জীবন যুদ্ধে প্রশংসনীয় কৃতিত্বের অধিকারী আফসার উদ্দিনকে তিনি কিছুতেই হাতছাড়া করলেন না। তবে মেয়ের স্বভাবের মধ্যে মায়ের মেজাজের পরিনতির কথা ভেবে আরশাদ আলী জামাইয়ের হাতে কন্যাটি সমর্পনের সময় বলেন, "আমার মেয়েটি আদরের মধ্যে বড় হয়েছে। স্নেহ মমতা অভাব সে কখনো বোধ করে নাই। তাই জীবন সম্পর্কে তার কোন ধারণা নাই। সে কথাটা মনে রেখো।"[৪২]

তবে আফসার উদ্দিন ও হাসিনার দাম্পত্য জীবন নিষ্ফল প্রমাণিত হয়েছে, বস্তুত ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা সমাপ্ত করলেই বিয়ের মাধ্যমে দু'টি জীবন অভিন্ন বিন্দুতে মিলিত হতে পারেনা, তাদের মধ্যে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যগত সাধর্ম ও সাদৃশ্য থাকার প্রয়োজন হয়। অন্যথায় মিলন পরিণত হয় শৃঙ্খলে, পাশাপাশি বাস

Dhaka University Institutional Repository


করেও দু'টি জীবন রূপান্তরিত হয় দু'টি বিচ্ছিন্ন দ্বীপে। আফসার উদ্দিনের বিচ্ছিন্নতা বোধ আকস্মিক নয়, অভিজ্ঞতায় তা স্তরীভূত। জীবনের একটি পর্যায়ে পৌঁছেই তার এ উপলব্ধি হয়েছে সুতীব্র। ফলে 'দুই তীর' এর কাহিনী গ্রন্থ প্রচলিত নয়, বৈচিত্র ধর্মী। আফসার উদ্দিন-হাসিনার মূলকাহিনীর সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে অগ্রসর হয়েছে আরশাদ আলী মরিয়ম খানমের উপকাহিনী, অত:পর আফসার উদ্দিনের 'টুরে' যাওয়ার পর থেকেই দুই কাহিনী মিলে হয়েছে অভিন্ন ও লক্ষ্যাভিমুখি। "জীবনের মধ্যপর্যায়ে এসেই যেহেতু বিচ্ছিন্নতা বোধের প্রাবাল্যতাই 'দুই তীর' গল্পে কালগত ব্যবহার বিষম, কখনো বর্তমান কালের সঙ্গে সহ-অবস্থান করেছে ভবিষ্যৎকাল, আবার কখনো অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যৎ একই সঙ্গে ব্যক্তি হৃদয়ে বর্তমান। যেমন গল্পের সূচনায় বর্তমান কাল স্থির আর আফসার উদ্দিনের চেতনায়, তার স্বীকারোক্তিতে অতীত ও ভবিষ্যত একই সঙ্গে উপস্থিত।"[৪৩]

বস্তুত, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র তৃতীয় পর্যায়ের গল্প সমূহের প্রারম্ভিক গল্প 'দুই তীর' কাহিনী ও আঙ্গিক উভয়তর বিবেচনাতেই স্বতন্ত্র ও গুরুত্ববহ। উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ফাঁকা, নিষ্প্রেমী জীবনাচারের বাস্তব সম্মত, অকৃত্রিম চালচিত্র সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ অত্যন্ত নিরাবেশী, নির্মোহ শিল্পভঙ্গিতে উপস্থিত করেছেন 'দুই তীর' গল্পে।

'একটি তুলসী গাছের কাহিনী'তে তুলসী গাছটিই গল্পের কেন্দ্রে অবস্থান করেছে। এ কারণে কোন একক চরিত্র এখানে বিকশিত হয়নি। "এ গল্পের কাহিনীর বিচ্ছিন্নতার পটভূমি বিস্তৃত, দেশ-কাল ও সমকালীন রাজনীতির স্রোতধারা-বাহিত হয়েই তা ব্যক্তিকে স্পর্শ করেছে ও তাঁর অন্তরে হয়েছে কেন্দ্রীভূত।"[৪৪] বস্তত, দেশ বিভাগের পর বৃহত্তর হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিভাজনের ফলে দেশে যে উদ্বাস্তু সমস্যার সৃষ্টি হয় তার একটি আলেখ্য 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে তুলে ধরেছেন লেখক। হিন্দু ও মুসলমান দু'টি সম্প্রদায় জাতিগতভাবে আলাদা হলেও মানবিক দিক থেকে তারা অভিন্ন সত্তার অধিকারী। তাই রমনীরা প্রত্যহ তুলসী গাছের তলায় প্রদীপ জ্বালায় এবং গলায় কাপড় জড়িয়ে ভক্তি ভরে প্রণাম করে এটুকু জানা বা শোনার পরে কতিপয় মুসলমান গাছটি উপড়ে না ফেলে শ্রদ্ধার সঙ্গে তা লালন পালন করে। আবু জাফর বলেছেন–"কেরানীদের অর্ন্তদেশ থেকে স্বতোৎসারিত ভাবে মানবিক চেতনায় যে উন্মেষ ঘটলো তা মানুষের জন্য মানুষের ভালোবাসারই পরিচয় মাত্র এ সঙ্গে দুষিত রাজনীতির কোন প্রনোদনা নেই।"[৪৫]

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ সমাজ মানসের প্রতিচিত্র অঙ্কনের দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'পাগড়ি' গল্পটি রচনা করেছেন। এ গল্পে বাঙ্গালী সমাজ কাঠামোতে নারী সমাজ যে অবহেলিত, লাঞ্ছিত, পুরুষের হাতের ক্রীড়নক, তাদের বন্দীত্ব যে পুরুষ প্রভূদের স্বার্থ ও ইন্দ্রিয়ের অধীন-এসব তিনি অত্যন্ত পরিমার্জিত ভঙ্গিতে ব্যক্ত করেছেন। এ গল্পে খান বাহাদুর মোত্তালেব সাহেব মুসলিম সামন্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি যাদের কাছে বিবাহ একটি

Dhaka University Institutional Repository


সামাজিক প্রথাই শুধু নয়, নারীর মর্যাদার প্রশ্নও সেখানে একান্তই গৌণ। এ প্রসঙ্গে নূরউল করিম খসরু বলেছে– "এ গল্পে একটি অসম সামাজিক বিধি ব্যবস্থার শর্তাধীন হয়ে নারী যে তার স্বীয় সম্মান ও রুচিবোধ থেকে বঞ্চিত, একটি শাসনের শৃঙ্খলে প্রতারিত হচ্ছে, সেই পীড়িতবোধ থেকেই তিনি আলোক্ষেপ করেছেন মধ্য বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্দর মহলে। উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে বিযুক্ত আয়েশী জীবনাচারে অভ্যস্ত খান সাহেবরা নারীর প্রতি লোভী এবং একই সঙ্গে অবিবেচক হয়ে ওঠেন নারীর উপর প্রভাব পতিপত্তি ও শক্তির দাপট প্রতিফলিত করতে সজাগ হয়ে পড়েন।"[৪৬] এই গল্পে এ দেশের একটি বহুল প্রচলিত রীতিনীতিরফলে ছেলে-মেয়েদের যে প্রতিক্রিয়া, তার প্রতিটি স্তর অতি সুক্ষভাবে বর্ণিত হয়েছে। একদিকে বড় হয়ে ওঠা ছেলে-মেয়েদের পাগলি মায়ের প্রতি মমতা ও ভালোবাসা তীব্র হয়ে ওঠে, অন্যদিকে বাপের সিদ্ধান্তের তারা কোন প্রতিবাদ করে না, কিন্তু তাদের প্রতিক্রিয়া এবং মোত্তালেব সাহেবের অন্তর্গত দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছোট্ট একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে অসাধারণ বর্ণনায় চিত্রিত হয়েছে।

'পাগড়ি' গল্পে সামন্ত-বুর্জোয়া সমাজের একজন পৌঢ় উকিলের প্রথম স্ত্রী ও অনেকগুলি বয়স্ক ছেলে-মেয়ে থাকা সত্বেও দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহণের ঘটনা বিবৃত হয়েছে। সামন্ত সমাজে যে কোন বয়সে পুরুষের একাধিক বিবাহের ক্ষেত্রে লোকলজ্জার তেমন কোন কারণ থাকে না। কিন্তু খান বাহাদুর মোত্তালেব সাহেব আধুনিক উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও বুর্জোয়া সমাজে বসবাস করেন। তিনি দুষ্ট সমাজের চিন্তা চেতনার ধারক ও বাহক। বড় বড় ছেলে মেয়েদের সামনে তাদেরই বয়সী একজনকে নিজের স্ত্রী হিসেবে ঘরে তোলার মধ্যে তার সামন্তসুলভ মনোভাবই জয়ী হয়। দ্বিতীয় বিয়ের ব্যাপারে সাময়িকভাবে তার মধ্যে যে টুকু অন্তর্দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায় সেটুক তার বুর্জোয়া সমাজের দ্বন্দ্ব জর্জরিত চিন্তা চেতনার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সামন্ত সমাজই জয়ী হয়েছে।

'কেয়ারা' গল্পের মূল সুর শূন্যতাবোধে অবগাহিত। কোথাও শ্রান্তি নেই। যেন প্রতীক্ষা আর আশা-ভঙ্গ নিয়েই জীবন। এ গল্পের নাম 'কেয়ারা' হলেও মালিদের কেয়ারা বঞ্চিত যাত্রার কাহিনী ; তাদের ব্যর্থ প্রত্যাশা ও তিক্ত অভিজ্ঞতার এক পিঙ্গল আখ্যান। গত পরশু থেকে দু'জন মাঝি এবং তাদের ফাই ফরমাশ খাটা একটি এতিম ছেলে গুড়ের কেয়ারার জন্য অপেক্ষা করছে। মহাজন তাদের সে মতেই আশ্বাস দিয়েছিল। কিন্তু তিনদিন অপেক্ষা করেও তার দেখা নেই। মাঝিরা তাই ঠিক করেছে শূন্য নৌকাসহ ফিরে যেতে। আকস্মাৎ এক মুমূর্ষ বৃদ্ধ এসে নৌকার পাটাতনে আশ্রয় গ্রহণ করে। এ বৃদ্ধকে তাড়িয়ে না দিলেও মাঝিরা তার প্রতি ছিল উদাসীন, বীত-উৎসাহ। এমন কি বুড়োর গোঙানী ও মরণ যন্ত্রণাও তাদেরকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। ক্রমে তারা বৃদ্ধের নদী তীরবর্তী গ্রামে পৌঁছেছে এবং তার প্রাণহীন দেহ গ্রামবাসী ও তার আত্মীয়দের হাতে তুলে দিয়েছে। কিন্তু মাঝিদের দিকে কেউ খেয়াল করেনি। রাতের নিস্তরঙ্গ নদীতে তারা যেমন নীরবে এসেছিল তেমনি আবার সবার অজান্তেই যাত্রা করেছে তাদের গৃহের উদ্দ্যেশে।

Dhaka University Institutional Repository


'কেয়ারা' গল্পে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ মালিদের জীবন বাস্তবতার মাধ্যমে এবং অন্ধকার ও নিঃসঙ্গ পরিবেশকে পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে গ্রহণ করে মানব মনের শ্বাশ্বত উপলব্ধিকেই শিল্পরূপে দান করেছেন। "মহাজনটি সেদিন বলে গিয়েছিল আসবে বলে। সে আসে নাই। হয়তো সে আসবেও না। তবু তার গুড়ের কেয়ারা নেবে বলে পরশু থেকে তারা নোঙর করে বসে আছে। তাদের দু'ধারে অন্য কেয়ারা নৌকা এসেছে তারপর এক সময়ে সে হাটও ভেঙেছে।"[৪৭] সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র অন্যান্য গল্পের মতো এ গল্পেও একটি চমৎকার মৃত্যু চেতনা ক্রিয়াশীল। মৃত্যুই যেন অমোঘ, শূন্যতাই যেন জীবনের সারসত্য এই নিটোল সত্যটিই এ গল্পের মূল উপজীব্য। তাই রাত্রি শেষে, বৃদ্ধের মৃত্যুর পর, আশাহত মাঝিরা নৌকা ছাড়ে গ্রামের দিকে, নিরাশায়, অপ্রাপ্তিতে দোলায়িত তাদের এই ফিরতি যাত্রা। কেয়ারা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র একটি অসাধারণ গল্প। এ গল্পের মেজাজ চরিত্রের তল-অতল অবগাহন ক্রিয়ায়, দার্শনিকতায়, শিল্পবোধ ও অপরিমেয় মানবিক পরিচর্যায় এ গল্পটি বাংলা সাহিত্যে বিরল সংযোজন।

'নিষ্ফল জীবন নিষ্ফল যাত্রা' গল্পে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ "সমাজের বিচিত্র কুটাভাস, বর্ণচোরা স্বভাব, লক্ষণ ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকে সাধারণ আঙ্গিকে তাকে অসাধারণভাবে উদ্ভাসিত করেছেন। তার জীবনদৃষ্টির যুক্ততায় একটি সময়ের সামন্ত সমাজ বাস্তবতাকে সমাজ জীবনের জটিল গ্রন্থিপুঞ্জতকে, স্বার্থপরতা ও নির্বিকারত্বকে তার স্বাভাবিক দার্শনিকতায় অঙ্কিত করেছেন। এ গল্পে তার চিত্রণ-কৌশল অনন্য ইঙ্গিতগর্বীও।"[৪৮]

জীবনের নিরর্থকতা খুব স্পষ্টভাবেই দ্যোতিত হয়েছে এ গল্পে। চেনা-অচেনা শত্রু-মিত্র সবার কাছ থেকে পূর্ব কৃতকর্মের জন্য মাফ চাওয়ার জন্যে পথে বেরিয়েছে মুমূর্ষ সদর উদ্দিন। শেষ পর্যন্ত একটি নিরর্থকতার মধ্য দিয়েই তার জীবনের শেষ হয়। আর এ শেষ পর্যায়ে এসে সদর উদ্দিনের সূচিত হয় সচেতনতা, দীয়ত্ববোধ। "অতঃপর সে অবচেতন মনের অপরাধময় অন্ধকার জগৎ থেকে উপস্থিত হয়েছে আলোর ভুবনে। জীবনের জরাকে তাই সে গ্রাহ্য করেনি, শরীরের অসহযোগীতা সত্ত্বেও বের হয়েছে সবার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে।"[৪৯] বস্তত, জীবনের ব্যর্থকাম, স্ব-আর্তনাদ ও ধূসরতাই এ গল্পের মূল উপজীব্য বিষয়। এ গল্পের সদর উদ্দিন ও আখলাক এ পৃথিবীর দুই জীবন প্রান্তের মানুষ হলেও ব্যর্থতাবোধে যেন একই সূত্রে গ্রথিত।

'মালেকা' গল্পে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্'র সমাজ চেতনা ও জীবন চেতনা অত্যন্ত প্রখর ও প্রদীপ্ত-এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যুদ্ধোত্তর সময়কালে দোদুল্যমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক মন্দাবস্থায় মানস চাঞ্চল্য ও দৈন্যতায় গ্রামের আকালের কারণে শহরে আসা। মালেকার জীবন চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। শ্রেণী বিভক্ত সমাজের বিভিন্ন সুবিধাভোগী মানসিকতায়, চিত্রায়ণ এবং সমাজকে সুক্ষ্ম অথচ কুশলী আঘাতে জর্জরিত মানুষের ধ্বনিকে গভীরভাবে মর্মরিত করেছেন লেখক।

Dhaka University Institutional Repository


# ২. আলাউদ্দিন আল আজাদ

'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' উপন্যাস আলাউদ্দিন আল আজাদ 'প্রেম সংক্রান্ত জিজ্ঞাসা ও তার মীমাংসার সূত্র' আবিষ্কার করেছেন। এ উপন্যাসে তিনি জীবনকে বহু কৌণিক অবয়বে প্রত্যক্ষ করার অভিপ্রায়ে মানুষের অন্তর ও বাহির উভয় ক্ষেত্রেই নিরাসক্তভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবনবৃত্তান্ত থেকে তিনি ব্যতিক্রমী উপকরণ সন্ধান করেছেন। "বৈজ্ঞানিক কৌতূহল এবং শৈল্পিক নিরাসক্তির সন্নিকট উপস্থাপনায় তার উপন্যাসে বিধৃত জীবন হয়ে উঠেছে মনোজৈবিকতার অভিনব সমন্বয়।"[৫০]

'তেইশ নম্বর তৈল চিত্র' বিশ্লেষণমূলক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। কাহিনীর দীর্ঘায়িত ব্যক্তি, বর্ণনার অনাবশ্যক বিস্তার, চরিত্রের বিচিত্রতা এখানে নেই। "ছোটগল্পের উপাদানকে বিশ্লেষণ ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার বক্রপথে টেনে নিয়ে উপন্যাসে রূপান্তরিত করা হয়েছে। মানসিক বিবৃতি ও মানসব্যাখ্যার সূক্ষ্ম বুনানি উপন্যাসকে আকর্ষণ দান করেছে। মনোবিকলন চিত্র চিত্রিত হয়েছে যে সব উপন্যাসে 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' তাদের অন্যতম।"[৫১]

এ উপন্যাসে একজন চিত্র শিল্পীর জীবন আলেখ্য ও জীবন ভাবনাকে কেন্দ্র করে রচনায় রস পরিণতি ঘটেছে ও আদর্শের প্রকাশ শিল্পরূপ লাভ করেছে। জীবন ও শিল্পের এক অকৃত্রিম সমন্বয় ঘটেছে এ উপন্যাসে।

আজাদের প্রথম উপন্যাস 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' পরিপূর্ণতায় অঙ্কিত হয়েছে। এ উপন্যাসে ট্র্যাজেডির সঙ্গে অবস্থার বোধ উন্মোচিত হয়েছে। উপন্যাসটিকে বিশ্ব প্রেক্ষিতে মানুষের আত্ম পরিচয়ের অভিজ্ঞান বলা যায়। যার মাধ্যমে বাংলা উপন্যাসের আধুনিকতায় প্রকাশ ঘটে সমকালের প্রেক্ষাপট একটি তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল।

আলাউদ্দিন আল আজাদ এ উপন্যাসে জীবনের এক গভীর সত্য উন্মোচন করেছেন। ঘটনার এক সূক্ষ্ম গতিতে জাহেদের অভিজ্ঞতার ইতিহাস সমৃদ্ধির মাধ্যেমে তার চরিত্রের বিকাশ সম্ভাব্য পরিণতি লাভ করেছে। "ছবির প্রতি জাহেদের প্রেম শিল্পীরই প্রেম, ছবিও যেন এক শিল্পবস্তু ছবির এই সীমাবদ্ধতা, তার অপূর্ণতাও জাহেদের জীবনে নতুন অর্থে পূর্ণতা লাভ করে। জাহেদের পরিবর্তিত ও পরিপূর্ণ এই জীবনোপলব্ধিতে জীবন প্রেমিক উপন্যাস শিল্পী আলাউদ্দিন আল আজাদ জীবনের এক সামগ্রিক সত্যকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন।"[৫২]

তবে বন্ধু জামিলের বোন ছবির প্রতি জাহেদের প্রেম এ উপন্যাসের মূল বিষয় নয়। একজন যথার্থ শিল্পীর মহৎ প্রেরণা হচ্ছে প্রেম- এই প্রেমই হচ্ছে সকল সৃষ্টির মূল প্রতিপাদ্য। একজন শিল্পী তাঁর জীবনের সকল দুঃখ কষ্ট বেদনা প্রবঞ্চনার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয় অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছার জন্য। প্রেমের এই মহৎ শক্তি উপন্যাসের নায়ক জাহেদকে শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। তার কর্ম স্বীকৃতি পেয়েছে। পুরস্কৃত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository


প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি তথাকথিত সামাজিক মূল্যবোধ জাহেদ তার তিন বন্ধু যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। উপন্যাসের নায়িকা ছবিও প্রেমের পথেই অগ্রসর হয়েছে। ছবির ব্যক্তিগত জীবনের একটি অজানা রহস্য জ্ঞাত হলে একটি সঙ্কটের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই মানস সঙ্কটকে আশ্চর্য দৃঢ়তার সঙ্গে অতিক্রম করেছে জাহেদ। একটি দুর্ঘটনার শিকার হয়ে কুমারী মাতৃত্বের কলঙ্কের কাহিনী ছবি অকপটে বর্ণনা করে জাহেদের কাছে। জাহেদ এ ঘটনাকে স্থির মস্তিষ্কে সামাল দিয়েছে। "পাশ্চাত্য উপন্যাসে মানব মনের রহস্য বিশ্লেষণের যে প্রবণতা দেখা যায় বাংলা উপন্যাসেও তার পরিচয় দুর্নিরীক্ষ নয়। বলা যেতে পারে পূর্ব বাংলার উপন্যাসেও এমন উপন্যাস খুব একটা দেখা যায় না।"[৫৩]

আলাউদ্দিন আল আজাদ 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' উপন্যাসে জীবন ও সমাজকে নতুন পেক্ষণবিন্দু থেকে আবিষ্কার করেছেন। ফলে ও উপন্যাসটি বাংলাদেশের উপন্যাসের ধারায় একটি বিশিষ্ট রচনা রূপ স্থান করে নিয়েছে। বস্তুত নাগরিক জীবনের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রেমের স্বরূপ সন্ধানে ঔপন্যাসিক যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন তা ব্যক্তি জীবনের রহস্যময় দ্বীপের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে বিধৃত হয়েছে।

'কর্ণফুলী' উপন্যাসে যে ঘটনাংশ নিমিত হয়েছে তাতে কর্ণফুলী তীরবর্তী অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিধৃত। একদিকে সাহসী অন্যদিকে স্বপ্নবিলাসী অথচ বিভ্রান্ত যুবক ইসমাইল এ উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। আর্থিক দৈন্যতার কারণে সে ব্যবসায়ী রমজানের দলে যোগ দিয়েছে। অতঃপর রমজান ও ইসমাইল লাল চাচার মেয়ে রাঙামিলাকে হাত করার জন্য কাসালং চলে যায়। রাঙামিলাকে ইসমাইলের ভালো লেগেছে। এদিকে রাঙামিলা এক চাকমা ছেলেকে ভালোবাসে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইসমাইলের এই নতুন প্রণয়াবেদন রাঙামিলার মনে এক মিশ্র অনুভূতির সৃষ্টি করে। ওদিকে ইসমাইলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল নিজ গ্রামের জলির সঙ্গে। ইসমাইলের হাত থেকে মুক্তির জন্য চাকমা ছেলে আর রাঙামিলা পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে কিন্তু ইসমাইল তাদের অনুসরণ করে। আর গোপনে সবাইকে অনুসরণ করে ব্যবসায়ী রমজান ও তার অনুচরেরা। সঙ্কট-মুহূর্তে রমজানের কবল থেকে রাঙামিলা ও চাকমা ছেলেকে ইসমাইল উদ্ধার করে। ওদিকে জলির বিয়ের প্রস্তাব তোলে ইসমাইল তাকেই বিয়ে করে নেয়। কিন্তু তার জীবনে শান্তি আসে না, দূর সমুদ্রের আহ্বান তাকে মাতোয়ারা করে তোলে। তার মনে দোলায়িত হতে থাকে হাজারো স্বপ্ন। সারেঙ হবে সে। দেশ-দেশান্তর ঘুরে ঘুরে সমুদ্র পাড়ি জমাবে। আর তার এই কল্পনা বাস্তবায়নের জন্য-এ কদিন সত্যি সত্যিই সে নলি তৈরী করে দূর সমুদ্র পাড়ি জমায়। তীরে একা দাঁড়িয়ে থাকে জলি। সংক্ষেপে এই হলো 'কর্ণফুলী' উপন্যাসের কাহিনী।

Dhaka University Institutional Repository


আলাউদ্দিন আল আজাদ 'কর্ণফুলী' উপন্যাসে একটি বিশেষ আঞ্চলিক পরিপ্রেক্ষিতকে মানবাত্মার স্বাধীনতা ও বৈশ্বিক অনুভূতিতে প্রতিস্থাপন করেছেন। এ উপন্যাসে তিনি চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জীবন কাহিনী ফুটিয়ে তুলেছেন। দারিদ্র্যের কারণে জীবনের স্বাভাবিক পথে চলতে না পারা মানুষের গীতিআলেখ্য এ উপন্যাস। তাই তিনি সমতল ভূমির বাঙালী ও পার্বত্য অঞ্চলের চাকমা ও অন্যান্য পাহাড়ী উপজাতি মানুষের জীবন চিত্র অংকন করেছেন এ উপন্যাসে।

আলাউদ্দিন আল আজাদ 'কর্ণফুলী' উপন্যাসে তীরবর্তী অঞ্চলের উদার ও বিচিত্র জীবনধারা অঞ্চলের চেয়ে-আঞ্চলিক জীবন পরিবেশের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য ঔপন্যাসিক চেতন-অবচেতনের রূপায়ন করেছেন। "কর্ণফুলী' উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র সরল,অজটিল ও বৈচিত্রহীন কর্ণফুলী তীরবর্তী জন জীবনের এবং রেখার সমন্বয়ে চরিত্রগুলো বিকশিত হয়ে ওঠেনি। ইসমাইল কিছুটা ব্যতিক্রমী হলেও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত নয়। রমজান আলী, জুলি, লালন, ধলা বিবি, নীলমনি, রাঙামিলা প্রভৃতি চীরত্র গতানুগতিক। ঘটনা বয়নে যেমন, ঠিক তেমনি চরিত্র নির্মাণেও লেখক আতিশয্যমুক্ত ছিলেন না।"[৫৪] উপন্যাসের অন্তিম পর্যায়ে দেখা যায়, "জুলির করুণ-কাতর মিনতি ও বক্ষবিদারী হা-হুতাশন উপেক্ষা করে ইসমাইল জাহাজযোগে অজানা গন্তব্যে পাড়ি দিচ্ছে। সারেং হবার যে স্বপ্নবিলাস সে তার আঞ্চলিক জীবন পরিবেশ থেকে অর্জন করেছে, চরম জেদ আর একাগ্রতার মাধ্যমে অবশেষে তা পূর্ণতা পেয়েছে।"[৫৫]

আলাউদ্দিন আল আজাদের 'ক্ষুধা ও আশা' পটভূমি পঞ্চাশের মহন্তর (১৯৪৩) থেকে দেশ বিভাগ (১৯৪৭) পর্যন্ত বিধৃত। কিন্তু ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের পরিসমাপ্তির কোন উল্লেখ এ উপন্যাসে অনুপস্থিত। তবে দেশ বিভাগকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনের যে জটিল প্রসঙ্গ 'ক্ষুধা ও আশা'য় বিধৃত হয়েছে, তা ব্যক্তি ও সমষ্টির সমগ্রতায় এক মেধাবীরূপ লাভ করেছে। "আলাউদ্দিন আল আজাদ সময় ও ইতিহাসের দ্বন্দদীর্ণ সত্যকে অন্তর্ময় অবলোকনের বিষয়ে পরিণত করেছেন। কৃষি জীবনমূল থেকে সপরিবারে উন্মূলিত জোহার আত্মসন্ধান ও জীবন সন্ধানের দর্পণে অভিব্যক্ত হয়েছে জটিল ও ক্ষতবিক্ষত কালের অভিজ্ঞতাপুঞ্জ।"[৫৬]

হানিফের কৃষি নির্ভর সাংসারিক বৃত্ত দুর্ভিক্ষের আঘাতে একসময় নিঃস হয়ে পড়ে। গার্হস্থ্য জীবনের সেই সীমিত সাধ্যের মধ্যেও পুত্র জোহাকে হানিফ ও ফাতেমা লেখা-পড়া করাতে চেয়েছিল। জোহার অভিজ্ঞতার চোখ খুলতেই সে বুঝতে পারে সবকিছু। বিভাগোত্তর কলোনিশাসিত সমাজের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার জটিল বিকারগ্রস্থতা জোহা পরিবারের মতো অনেকেই ছিন্নমুল ও উদ্বাস্তু করে দেয়। শহরের অচেনা প্রতিবেশে অস্তিত্বের নূন্যতম দাবি মেটানো একমাত্র জোহা ছাড়া বাকী তিনজনই নিমজ্জিত হয় অথবা বিনষ্টির অন্ধকার। "বিনষ্ট সমাজ, বিনষ্ট আর্থ-রাজনৈতিক এবং বিনষ্ট মানুষের নিয়ন্ত্রনে বিপর্যস্ত জীবনের গোটা ছবির উপন্যাসে বিন্যস্ত হয়েছে। জোহার বহিঃসংগ্রাম ও অন্তঃসংগ্রামের মাধ্যমে উন্মোচিত হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository


একটা সময় খন্ডের অসংখ্য মানুষের জীবনরূপ।"[৫৫] এই উপন্যাসের সামগ্রিক ব্যাপ্তিতে কোন একক কাহিনী জমাট বুনোনিতে উজ্জল হয়ে প্রাধান্য লাভ করেনি। "ব্যক্তিমনের বিচিত্র গতি পরিবর্তন, কালের চক্রতলে মানবাত্মার আর্তনাদ, ইতিহাসের অমোঘ আবর্তনে বিপর্যস্ত মনের অজস্র কাতরতা প্রোজ্জল হয়ে ফুটে উঠেছে। ব্যক্তিমনের অনুভাবনার অনুপ্রবেশ আখ্যানের গাল্পিক সংলগ্নতা দূরান্বয়ী হয়েছে, ঐক্যবদ্ধ করে নিয়েছে।"[৫৮]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর কালের বাঙালি জীবনের জটিল জটগুলো আলাউদ্দিন আল আজাদ 'ক্ষুধা ও আশা' উপন্যাসের কেন্দ্রভূমিতে স্থাপন করেছেন। কখনো ব্যক্তির দর্পনে, কখনো সমষ্টির দর্পনে জীবনকে অবলোকন করেছেন তিনি। বিভিন্ন চরিত্রের উচ্চারণে তাঁর জিজ্ঞাসার একেকটি সত্য অভিব্যক্তি হয়েছে। "ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে আমরা বাস করছি। আমাদের জন্মটা হয়ত আকস্মিক, তবু অস্তিত্বটা তো সত? তার মানে যুগচক্রের মধ্যে নিজেদের অজ্ঞাতেই লূতাতন্তুর মতো আমরা জড়িয়ে পড়েছি। প্রাচীন কালে মহাবাহু নৃপতিদের রাজ্য লিপ্সার দরুন বহু নগর-জনপদ-দেশ-রাজ্য-জাতি ধ্বংস হয়েছে, কিন্তু এখন আমরা যা দেখছি তার তুলনা কিছু নেই। এ এক প্রচন্ড অগ্ন্যুৎপাত খন্ডপ্রলয়। এই প্রলয়ের আগুনের আভায় আমাদের পরস্পরের মুখ চিনে নিতে হবে। চিনে নিতে হবে কে আমার বন্ধু, কে শত্রু।"[৫৯] অভিজ্ঞতা ও দুঃখের আগুনে দগ্ধ হতে হতে জোহার কাছে দুঃখই হয়ে ওঠে জীবনের একান্ত সঙ্গী। জোহার পিতা হানিফের গাড়িচাপা পড়ে মৃত্যুর সংবাদ লিনা তাকে বলেছিল ঃ "দুঃখকে ভয় করিসনে। দুঃখই আসল বন্ধু ; সে তার দহনে পুড়িয়ে আমাদেরকে খাঁটি সোনা করে তোলে।"[৬০] কিন্তু উপন্যাস বিধৃত কালের বিকার ও অসুস্থতার সর্বগ্রাসী রূপ কেবল জোহাকে নয় তার সমগ্র পরিপার্শ্বকেই স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গতে যন্ত্রণায় বৃত্তাবদ্ধ করে রাখে।

আলাউদ্দিন আল আজাদ 'ক্ষুধা ও আশা' উপন্যাসের আধুনিক জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত উল্লেখযোগ্য চরিত্র অঘোর চ্যাটার্জি। ভারত বিভক্ত হ'য়ে দু'টি দেশ হবার আশংকায় তার ক্ষেদোক্তি ঃ ".....এর মূল্য আমাদের দিতে হবে। কিন্তু ধ্বংস ও মৃত্যুর শেষে মুক্ত স্বাধীন ভারতে বাঙালী পশু হয়ে থাকবে-এ যে স্বপ্নেও ভাবতে পারিনা।"[৬১] এ বেদনাবোধ থেকেই তিনি প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী ও এ উপন্যাসের নায়ক মোহাম্মদ আলীর উদ্দেশ্যে ইতিহাস স্বরূপে বিশ্ববিধানের স্বরূপে উচ্চারণ করেছেন ঃ "ইতিহাস পড়ে একটা জিনিস বুঝেছি, ইতিহাসের একটা নিজস্ব গতি আছে তাতে ব্যক্তি নিজেকে জড়িয়ে চলে মাত্র ; চেষ্টা করলে সেই গতিকে বিভ্রান্ত বা বিলম্বিত করতে পারে কিন্তু রোধ করতে পারে না।"[৬২]

'ক্ষুধা ও আশা' অনেকটা সূক্ষ্ম টানে ঘটনার বিন্যাস ঘটেছে। কখনো কখনো অতীত ও বর্তমান অঙ্কিত হয়েছে সমান্তরাল রেখায়। বর্তমান বহির্বাস্তবতা সংলগ্ন আর অতীত উৎসারিত হয়েছে মনোজাগতিক স্মৃতি রোমান্থনে। জোহার প্রসারিত দৃষ্টি, আত্ম সন্ধানের সঙ্গে ভগিনী জহুকে খুঁজে পাবার ব্যাকুলতাএবং দেশ সন্ধানের তীব্র আকুতি অভিন্ন বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। "জোহার অস্তিত্ব-সংগ্রামের ব্যর্থতার সঙ্গে পরস্পরিত হয়েছে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের ব্যর্থতা। পতিতা পল্লীর অন্ধকারে জহুকে সন্ধান করে ফেরার মধ্যে ধর্ষিত, বিপন্ন দেশ-সন্ধানেই যেন প্রতীকায়িত হয়েছে।"[৬৩]

আলাউদ্দিন আল আজাদ কিশোরকাল থেকেই সমাজ-জীবন ও পরিবেশকে অবলোকন করে তার সাহিত্যে বিন্যস্ত করেছেন। এ প্রসঙ্গে আজহার ইসলাম বলেছেন- "আলাউদ্দিন আল আজাদ তাঁর শিল্পী জীবনের প্রথম পর্বে বাংলার সমাজ অভ্যন্তরস্থ মানুষের জীবনে বিরুদ্ধ পরিপার্শ্বের যে নির্মম ছোবল লক্ষ্য করেছেন, তার সেই জীবন ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ তাকে তাকে তখন নিশ্চিতভাবেই একজন সমাজমনস্ক শিল্পী হিসেবে গড়ে তোলে।"[৬৪] পঞ্চাশের দশকের শেষ পর্ব থেকে তার ছোটগল্পের দ্বিতীয় উত্তরণ শুরু হয়। একজন সমাজ সচেতন শিল্পী হিসেবে তাঁর সাহিত্যে মানবমনের অন্তর্বিশ্লেষণ ও ফ্রয়েডীয় যৌনতত্ত্বের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত করেছেন তিনি। তাতে তাঁর শৈল্পিক প্রয়াস আধুনিক জীবনবাদের সঙ্গে অনায়াসে সম্পৃক্ত হয়। আজাদের এই ক্রমসঞ্চরণশীল শৈল্পিক অভিমাননার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, তাঁর প্রথম দিকের রচনা 'জেগে আছি' (১৯৫০)'ধানকন্যা' (১৯৫১) গ্রন্থে শ্রেণীচেতনার জাগরণ ফুটে উঠেছে। পরবর্তী পর্যায়ে 'উজান তরঙ্গে'(১৯৫৯) গ্রন্থে সমাজ-সম্পর্কের বাধানকন্যাস্তবতার পাশাপাশি মনোবিকলন তত্ত্বের বৈচিত্র্য উঠে এসেছে। এ প্রসঙ্গে ড. এসএম লুৎফর রহমান বলেছেন-"প্রথম পর্যায়ের রচনা 'জেগে আছি', 'ধানকন্যা'- গ্রন্থে মনোবিকলন ও যৌনতাকে পরিহার করে এ দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পটভূমিতে যথার্থ রসোত্তীর্ণ গল্প রচনা সম্ভব তার প্রমাণ ড. আজাদের ঐ তিনটি গ্রন্থে বিদ্যমান।.....তাছাড়া প্রত্যেকটি গল্পের পটভূমিতে হিসেবে নেপথ্য রয়েছে, সমকালীন বাস্তব অবস্থা ও জীবন্ত নর-নারী ; যারা ঐ সব গল্পের নানা ধরণের চরিত্ররূপে উপস্থিত।"[৬৫]

আলাউদ্দিন আল আজাদ তাঁর ছোটগল্পে এক সমাজ-সচেতন শিল্পী হিসেবে নিগূঢ় সমাজ সত্যের বিন্যাস ঘটিয়েছেন। তাঁর গল্পের চরিত্রসমূহ দূর গন্তব্যের কেই নয়,আশপাশেরই চেনা মানুষ। "এসব মানুষের চেনামুখের আড়ালের স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে পর্যবেক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতায় আমাদের এ অভিজ্ঞতা সরাসরি অর্জিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় গল্পগুলোর ভেতরকার চালচিত্র ও চরিত্র সমূহের চাল-চলনে।"[৬৬]

Dhaka University Institutional Repository


আলাউদ্দিন আল আজাদের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'জেগে আছি'। এ-গ্রন্থের 'একটি সভ্যতা' গল্পের নায়ক পেশায় রাজমিস্ত্রী। মেঘনায় পুল নির্মাণে নিয়োজিত বাঙালী রাজমিস্ত্রীদের সর্দ্দার সে। তার বন্ধু রহমান ভবঘুরে বেকার। একদিন রহমান বন্ধুর অনুগ্রহে কাজ পেয়ে উপার্জনক্ষম হলেও মুজুরী বৃদ্ধির দাবীতে, রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত থাকার অভিযোগে তার জেল হয়। বন্ধুকে ধরিয়ে দিয়ে রহমান কন্ট্রাক্টরের সঙ্গে গোপনে চুক্তি করে সর্দার মিস্ত্রী হয় সে। জীবন ও জীবিকার এই পরিবর্তনের ফলে সে অত্যাচারী শোষকে পরিণত হল। অভাব ও রুগ্নতর সুযোগে কারাবাসী বন্ধুর অতি প্রিয় 'কাঠের নকশা' কেনার চেষ্টা করে বন্ধুপত্নীর কাছে অপমান হয়ে ফিরে এলো। অর্থের উপর দারিদ্র্য বিজয়ী হল।

'কয়লা কুড়ানো দল' গল্পে সর্বহারা শ্রেণীর কিশোর-কিশোরী শিশু শ্রমিকের জীবন সংগ্রামের ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ গল্পের সোনাভান রূপবান, গেদু, লালু, কানা, মনু ট্রেনের পরিত্যক্ত পোড়া কয়লা কুঁড়িয়ে বেঁচে এবং সেই পয়সায় সংসার চালায়। গল্পের মধ্যে কিশোর জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও দুঃখ-কষ্ট লেখক নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এ গল্পের দুর্ধর্ষ চরিত্র কিশোর লালু, রেলওয়ে স্টেশনের কনস্টেবল সুবেদ আলীর মত কনস্টেবল, লালু, রূপবান, মনু প্রভৃতির কয়লা কুড়ানো বালক-বালিকা নজরে পড়ে। একটি জীবন্ত সামাজিক সত্যই এ গল্পের মূল ভিত্তি।"[৬৭]

'কয়েকটি কমলালেবুতে সংগ্রামী কৃষক-কর্মী ও তৎকালীন গোপন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ইলা মিত্রের কারাবাস কালীন অসুস্থতা এবং তার প্রতি জনগণের অনুরাগ ও ভালোবাসার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। এ গল্পে ১৯৫০ সালে রাজশাহী জেলার নাচোল থানার সাঁওতাল কৃষক বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে বন্দী হওয়া ইলা মিত্রকে দেখাতে যান চিত্র শিল্পী মুর্তজা। পরে জানতে পারেন যে, তিনি কমলালেবুর রস ছাড়া আর কিছুই খেতে পারেন না। কিন্তু শিল্পী মুতইজা কমলালেবু কেনার টাকা সংগ্রহ করতে বিভিন্ন জনের দ্বারস্থ হয়ে ব্যর্থ হয়। অবশেষে কমার্শিয়াল আর্টের তে-রঙা লেবেল এঁকে টাকা সংগ্রহ করে। বস্তুত, এ গল্পে সংগ্রামী নেত্রী ইলা মিত্রের প্রতি অনুরাগেরই বহিঃপ্রকাশ দেখানো হয়েছে গল্পের মাধ্যমে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানব জীবনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার চিত্র নিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন।

'মহামুহূর্ত' গল্পটির পটভূমি গড়ে উঠেছে জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে ক্ষেতমজুরের বিদ্রোহ নিয়ে। এ গল্পের রহিম বখশ, মজিদ, শুকু প্রমুখ জমিদার বাড়ির মৌসুমী কামলা বা ধানকাটা ক্ষেতমজুর। তারা কাজের বিনিময়ে এতকাল ধান পেলেও এবার তারা তার না বলে প্রচারিত হয়েছে। এবার নাকি "ধানের বদলা একটা কাজের ছিলিপ দিবে। নিজেদের জিলাত গিয়া টেহা নিতে রাজী তাদের টেহা দিয়া বিদায় কইরা দিল।"[৬৮] কিন্তু এতে ক্ষেত মজুররা রাজী নয়। তারা জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। জমিদার বাড়ির লাঠিয়াল বাহিনী, পাহারাদার, পাইক-পেয়াদা প্রভৃতি উপেক্ষা করে রাতে আক্রমণ চালায়ে জমিদার

Dhaka University Institutional Repository


বাড়ি, জমিদারের ক্ষেত-খামার দখল করে নিল। যুদ্ধ জয়ের পর তারা "কতক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়ালো চিনচিন করছেন বুক। এই মাটি, এই আলো, এই হাওয়া, এই আকাশ সবাকার। শত্রুর আক্রমণ থেকে কতক্ষণ বাজিয়ে রাখা যাবে ঠিক নেই, তবু এখানে নেমে এসেছে একটা পবিত্রতা, মহত্ব, মানবতা, প্রাণের বিস্তৃতি, জীবন। অনেক কালের কলুষ কালিমা আজিকার সূর্যের প্রথম কিরণ স্পর্শে। আর্তনাদে ভরে গেছে, এখানে নেমে এসেছে এক মহা পৃথিবী। একে বাঁচাতে হবে সকল আক্রমণ থেকে, নখর থেকে। এখানের পৃথিবীকে রক্ষা করতে হবে, চোখ দিয়ে, বুক দিয়ে, রক্ত দিয়ে, প্রাণ দিয়ে।"[৬৯]

এমন সময় মধু দৌড়ে এসে খবর দিল জমিদারের সৈন্যরা আসছে। সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে মরণপন লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হলো। সবার আগে বল্লম হাতে এগিয়ে গেল বৃদ্ধ রহিম বখশ্। এ-গল্পে আলাউদ্দিন আল আজাদ জমিদার ভূ-স্বামীর শ্রমিকদের বিদ্রোহের কাহিনী চিত্রিত করেছেন। জমিদারের বিরুদ্ধে এতদিন নিষ্পেষিত ক্ষেতমজুররা লড়াই করেছে। কারণ, তারা গোপন চিঠির মর্মার্থ বুঝেছে। তাতে লেখা আছে-'ভাইগণ আর একটুও দেরী করো না। জালিমের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নাও, অফিস দখল কর, কারখানা দখল করো, গুদাম কেড়ে নাও, জমি কেড়ে নাও।' ফসল তোলার মৌসুমকে পটভূমি করে কৃষক জীবনের এই বৈপ্লবিক আদর্শায়ন আটচল্লিশ সালের পরিপ্রেক্ষিতে জমিদারতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক অসামান্য সংগ্রামী চেতনার স্বাক্ষর এ-গল্প।

'ছুরি' গল্পে লেখক পঞ্চাশের দশকের আম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের হানাহানি-মারামারির পশ্চাতে যে উভয় সম্প্রদায়ের অনেকেই একে অন্যকে জীবন দিয়ে রক্ষা করেছিল, তারই প্রেক্ষ্যপট তুলে ধরেছেন। সেকালের সামাজিক ব্যাতাবরণের পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত এ-গল্পের ঐতিহাসিক মূল্য অসাধারণ।

'শিকড়' গল্পে আলাউদ্দিন আল আজাদের শ্রেণী সচেতনতা আভাসিত হয়েছে। তারা বুঝতে পেরেছিল "দেশত্যাগের মধ্যে মজুর-কৃষকের মুক্তি নেই, স্বচ্ছলতা কিংবা স্বাচ্ছন্দ্য নেই বরং তা আছে দেশে থাকার মধ্যে, মুসলিম ও হিন্দু সর্বহারা শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মধ্যেই এই বক্তব্য সেদিন সামাজিক-রাজনৈতিক সুস্থ জীবন ফিরে পাবার বিশেষ সহায়ক ছিল।" [৭০]

'রোগমুক্তির ইতিবৃত্ত' গল্পটিতে আদর্শের জন্য অকাতরে প্রাণদানের কথা বলা হয়েছে। এ গল্পে মনীষা তার ভালোবাসার মূল্য দিতে দেশত্যাগ করেনি। বরং সে উত্তম পুরুষের সঙ্গে পরিচয় হবার পর সে তাকে দেশে ফিরে যেতে অনুরোধ করে বলেছে-"ওটা আপনার দেশ, আপনার জন্মভূমি। সেখানে জীবন-যাপন করবার অধিকার আপনার রয়েছে। কারা রায়ট করেছে আপনারা জানেন, কারা কিসের জন্য মুসলমান-হিন্দুদের মধ্যে ভেদাভেদের সৃষ্টি করেছে, তাও হয়ত অজ্ঞাত নয়। আপনারা রুখে দাঁড়াতে পারলেন না।"[৭১] উত্তম পুরুষ রুখে দাঁড়াতে পারেনি। মনীষার পরামর্শে সে দেশে ফিরে যায়নি। বরং রোগমুক্তির পর নিজ কর্মস্থলে ফিরে আসে এবং কাজে যোগ দেয়। তাবপর একদিন মনীষার কথা মনে পড়ে-হাসপাতালে গিয়ে শোনে-"মনীষা নেই। হাসপাতালে

Dhaka University Institutional Repository


নার্স ধর্মঘটে যোগ দেবার অপরাধে তাকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়। জেলের মধ্যেও সে স্থির থাকেনি। সেখানেও সে কয়েদীদের স্বার্থ রক্ষার দাবীতে 'হাঙ্গার স্ট্রাইক' করে এবং ঠিক ত্রিশ দিনের দিন হার্টফেল করে মরে।"[৭২] আর এ-ভাবেই কাকার কথিত থাইসিস রোগরূপে দেশপ্রেম থেকে মুক্তি হয় মনীষার। রোগমুক্তির এই ইতিবৃত্তে লেখক সমকালীন সাধারণ মানুষের দাঙ্গা ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মনোভাবের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

'মলাট' গল্পে লেখক নারী জীবনের অসহায়তা ও ব্যক্তি জীবনের দ্বন্দ্ব সংঘাতের চিত্র অঙ্কন করেছেন। এ-গল্পে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় নায়িকা হাজেরাকে বিদ্ধ করেছে। গ্রামের মানুষ কাদের চাকরীর সুবাদে শহরে বসবাস করে। সে প্রমোশনের আশায় চিরকুমার নারী লোভী বড় সাহেবকে বাসায় দাওয়াত করে এনে হাজেরাকে আপ্যায়নে পাঠায়। তাদের গল্প করার সুযোগ দিয়ে কাদের সিগারেট আনতে যায়। এদিকে "সাহেবটার খ্যাক খ্যাক হাসির শব্দ হাজেরার কানে বাজতেই তার শরীরের সমস্ত লোম রি-রি করে উঠেছে। তবু বায়ু ওড়া চায়ের কাপ, উত্তপ্ত কেটলী, চীনে মাটির তন্তুরীর পরিবেশে পুরো দু'টো ঘন্টা তার সামনে বসে থাকতে হলো চেয়ারে। বসে থাকতে হলো সলজ্জ-নম্র মুখে। চেহারায় মধুরতা জাগিয়ে, খুশি হওয়ার ভাব ফুটিয়ে লোকটার নীরব দৃষ্টি ব্লাউজ ভেদ করে তার হৃদপিণ্ডে বিঁধছে : তার গায়ের মাংসে আলপিন ফুটিয়ে গেছে বারবার, তবু সে নড়তে পারেনি।"[৭৩] বড় সাহেব কাদেরকে প্রমোশনের জন্য কোন চিন্তা না করার পরামর্শ দিয়ে যাবার সময় বলে যান-'মিসেসকে একবার আমার বাসায় পাঠিয়ে দিও। তোমার ব্যাপারটা সম্বন্ধে যা লেখার আছে, ঠিকঠাক করে তার হাতে দিয়ে দেবো।' পরদিনই বড় সাহেব কাদেরের হাত দিয়ে হাজেরাকে একটা তাঁতের শাড়ী উপহার পাঠায়। এ কথা জানার পর অবাক হলো হাজেরা- 'বাক্যস্ফুরণ হলো না হাজেরার মুখ থেকে। কঠিন দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে বসে পড়ল খাটের এক কোণায়। মগজটা মোচড় খেয়ে উঠলো, পাশের বাসার অফিসের মেয়ে সুফিয়ার কথা মনে পড়ল, সে কলেজে পড়ে, অবিবাহিতা, আদর্শবাদী। সাহসী, সংগ্রামী হাজেরার মতো চুপ করে সব কথা, সব কাজ মেনে নেয়ার মেয়ে নয় সে। অথচ সেও সমাজের মার থেকে রেহাই পায়নি। গতরাতে তাকে ধরে নিয়ে গেছে পুলিশে। আরবী হরফে বাংলা লেখা সম্পর্কিত কি এক ব্যাপারে।' এ ব্যাপারে তার বাপের চাকরীও গিয়েছে। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় নারী জীবনের এই সামগ্রিক অসহায়তা হাজেরাকে বিদ্ধ করে। সে স্বামীর টেবিলের উপর রাখা একটি ম্যাগাজিনের মলাটের অর্ধ-উলঙ্গ নারীর বেহায়া ভঙ্গিতে দাঁড়ানো দৃষ্টির সঙ্গে বড় সাহেবের সামনে নিজেকে উপস্থাপনের তুলনা করে।

'ধানকন্যা' গ্রন্থের 'মেঘনা' গল্পে লেখক দেশ-বিভাগ পরবর্তী হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশ ত্যাগের কারণ অনুসন্ধান এবং তার প্রতিরোধে উৎসাহ প্রদান করেছেন। এ-গল্পের নায়ক সেকান্দার আলী। উত্তাল মেঘনা নদীর জেলে মাঝি সেকান্দার আলী, রমজান, ভগবান মেঘনার স্রোতে নাও ভাসিয়ে মাছ ধরে বেড়ায়।

Dhaka University Institutional Repository


দেশ-বিভাগের পরেও তাদের গ্রাম ছিল শান্ত নিরাপদ। সেখানে সবাই মিলে সম্প্রদায়কে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটতে দেয়নি। জেলে পাড়ার বাইরে থেকে যে গণ্ডগোল বাঁধাবার কিছুটা চেষ্টা করা হয়েছিল তা প্রতিহত করেছে। সেই গ্রাম থেকে রাতের অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে নৌকার মাঝি গণেশ স্ত্রী-পুত্র সহ সব কিছু নিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল এ-সংবাদ জানার পর সবার মাঝে অসন্তোষ সৃষ্টি হল। ভগবান জেলে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। শেষ পর্যন্ত গণেশের বন্ধু রমজান স্বীকার করলো অপরাধ গণেশের নয়, তার। সদু ব্যাপারীর ইচ্ছা গণেশের জায়গায় শেখ মাঝিকে বসাবে। ব্যাপারীর যন্ত্রণায় রমজানই গণেশকে বাড়ি দখলের, এমনকি প্রাণ নাশের ভয়ও দেখিয়েছিল। তাই বাধ্য হয়েই গণেশ দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছিল। সেকেন্দার মাঝি চপেটাঘাত এবং ভর্ৎসনা করল রমজানকে। শেষ পর্যন্ত পরিণতি মিলনাত্মক।

আলাউদ্দিন আল আজাদ তার 'ধানকন্যা' গল্প গ্রন্থের গল্পসমূহেও অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত এবং আর্থ-সামাজিক ও পারিবারিক জীবনচিত্রের ছবি অঙ্কন করেছেন। এ গ্রন্থের বিভিন্ন গল্পে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার যে বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন তার মধ্যে তৎকালীন গ্রামীণ সমাজ ও সমাজ ব্যবস্থায় প্রচলিত জমিদারী প্রথার কুপ্রভাব, ভূ-স্বামী শ্রেণীর অর্থ ও নারী লোলুপতা, বিলাস ব্যাসন এবং কৃষিজাত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থের ভোগবাদীতা সুস্পষ্ট। গরীব কৃষকের রক্ত শোষণ করে ভূ-স্বামী শ্রেণীর অর্থনৈতিক বিশ্বাস আলাউদ্দিন আল আজাদের অধিকাংশ গল্পে মূল প্রতিপাদ্য হয়ে উঠেছে। ঔপনিবেশিক আমলের সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক গতিধারার ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা।

আলাউদ্দিন আল আজাদ 'উজান তরঙ্গে' গল্পগ্রন্থের 'উজান তরঙ্গে' গল্পের পটভূমি হিসেবে দেশ-বিভাগ, দাঙ্গা ও সমকালীন আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে ধর্ষিতা যমুনা স্বামী পরিত্যাক্তা, সমাজচ্যুতা এবং পতিতা। তার হারাবার আর কিছুই নেই। এদিকে ভাসমান জুলমতের ও নেই কোন পিছুটান। তাই অনায়াসেই যমুনাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে নতুন কোথাও ঘর বাঁধার পরিকল্পনা করে জুলমত। এখানে সমাজ কিংবা ধর্মীয় সংস্কার কোন বাঁধা হয়ে দাড়াতে পারে না। ওরা আদিম মানব-মানবীর মত ভস্মস্তুপে দাঁড়িয়ে নতুন জীবন গড়ার স্বপ্ন দেখে। সমালোচকের ভাষায়, "এ গল্প জীবনের প্রবাহ মানতীর ইঙ্গিত বহন করে। যে নারী পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থার কাছে লালসার শিকার, প্রতিদিন পন্য হিসাবে চিহ্নিত হয় তার কাছেও অবশেষে পলো নীড় রচনার আশ্বাস। তার উচ্ছৃংখল উদ্দাম', রুগ্ন জীবন এক পরম মুহূর্তে স্থায়ী ঠিকানা খুঁজে পায়।"[১৪] এ-গল্পে লেখক বিভাগোত্তর বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের জীবনে নেমে আসা সামাজিক নিম্নশ্রেণীর চিত্র অঙ্কন করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository


## ৩. শওকত ওসমান

'জননী' উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে মহেশডাঙ্গার কৃষক আলী আজহার খাঁ ও তার স্ত্রী দরিয়া বিবির পারিবারিক জীবন চিত্র গ্রহণের মধ্য দিয়ে। স্ত্রী ছাড়াও আজহারের সংসারের শিশু সন্তান আমজাদ শিশু কন্যা নঈমা এবং আশ্রিতা খালা আসেকজান রয়েছে। আজহার খাঁর পারিবারিক ঐতিহ্যে ওহাবীর বীরত্ব ও সাহসিকতার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস থাকলেও দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে আজ সে সাধারণ নিম্ন কৃষকে পরিণত হয়েছে। কৃষি ছাড়াও আজহার খাঁ রাজমিস্ত্রির কাজ করত। তাই তাকে অভাব-অজন্মা-বন্যার সময় গ্রাম ছেড়ে শহরে মিস্ত্রির কাজে মাঝে মধ্যে যেতে হতো। আজহারের অনুপস্থিতিতে দরিয়া বিবি নানা বুদ্ধিতে সংসার চালাতো। এমন ই একটি দুঃসময়ে আজহার খাঁ বাড়ি চলে যায়। আজহার খাঁর ফুফাত ভাই উঠতি ধনী ব্যবসায়ী ইয়াকুব আত্মীয়তার সূত্রে দরিয়া বিবির সংসারে আনাগোনা করে। লম্পট ও ক্লেদাক্ত চরিত্রের অধিকারী ইয়াকুব অচিরেই দরিয়া বিবির দারিদ্র্যের সুযোগে কুস্বার্থ-চরিতার্থের পথ বেছে নেয়। আলী আজহারের মৃত্যুর পর দরিয়া বিবি সন্তান-সন্ততি নিয়ে দারিদ্র্য দগ্ধ ও অসহায় হয়ে পড়ে। নানা সাহায্যের অযুহাতে ইয়াকুব তার নারীত্বের চরম সর্বনাশ ঘটিয়ে দেয়। 'জননী'র পদস্খলনে দরিয়া বিবির প্রথম পক্ষের সন্তান মোনাদিরও অন্যত্র চলে যায়। অবশেষে তাকে নিজেই ধাত্রী-প্রসূতি হয়ে জন্ম দিতে হয় একটি নবজাতকের। কিন্তু মায়ের পবিত্রতা হননের বজ্রদাহ জননী দরিয়া চরম অন্তর্দ্বন্দ্বে, ঘৃণায়, লজ্জায় আর আত্ম-গ্লানিতে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। একটি করুণ বেদনার্ত আবহের মধ্যে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এই প্রসঙ্গে অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "এই সর্বংসহা সন্তান স্নেহাতুরা নারীর চরম আত্ম নিগ্রহের বেদনা করুণ আলেখ্য 'জননী'।"[৭৫]

'জননী'র কাহিনী উঠে এসেছে অভাব-অনটন কীভাবে একটি চাষী পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর গভীর এবং মধুর সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে, একজন জননী কিভাবে মাতৃত্বের পবিত্রতা রক্ষা করতে গিয়ে অপারগত হয়ে ওঠে, সাম্প্রদায়িকতা ও শ্রেণী সংঘাত কীভাবে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির মধ্যে বৈরিতার জন্ম দেয় এবং অর্থনৈতিক সংকটের তীব্রতা মানুষের মধ্যে কিভাবে বাস্তব রূপ লাভ করে তার চিত্র। মোটকথা গ্রামীণ পারিবারিক জীবনের, সমাজ জীবনের প্রতিদিনকার জীবনাচরণ ও রূপান্তর প্রক্রিয়া মূর্ত হয়েছে 'জননী' উপন্যাসে। 'জননী'তে যুগের প্রভাব, মানবিক মূল্যবোধে ও শ্বাশত অনুভূতির ছোঁয়ার ভিন্নরূপ পেয়েছে। "জননী উপন্যাসের কাহিনী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মূলত শিল্পীর নিরাসক্ত চেতনায় মানুষের চরিত্র বিশেষিত হয়েছে বহুমাত্রিকতায়। তবু বহু চরিত্রের সমাবেশের পাশাপাশি একটা কাহিনী বা ঘটনা থেকেই যায়। ... বাঙালী মুসলমানদের ইংরেজ শাসনবিরোধী ও স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনৈতিক কর্মধারা ফরাজী-ওহাবী আন্দোলন থেকে শুরু করে বিংশ-শতাব্দীর প্রথমাংশ পর্যন্ত এ-উপন্যাসের ঘটনাংশ বিস্তৃত। মুসলমান

Dhaka University Institutional Repository


জাতিগোষ্ঠীর আত্মসন্ধান ও জাতিসত্ত্বা সন্ধানের ঐতিহ্যিক উৎসের ব্যবহার এবং বাস্তবতা লালিত ব্যক্তির ও সামাজিক জীবনের অঙ্গীকার শওকত ওসমানের এ-উপন্যাসের জীবন জিজ্ঞাসার স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়বাদী।"[৭৬]

এ সময়ের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজের মানুষের জন্য শুভ ছিলো না। এ বিষয়ে আমিনুর রহমান সুলতান বলেছেন, "অষ্টাদশ শতকের শিল্প বিপ্লব বিশ্ব সভ্যতার বিকাশকে তরান্বিত করেছে ঠিকই কিন্তু এর ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি পঙ্গু হয়ে যায়। মানুষ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হতে থাকে। দারিদ্র্য থেকে মুক্তির জন্যে তাদের অন্তহীন প্রয়াস কোনো কাঙ্খিত গন্তব্যে তাদের উপনীত করে নি।"[৭৭] সংসার জীবনে আজহার খাঁ অভাবী চরিত্রের বিকশিত রূপে হলেও চরিত্রটির মধ্যে সচেতনতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। অথচ বাস্তব চেতনা ভাস্বর হওয়ার সম্ভাবনা তার মধ্যে ছিলো। কিন্তু চেতনা আচ্ছন্ন থেকেছে ধর্মীয় মূল্যবোধ, ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে সামাজিক মর্যাদা দান করার জন্য মানবেতর আচরণ করতে দ্বিধা করেনি সে।

জমিদার শ্রেণীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মতো তেজোদীপ্ততার মধ্যে দানা বাঁধেনি। এর জন্য অবশ্য সময়কেই দায়ী করা চলে। শওকত ওসমান সময় সচেতন লেখক। সমকাল সচেতনতা তাঁকে নিরাসক্ত রেখেছে। ফলে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের প্রভাব যে-সমাজের মানুষকে অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে দেয়নি। সেখানে কোন চরিত্রের মাঝে প্রতিবাদী চেতনাকে আরোপ করেন নি। "ধর্মীয় মূল্যবোধ যে সময় ও সমাজকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে সেই সময় ও সমাজের ছবি আঁকতে গিয়ে তিনি সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত কৃত্রিম চরিত্র অংকন করেন নি, বরং আজহার যতটুকু সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত হওয়া সম্ভব ততটুকু বিস্মিত হয়েছেন।"[৭৮] আজহার খাঁ ধর্মপ্রাণ হিসেবে পাঠকের কাছে উদ্ভাসিত। ধর্মীয় বিশ্বাসবোধকে কখনো কখনো অন্ধ করে তুলেছে, এর ফলস্বরূপ গ্রামের ঈদগাহে ওয়াজের মজলিসে 'হানাফী' এবং 'লা মাসহাবী' মতাবলম্বী-এই দুই সম্প্রদায়ের মুসলমানদের মধ্যে হজরত আলীর দাড়ির প্রসঙ্গ নিয়ে হাতাহাতি শুরু হলে আজহার-খাঁ মজহাবীদের পক্ষ নিয়ে মারামারিতে অংশ নেয়। লেখকের ভাষায়-"আজহার খাঁও এই ওয়াজের মজলিসে আসিয়াছিল। সে নিরীহ ব্যক্তি। কিন্তু এই ব্যাপারে সে পাকা মুসলমান। এমন বর্বর হইয়া উঠিতে পারে সে, হাত আজহার কম চালায় নাই। মজলিসের বাতি নিভিয়া গিয়াছিল। মনের সুখে সে হাতের সাধ মিটাইল। গলাফাটা চীৎকার করে সে, শালা হানাফীদের খতম করে দাও। কে বলিবে আজহার নিতান্ত বেচারা মানুষ।"[৭৯]

দরিয়া বিবির চরিত্র নির্মাণে লেখক তার স্বাধীন মনোভাবের পরিচয় স্পষ্ট করেছেন। সে প্রথম জীবনে এক ছেলের মা হয়ে বিধবা হয়েছিল, মুসলিম আইনে পিতার পূর্বে পুত্রের মৃত্যুর অজুহাতে দরিয়া বিবির ছেলে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়। ছেলে মোনাদিরের ভরণ-পোষণের জন্য তার শ্বশুর কিংবা দেবররা তাকে সম্পত্তির কোন আংশ দেয়নি। বরং বংশের ইজ্জত ও সম্ভ্রম রক্ষার্থে তারা বিধবা দরিয়াকে

Dhaka University Institutional Repository


স্বামীগৃহে অবস্থানের কথাই বলেছিল। কিন্তু দরিয়া তাতে সম্মত হয়নি। দেবররা শেষ পর্যন্ত বংশের মর্যাদা রক্ষার্থে তাদের ভ্রাতুষ্পুত্র মোনাদিরকে দরিয়ার কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু স্বাধীন চেতা দরিয়া বিবি পশ্চাতে আর মুখ ফেরায়নি। তাদের মুখে চুনকালি দেওয়ার মত আর কোন পথই যেন অনাবিষ্কৃত থাকে না, সে জন্য সে বৈধব্যের পাঁচ মাস পরেই বিপত্নীক আজহার খাকে নেকাহ করেছিল।

দরিয়া বিবির স্বাধীনতাবৃত্তি তার সম্ভ্রমবোধকে শাণিত করেছে। স্বামী আজাহরের আশ্রিতা খালা আশেকজানের ভিক্ষালব্ধ উপকরণ কিংবা তার পাওয়া জাকাতের কাপড় দরিয়া বিবি গ্রহণ করেনি। বরং বস্ত্রকষ্ট দেখে খালা শাশুড়ি আশেকজান জাকাতের পাওয়া দু'টো কাপড়ের মধ্যে একটি দরিয়াকে দেবার প্রস্তাব করলে সে তেলে বেগুণে জ্বলে ওঠে। উন্মত্ত দরিয়া বিবি কাপড় লাথি মেরে দাওয়ার নিচে ফেলে দিয়ে বলেছে ঃ "জাকাত ! আমি নেব জাকাতের কাপড়। আমার স্বামী বেঁচে নেই ? মুখে তোমার আটকালো না ?.....তোমার কাপড়ের সাত পয়জার।"[৮০] দরিয়া বিবির এই জেদি মনোভাব ও স্বাধীন চিত্ততা তাকে সংগ্রামী ও পরিশ্রমী করে তুলেছিল। স্বল্প বাক, হতবুদ্ধি স্বামীর সংসারে সে বলিষ্ঠভাবে হাল ধরেছিল। গরু-ছাগল-হাঁস-মুরগী পালন থেকে শুরু করে, সমস্ত গৃহকার্য তাকেই চিন্তা ভাবনা করতে হয়েছে। দরিয়া বিবির চরিত্রের আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে তার ব্যক্তিত্ব। সংসারে দারিদ্র্য ও অভাবগ্রস্থতা তাকে নানা ভাবে পীড়িত করেছে। সন্তান ভরণ-পোষণের জন্য স্বামী বর্তমান থাকা সত্বেও তাকেই চিন্তা ভাবনা করতে হয়েছে। স্বামী আজহার মেয়ে নাঈমা, ছেলে আমজাদ এমনকি লম্পট ইয়াকুবও অনেক সময় তার মুখের উপর কথা বলতে পারেনি। লেখক বলেছেন "ইয়াকুব রীতিমত দরিয়া বিবিকে ভয় করে। তার চোখের দিকে সহজে তাকাতে পারে না। থমথমে মুখ যেন শাসন ভঙ্গির আদল।"[৮১] আজহার খাঁর আনন্দ বৈচিত্রহীন পরিবারের আনন্দের জীবন্ত প্রতিমাত্ত সে। তার মধ্যে একসঙ্গে গাম্ভীর্য ও উচ্ছলতা সমন্বিত ছিল বলে ব্যক্তিত্ব শালিনী মহিলা হিসেবে দরিয়া বিবি সহজেই উপন্যাসে চিহ্নিত হতে পেরেছে।

দরিয়া বিবির চরিত্রের ক্রমাবনতির দিকটি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। একদিকে অভাব দারিদ্র্যের ছোবল, অন্যদিকে স্বামী আজহার খাঁর উপুর্যপরি বাড়ি থেকে গা ঢাকা দেয়ার কারণে সে মানসিক বলিষ্ঠতা হারিয়ে ফেলে। এ জন্য স্বামীর অনুপস্থিতিতে দিশেহারা দরিয়া বিবি মাঠের ধান কাটার জন্য চন্দ্রকোটালের শরণাপন্ন হয়েছে। ক্ষুধিত সন্তান- সন্ততির মুখের দিকে চেয়ে পর্দাশীল দরিয়া বাগদি বুড়ি শৈরমীর খোঁজে প্রেরিত ছেলে আমজাদের জন্য গমন করেছে। লেখকের ভাষায়–"সদর ছাড়িয়া সড়কের ঘুলিপথে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। জীবনের আর কোন দিন সে এতদূর আসে নাই। মাথায় চটের থলি ঢোকার মত করিয়া দেওয়া। পায়ের তলায় বৃষ্টি-স্রোত বহিয়া যাইতেছে। চটের থলি পানিরোধ করিতে পারে না।.....দরিয়া বিবি নির্বিকার দাঁড়াইয়া ছিল।"[৮২] সীমাহীন দুঃখী বাগদী নারী শৈরমীর সঙ্গে দরিয়া-বিবির যে প্রীতিময় সম্পর্ক তা মানবিকতায় মহিমান্বিত। দরিয়া-বিবি তাই দুর্বিসহ অভাব ঘোচানোর চেষ্টায় গোপনে ঘড়া বন্ধক দিতে

Dhaka University Institutional Repository


শৈরমীর সাহায্য নিতে দ্বিধা করেনা। অসুস্থ শৈরমীর শয্যাপাশে সে ছুটে যায় নিশীথ রাতে। শৈরমীর মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়ে। অন্যদিকে ম্যালেরিয়া শয্যাশায়ী আমজাদের শুভ কামনায় শৈরমীর বাড়োয়ারী তলায় হরিলুটের বাতাসা অসুস্থ পুত্রের মুখে তুলে দেয় দরিয়া বিবি। আবার মৃত শৈরমীর কথা স্মরণ করে সে নিজের ছোট মেয়ের নাম রাখে 'শরীফন' এবং ডাক নাম দেয় 'শরী'। এভাবে মানবতার মহিমার কাছে অবলুপ্ত হয়েছে জাতি ধর্মের ব্যবধান। এ প্রসঙ্গে শিরিণ আখতার আরো বলেছে–"সমাজ-সচেতন ও দায়বদ্ধ শিল্পী শওকত ওসমান এ উপন্যাসে মানবিকতাকে মহিমান্বিত করে দেখিয়েছেন। এই মানবিকতার আলোকেই বিচার করা হয়েছে ধর্মের সংস্কার, সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদ ও শ্রেণীভেদকে।"[৮৩]

এ-উপন্যাসে শওকত ওসমান গ্রামের সাধারণ দরিদ্র ও নিম্নবিত্তের জনগণ হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে পরস্পরের সুখে-দুঃখে মিলেমিশে সংগ্রাম করে বাঁচার চিত্র তুলে ধরেছেন। কিন্তু তাদের মধ্যে যে ধর্মীয় সংঘাত দেখা দেয় তার পেছনে কাজ করেছে বিত্তবানদের শ্রেণী স্বার্থ। এ উপন্যাসে রোহিনী চৌধুরী ও হাতেম বক্শ জলমহাল দখল নিয়ে নিজেদের মধ্যে যে বিবাদ সৃষ্টি করে তার জন্য নিজেদের স্বার্থেই তারা নিজস্ব সম্প্রদায়ের লোকদের একে অন্যের বিরুদ্ধে দাঁড় করায়। শওকত ওসমান দরিদ্র জনগণের জীবন ভাষ্য রচনা করতে গিয়ে আবহমান বাঙালির মানবিক দিকটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

মুসলিম সমাজের নানা প্রথা, লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের নানা দিকও এ উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে। বকুলতলার পীরের মাজারের দরবেশের আজদাহা সাপের পিঠে আরোহণ, পূর্ণ গর্ভবতী দরিয়া বিবি গোপনে বাগদী পাড়ায় অসুস্থ শৈরমীকে দেখতে যাওয়া, আশেকজান দাদির মৃত্যুর পর নাতি আমজাদের রাতের স্বপ্ন দেখা প্রভৃতির মাধ্যমে লেখক সমাজবাস্তবতার চিত্র অংকনে সচেষ্ট হয়েছেন। হাসান আজিজুল হকের বক্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়- "এই শতাব্দীর প্রথম দিকের গ্রামগুলোর গঠন, আর্থনীতিক বিন্যাস, হিন্দু-মুসলমান দুই সমাজের বাস্তব ও সম্মিলিত জীবন যাপন, শ্রমজীবী মানুষের দারিদ্র্য ও অনশন, সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে মানুষের সহাবস্থানের প্রচণ্ড দাবি...এমন ঔপন্যাসিক সততায় আমাদের উপর ছাপ দেখা যায় তা কোন রকমেই অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়।"[৮৪]

'জননী' উপন্যাসের পুরো কাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করেছে দরিয়া বিবি। তেজস্বী ও জীবন-সংগ্রামী দরিয়া বিবিকে বাংলাদেশের গ্রামীণ নারী সমাজের বেদনা-বঞ্চনার মূর্ত প্রতীক হিসেবে চিত্রিত করেছেন লেখক। ভাগ্য-বিড়ম্বিত এ নারীর জীবনী রচনাই যেন এ-উপন্যাসে লেখকের মূল উপজীব্য বিষয় ছিল। নানা ঘটনা, উপ-ঘটনার পর সে প্রথম স্বামী গৃহ থেকে বিদায় নিয়ে বিপত্নীক আজহারের বাড়িতে আসে। কিন্তু সেখানেও অভাবই হয়ে ওঠে নিত্য সঙ্গী। অভাবের তাড়নায়, জীবনের উত্থান-পতনে ও সীমাহীন পরিশ্রমে দরিয়া বিবির চারিত্রিক মাধুর্য ফুটে উঠেছে। উপরন্তু, সংসার-বিরাগী উদাসীন স্বামীর ঘরণী সে। তাই দরিয়া তার অন্তরচোখে দেখতে পায়। লেখকের বর্ণনায় "ধূসর ভবিষ্যৎ যোজন-বিসারী প্রান্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

Dhaka University Institutional Repository


তার চারিদিকে শুধু রুক্ষতা; সবুজ রঙের ফিকে আভাস পর্যন্ত নাই। দৃষ্টি মেলিয়া দিলে চাঁদের বালুর অকরুন হাসি-ই একমাত্র সত্যরূপে প্রতিভাত হয়।"[১৬৫] প্রচণ্ড দারিদ্র্যের মোকাবেলায় কঠোর জীবন সংগ্রাম , প্রথম স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে জীবনের সমস্ত স্বপ্নসাধ চুরমার হয়ে যাওয়ায় এক অসহায় বেদনা দরিয়ার জীবন ও আচরণকে বাহ্যিকভাবে রূঢ়তা ওরুক্ষতা জন্ম হয়। এর পর ও দ্বিতীয় স্বামীর ঘরে এসে সে আর একবার-জীবনের পথে নতুন আশায় বুক বাঁধতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু উদাসীন, নির্লিপ্ত, আত্মমগ্ন, সংসার বিমুখ অদ্ভুত আচরণের মানুষ আজহারের সঙ্গে তার একটা অপ্রত্যাশিত ও দুর্জ্ঞেয় দুরত্ব সৃষ্টি হয়। আর এ দুরত্ব সৃষ্টির পেছনে দরিয়ার তেজী স্বভাব, গম্ভীর প্রকৃতি, আত্ম প্রত্যয়ী আচরণ প্রভৃতির কাছে আজহার নমিত ও ম্রিয়মান হয়ে পড়ে। সে ক্রমেই দুরে সরে যায়। দরিয়া সন্তান বাৎসল্যে পীড়িত হয়ে ওঠে। সে মোনাদির নিরুদ্দেশ যাত্রায় নির্বাক হয়ে পড়ে। লেখকের বর্ণনায়- "তার নির্মম মুখের দিকে চাহিয়া আজহার কথা বলিতে সাহস পায়না। সংসারে দুইজন মাত্র জীব একসঙ্গে বসবাস করিতেছে মাত্র। শিশুর মত একে অপরের ভাষা বোঝে না। সেই জন্য বাক্যালাপেরও কোন প্রয়োজন নাই।"[১৬৬]

'জননী' উপন্যাসের কাহিনী সামাজিক দুর্দশাগ্রস্ত গ্রামীণ প্রতিবেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। গ্রামীণ দলাদলি, কোন্দল, শঠতা, দারিদ্র্য ইত্যাদি চলচিত্রের মধ্যে কিছু পার্শ্বচরিত্র এই উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে। এদের মধ্যে জমিদারের লাঠিয়াল শাকের, তৎপত্নী হাসু বৌ, শাকেরের মা, আমির' চাচি, আশেকজান, গ্রাম্য টাউট ও শোষক শ্রেণীর অবয়বে এসেছে জমিদার হাতেম বক্স, উঠতি ধনী ইয়াকুব প্রধান। চন্দ্রকোটালের পরিবারের দু'টি নারী দারিদ্র্যদগ্ধ হয়েও প্রাণোচ্ছলতর প্রতিমূর্তি হয়ে ধরা দিয়েছে, এরা হচ্ছে কোটালপত্নী এলোকেশী, ও চন্দ্র মনি। কিশোর-কিশোরী চরিত্রের মধ্যে মোনাদির, খলিল, আমজাদ, এবং আম্বিয়ার চরিত্র উপন্যাসে উজ্জ্বল। ঘটনা প্রবাহের মধ্যে চরিত্রকে সন্নিবিষ্ট করে তাদের মুখে মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণী মানবের সৃষ্টি করা দুরূহ কাজ। শওকত ওসমান 'জননী'তে অত্যন্ত নৈপূণ্যের সঙ্গে এই কৌশলের প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছেন।

'জননী' উপন্যাসে পরিপূর্ণ আছে অনেক শাখা ও প্রশাখা কাহিনী। অধিকাংশ অনুঘটনায় গ্রামীণ দারিদ্র্যের চিত্র, ভাগ্য নির্ভরতার মর্মন্তুদ ঘটনা। আবহমান বাংলার গ্রাম্য পরিবারগুলোর সম্পদহীনতা, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের চালচিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। হাসান আজিজুল হকের মতে- "সীমিত পরিসরে এই উপন্যাসটির সার্থকতা প্রশ্নাতীত। এই শতাব্দীর প্রথম দিকের গ্রামগুলির গঠন, অর্থনীতির বিন্যাস, হিন্দু ও মুসলিম দুই সমাজের বাস্তব ও সত্য সম্মিলিত জীবন-যাপন, শ্রমজীবী মানুষের দারিদ্র্য, সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে মানুষের সহাবস্থানের প্রচণ্ড দাবি এবং সেই সঙ্গে স্পষ্ট তীক্ষ্ম রেখাঙ্কিত ব্যক্তি এমন ঔপন্যাসিক সততায় আমাদের উপর ছাপ ফেলে যায় যে তা কোন রকমে অগ্রাহ্য করা সম্ভব হয় না।"[১৬৭]

Dhaka University Institutional Repository


'জননী' উপন্যাসে ব্রিটিশ শাসনের অন্তপর্বের অবিভক্ত বাংলা আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ব্রিটিশ শাসন এবং শোষণের নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে বাঙালীদের জীবন যাত্রা কোন পর্যায়ে এসেছিল আলোচ্য উপন্যাস তার প্রামাণ্য দলিল। সুপ্রকাশ রায় বলেছেন–"উনবিংশ শতাব্দীতে প্রথম হইতে বঙ্গদেশ ও সমগ্র ভারতের হতভাগ্য কৃষকের উপর তিনটি ভয়ঙ্কর শোষক শক্তি উহাদের সমস্ত ভার লইয়া চাপিয়া বসে। বৃটিশ শাসকগণ আদায় করে তাহাদের ভূমি রাজস্ব, এই ভূমি-রাজস্বের উপর জমিদার গোষ্ঠী আদায় করে তাহাদের খাজনা, আর মহাজনগণ কৃষকের অবশিষ্ট ফসলের প্রায় সবটুকুই কাড়িয়া লয় তাহাদের ঋণের সুদ হিসাবে।"[১৮৮] এ সময়ের নব্য বণিকগোষ্ঠী শিল্পতন্ত্রের মাধ্যমে পুঁজিবাদী শোষণের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। 'জননী' উপন্যাসে আজহার খাঁ ও চন্দ্রকোটালের দুর্দশার চিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে সমকালীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। অর্থনৈতিক অসাম্যের বেড়াজালটা যে মানুষেরই তৈরী, চন্দ্রকোটালের কাছে সামাজিক বৈষম্যের রেখায় তা স্পষ্ট ছিল। আজহার ও চন্দ্রকোটাল তাই ব্যবসার প্রতি আকৃষ্ট হয়েও ব্যর্থ হয়েছে কয়েকবার। সেখানেও ঠকবাজদের সাক্ষাত পেয়েছে। অন্যদিকে ইয়াকুব লম্পটের সীমার নীচে নেমেও টাকা-পয়সার মালিক হয়েছে। অন্যায় পথে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের বশে রাখা এবং তাদের মাধ্যমে কিভাবে আখের গোছানো যায়, দুই জমিদারের কোন্দল এবং হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা এ-উপন্যাসে লক্ষণীয়।

'বনী আদম' উপন্যাসের শুরুতে শওকত ওসমান স্বর্গচ্যুত আদমের পরিণতির কথা স্মরণ করেছেন। সামান্য ভুলের জন্য হজরত আদম (আঃ) বেহেস্ত থেকে বিচ্যুৎ হয়ে যে মানব মণ্ডলীর জন্ম দিয়ে ছিলেন, তিনি বিধাতার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা পেলেও তৎসৃষ্ট মানুষরা অশেষ দুর্গতির কবল থেকে রক্ষা পায়নি, প্রতিনিয়ত হাজারো সমস্যায় জর্জরিত। শওকত ওসমান আদমের এই স্বর্গচ্যুতির সঙ্গে আদম সন্তানদের সুখচ্যুতি দেখে বলেছেন ঃ "হে হযরত আদম, আমরাও শুনেছি প্রপিতামহদের মুখ থেকে, মানবের আদি পিতা তুমি, স্বর্গচ্যুত, ধরিত্রীর রুক্ষ শক্ত ভুমির উপর উলঙ্গ নিক্ষিপ্ত। সেদিন বেহেস্তের তরুলতা সঙ্কোচে পলায়মান তোমাকে সামান্য বল্কলের ঋণ দিতেও তীব্র ঘৃণা। আল্লাহ্‌র লা'নতের ভৈরব-রুদ্র রূপের নিকটে তুমি লাঞ্ছনা পর্যুদস্ত। প্রপিতামহদের প্রবাদেই মুখর আল্লাহ্‌র রহমত ঝরছিল তোমার ক্রন্দনজিৎ বন্দেগীর বিনিময়ে। অবিশ্বাসীর জিজ্ঞাসু নয়নের দিকে চোখ মেলে চাও, হে পিতা আদম ! পেয়েছিলে তুমি আল্লাহর রহমত ? তোমার লানৎ অভিশাপের হলাহল সংক্রমণ নেই তোমার গোলাম বংশধরদের রক্তে নেই। তবে কেন জোয়ারীর একদানা জোটেনা আমাদের জঠরে। কেন আমাদের কণ্ঠ-তট পায় না বল্কল পরিমাণ চীর বসন শোভা। তোমার অভিশাপ বিবস্ত্র দিনের স্মারক আমাদের শ্রান্তিক্ষত শরীর। রোগ -ক্লিন্ন পাণ্ডুর বেলায়

Dhaka University Institutional Repository


পৃথিবীর রঙিন মেওয়া আমাদেরও লুব্ধ ঠোঁট থেকে সরে যায়। তোমার অতীত লাঞ্ছনার স্বাক্ষরও আমাদেরও তৃষ্ণিত নয়ন। হে আদি পিতা, চোখ তুলে তাকাও, জবাব দাও তোমার অধিবাসী বিদ্রোহী সন্তানদের। জবাব দাও।"[৮৯]

'বনী আদম' উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত কাহিনী সূত্রে জানা যায়, মেদিনীপুরের মীরপুর গ্রামের সলিম মুন্সীর বাড়ির কাজের লোক হারেস । একদিন গৃহ স্বামীর সঙ্গে রচনা করে অপমানের পর সে 'বার শহর' কলকাতায় আসে। কলকাতায় আসার পথে আরিফ নামক এক কৃষক যুবকের সঙ্গে তার আলাপ হয় ও বন্ধুত্ব হয়। কলকাতায় বৈচিত্র্য দেখে হারেস অভিভূত হয়। একটি পুরাতন গীর্জায় রাত্রি যাপনের পর বাসেদ মিস্ত্রির কাছে ঘরামির কাজ পায়। কলা বিবির বস্তিতে বাসেদ মিস্ত্রির ভাড়াটে বাসায় তার আশ্রয় জোটে। এখানে শুকুর ঘরামি, ফরিদপুরের ছাতাওয়ালা রজব মহম্মদ প্রমুখের সাথে তার পরিচয় ঘটে। এদের কারও সাংসারিক অবস্থা ভালো নয়। 'পায়রার খোপ' সদৃশ বাড়িটির মালিক মেহেরালি। পঁচিশ বছর আগে সে গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছে। মেহেরালির বিমাতা ছিলো 'রণ্ডিকা'। বিমাতার সম্পত্তিই মেহেরালি পেয়েছে। ইস্পাত কারখানার শ্রমিক ছিল সে। শ্রমিক ছাঁটাইয়ের সময় বাদ পড়ে যায়। তার সংসারেও ছিল দারিদ্র্যের নগ্ন মূর্তি। হারেস মাস তিনেকের মধ্যে কিছু টাকা সঞ্চয় করেছিল। তার কাছে বস্তির জীবন একঘেয়েমীপূর্ণ, অস্বস্তিকর মনে হলেও সে পেয়েছে প্রথম স্বোপার্জনের আস্বাদ।

'বনী আদমের' কাহিনীতে হারেস তার পুত্র-পরিজনের সাক্ষাৎ পেয়েছিল কিনা তা এখানে বলা হয়নি। "তবে ১৯৯০ সালে 'বিচিত্রায়' প্রকাশিত 'বনী আদমে'র পরিমার্জিত রূপটিতে দেখা যায়, হারেস তার পুত্র-পরিজন ও বন্ধু পরিবেশের সাক্ষাৎ পেয়েছিল। আদমের বংশধরদের কাহিনীতে শওকত ওসমান 'মাটি আর মানুষের' জীবনকে এমন গভীর ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন 'জননী' ছাড়া আর অন্য কোন উপন্যাসে তিনি এত বলিষ্ঠতা প্রদর্শন করতে পারেননি। কারণ উপন্যাসের পটভূমি ও উপকরণ হিসেবে দেশকালের প্রকৃত ও প্রধান সমাজ সভ্যতার সঙ্গে উপন্যাসিক অবশ্যই আত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ।"[৯০] শওকত ওসমানের এই সত্যবন্ধনে 'বনী আদম' ব্যঙ্গময় হয়ে উঠেছে। এ উপন্যাসে নিম্নবিত্ত ও সর্বনিঃস্ব মানুষের জীবন সংগ্রাম, তাদের পরিবার-পরিজন, তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা, বিনয়-ভদ্রতা সবকিছুই 'বনী আদমে' প্রকাশিত।

'বনী আদম'-এ প্রত্যক্ষ জীবন চেতনা তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। মূল বিষয় হারেসের ছন্নছাড়া জীবনের কাহিনী হলেও এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হারেসের বন্ধু আরিফের পারিবারিক জীবনের নানাবিধ সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা। সব দিক থেকে বিচার করলে মনে হয় 'বনী আদম' কাহিনীর চেয়ে বর্ণনা, চরিত্রের চেয়ে বক্তব্যকে বেশী প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। তবে বর্ণনা ও বক্তব্যের ভিতর দিয়ে এক একটি মানুষের চরিত্র যে ব্যক্তিত্ব ও বাস্তবতার পূর্ণতা লাভ করেছে তা অবশ্যই স্বীকার্য। এ উপন্যাসে লেখক সমাজের তৎকালীন

Dhaka University Institutional Repository


সময়ের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের সমস্ত পাত্র-পাত্রীই মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত। দীর্ঘকাল বৃটিশ সমাগু শাসনের ফলে এ দেশের নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনে যে অনামিষার অন্ধকার কঠিনভাবে প্রভাব ফেলেছিল। আর এই নিষ্পেষণের দায়িত্ব পালন করেছিল এ দেশীয় নব্য জমিদার শ্রেণী তাদের শোষণের মাধ্যমে। "ইউরোপে শিল্পবিপ্লব সমাপ্ত কিন্তু এ দেশের চির স্থায়ী যারা ইংরেজরা নতুন এজেন্ট সৃষ্টি করল যেন শিল্পের দিকে তাদের নজর না যায়, বরং জমিদার অভিজাত সেজে বসে থাকে, ইউরোপীয় সভ্যতার আশীর্বাদ এতটুকুই এদেশে পৌঁছায়, যতটুকু শাসক হিসেবে ইংরেজদের অনুকুলে।"[৯১] এই কারণে আরিফকে ধর্ণা দিতে হয়েছে নায়েবের কাছে জমি বন্দোবস্ত নেয়ার জন্য। ঘুষ দিয়ে সে পেয়েছে, দু'বিঘা জমি, জমিদারের মধ্যস্বত্বভোগ লিপ্সার শিকার হয়ে উচ্চ দামে খাজনা পরিশোধ করতে হয়েছে।

বস্তুত, এ উপন্যাসের মাধ্যমে শওকত ওসমান ব্রিটিশ ভারতের তৎকালীন জীবন সংগ্রামের চিত্র। তাই তাঁর উপলব্ধি-'জুলুম অন্যায়ের শত ক্রুর চক্র প্রাণতরু বিদীর্ণ প্রাসাদেও মূল মেলে।' 'বনী আদম' উপন্যাসে শওকত ওসমান যে দারিদ্র্য ও দুঃখ-কষ্ট কিংবা সংগ্রামের চিত্র তুলে ধরেছেন তার মূলে রয়েছে নিম্ন শ্রেণীর মানুষেরা যে শত শত দুঃখ কষ্টের মাঝেও সে বেঁচে থাকে তার প্রতি লেখকের বিশ্বাস। তাই 'বনী আদম' হাহাকার দীর্ণ উপন্যাস হয়েও জীবনবাদী উপন্যাস হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসের মূল কাহিনী শুরুর আগে লেখক এক শিরোনামহীন ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন, 'ক্রীতদাসের হাসি' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার এক দৈব ব্যাপার। এরপরে ঐ পাণ্ডুলিপি আবিস্কারে কাহিনী হিসেবে জানানো হয়েছে "দুই বন্ধু মৌলানা জালাল ও মাসুদের সঙ্গে একত্রে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সহপাঠিনী ও পরবর্তীকালে একটি গ্রামের স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষয়িত্রী রউফুন্নেসার অখ্যাত গ্রামে বেড়াতে যাওয়ার সূত্রে লেখক ঐ সহপাঠিনীর পিতামহ জনৈক শাহ ফরিদউদ্দিন জৌনপুরীর সংগ্রহ শালায় এই পাণ্ডুলিপি দেখেন ; দৃষ্টিশক্তিহীন অশীতিপর বৃদ্ধ ফরিদ উদ্দিন সাহেব তাদেরকে জানান, হালাকু খানের বাগদাদ ধ্বংসের সময়ে এই পাণ্ডুলিপি আসে হিন্দুস্তানে। নানা হাত-ফেরীর পর তা পৌঁছায় শাহ সুজার কাছে। তিনি আরাকানে পালিয়ে যাওয়ায় সেখান থেকে জৌনপুর। ফরিদ উদ্দিন সাহেব জৌনপুর থেকে এটি উদ্ধার করেন।"[৯২] সেখানে লেখক ও তার বন্ধু আরও জানতে পারলেন, এটি আরব্য রজনীর রসাল কেতাব। পুরো নাম-'আলেফ লায়লা ওয়া লায়লানে'। অর্থাৎ সহস্র দুই রাত্রি। আরব্য উপন্যাসের ইংরেজী কাহিনীতে প্রচলিত যে হাজার এক রাত্রির কাহিনী আছে তার চেয়ে একটি কাহিনী বেশী। 'আলেফ লায়াল ওয়া লায়লানে'র শেষ অধ্যায়ের নাম 'জাহাকুল আদব' বা 'গোলাপের হাসি' উল্লেখ করে লেখক জানিয়েছেন

Dhaka University Institutional Repository


বিশেষ বিস্ময় এই পাণ্ডুলিপি। আমি প্রস্তাব দিলাম, 'দাদু এটা আমরা কপি করিয়ে নিতে চাই আমাদের লাইব্রেরীর জন্য। তারপর আপনার কপি পাঠিয়ে দেব'। ঈষৎ কাঠ-খর পোড়ানোর পর দাদু রাজী হয়ে গেলেন।"[৯৩] কিন্তু আদতে এই ভূমিকাটুকুও পুরোপুরি কাল্পনিক এবং লেখকের বিশেষ উদ্দেশ্যের ফসল। লেখক তার নিজের জবানীতে বলেছেন-'ক্রীতদাসের হাসি'-বই কল্পনা। কাঁচের ঘরের আসবাবের মত। সবই নানা মাত্রায় বিস্তারিত আরব্য উপন্যাসের কথা ত ছুতো হিসেবে ব্যবহৃত। তদানীন্তন পাকিস্তানের কথা স্মরণ করে রেখো। আইয়ুব শাহীর দাপট এ স্বৈরাচারী ব্যারাকে জন্ম জান্তাদের ধমক-চমক-দম্ভ আস্ফালনে সেটা দেশ রুদ্ধশ্বাস। তখন লেখা ওই বই। তাই আর্তনাদের কাহিনীর সমাপ্তি ঘটে। তবে আমি (তখনকার জনসংখ্যা) পূর্ব পাকিস্তানের ৮ কোটি বাঙালীর পক্ষ থেকে ও রাজত্বের মুখে থু থু দিতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলুম। ৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ৬ দফার পতাকা তুলেছিলেন। আমি গোড়া থেকেই এক দফার ট্যাঁড়াদার। ওই বই তার স্বাক্ষী। শাসক শ্রেণী আমার লাথি হজম করতে বাধ্য হয়েছিল পরিস্থিতি গুণে। ১৯৬২ সালে 'ক্রীতদাসের হাসি' বছরের শ্রেষ্ঠ রচনা হিসেবে পুরস্কৃত হয়। আইয়ুব খান নিজে হাতে আমার হাতে পুরস্কার তুলে দিয়েছিলেন, পরে যখন ওদের আক্কেল গজাল, তখন বড় দেরী হয়ে গেছে। বইটা বাজেয়াপ্ত করা যায় না আর। প্রেসিডেন্টের মুখ থাকে কীভাবে ? বহুকাল পরে আঠাশ বছর পরে-আমি আজো মাঝে মাঝে দুষ্টামির হাসি হাসি পুরাতন দিন স্মরণে। একদা শাসকদের আমি আহম্মক বানাতে পেরেছিলাম।"[৯৪]

প্রকৃত প্রস্তাবে ষাটের দশকে লেখা এ উপন্যাস অতিক্রম করেছে পাকিস্তানী সামরিক শাসনের একটি সুদীর্ঘ অধ্যায়। সে সময়টিতে সর্বকালের মানব সত্তার অপরাজেয় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতার স্পৃহাকে অবদমিত রাখা হয় একটি নিয়ন্ত্রিত প্রশাসনিক অবকাঠামোয়। সামন্ততান্ত্রিক বাগদাদের চিত্রের সাথে এর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। পাক আমলে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর প্রতিবাদে 'ক্রীতদাসের হাসি' এ জাতীয় পূর্বসুরি হয়ে এসেছে। "রাজতন্ত্র পুরোহিততন্ত্রের ধারাবাহিকতা থেকে বাঙালীর আবহমান মুক্তি আকাঙ্খা নবীন জীবনবোধ আধুনিক রূপলাভ করেছে এ উপন্যাসে।"[৯৫]

অবশ্য উপন্যাসটি সপ্তম সংস্করণে রউফন কাহিনী প্রথম সংস্করণের সাতাশ পৃষ্ঠার স্থলে মাত্র সাড়ে চার পৃষ্ঠায় নাম আনা হয়েছে। সম্ভবত । ঔপন্যাসিকের কাছে এটি বাহুল্য মনে হওয়ার কারণেই তিনি এই সংকোচনের ব্যবস্থা করেছেন। মূল কাহিনীর মধ্যে উপ-কাহিনী সংযোজনের আর প্রাবাল্য নেই। হাসির প্রতি খলিফার অণুরক্তির কারণ হিসেবে তার বিমর্ষতা ও বিনিদ্র রজনী যাপনের কথা উল্লেখযোগ্য। আর এগুলোর কারণ খলিফার স্বীয় বোন আব্বাসার মৃত্যুদণ্ড। ক্রীতদাস তাতার কে হাসানোর জন্য বুসায়না নাম্নী নর্তকীকে খলিফা পাঠিয়েছিলেন এবং বাজিতে হেরে গিয়ে বুসায়না আত্মহত্যা করেছে। এই হত্যার দায়ভার ও

Dhaka University Institutional Repository


তাতারীর উপর পড়েছে। কাহিনীর এই প্রশাখা ছাড়া আর কোন ঘটনা নেই। মূল কাহিনী ক্রমাগত এগিয়ে গেছে। সুতরাং ঘটনা সন্নিবেশের দিক থেকে 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসটি সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত গতি সম্পন্ন।

ষাটের দশকের সমরাস্ত্র শাসিত মুক্তচেতনা প্রকাশের প্রতিকূল রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিবেশে শওকত ওসমান রচনা করেন এ উপন্যাস। "এ পর্যায়ে তিনি ইতিহাসের বিস্তৃত অধ্যায় থেকে ঘটনাংশ রচনা করেছেন এবং পরিতৃপ্তি সন্ধান করেছেন বাস্তবাতিরেক পটভূমির মধ্যে। জাতির জীবনের অনিবার্য সংঘর্ষ ও সংকটের প্রেক্ষাপটে তাঁর চৈতন্য আশ্রয় গ্রহণ করেছে পরোক্ষ বিষয় ও শিল্পলোকে। সমাজ জীবনের গভীরতর সত্যের সঙ্গে তার বিষয় ও আঙ্গিক চেতনার রূপান্তর সম্পর্কহীন নয়।"[৯৬] বস্তুত, মধ্যযুগের সামন্ত তান্ত্রিক পরিবেশে বাগদাদ নগরের খলিফা হারুন-অর-রশিদের সেচ্ছাচারী ভূমিকার কাহিনী উপস্থিত করে এ উপন্যাসে মূলত ষাটের দশকের প্রথম দিকে সামরিক শাসনে আবদ্ধ পূর্ব বাংলার নিপীড়িত জনগণের বক্তব্যকেই তুলে ধরা হয়েছে।

শওকত ওসমান দেশ-কাল-পাত্রকে অত্যন্ত নীরব ভাবে পর্যবেক্ষণ করে তাঁর গল্পে উপস্থাপন করেছেন। ফলে জীবন ও পরিবেশ অত্যন্ত সুক্ষ্ম ভাবে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থতার মধ্য দিয়ে তার গল্পে চমৎকার শিল্প ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। ফলে এদিকে যেমন তার উদ্দেশ্য যেমন সফল হয়েছে অন্যদিকে তার সুদক্ষ প্রয়োগ শিল্পের ক্ষেত্রে হয়ে উঠেছে নান্দনিক। উদ্দেশ্য বিষয়ানুগ রূপ দেওয়ার কারণে শওকত ওসমানতার রচনায় সংকেত ও প্রতীকের আশ্রয়ে সমাজের বাস্তব চিত্র অঙ্কনে সক্ষম হয়েছে। ফলে তার গল্পে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নানা সংকটের চিত্র সহজেই অনুমেয়। মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে উদ্ভূত তৎকালীন সমাজের নানা সমস্যার প্রতিফল ঘটেছে।

শওকত ওসমানের বেশ কয়েকটি গল্প গ্রন্থের মধ্যে 'জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প' (১৯৫১) দ্বিতীয় গল্প গ্রন্থ। 'জুনু আপা', 'সাদা ইমারত', নতুন জন্ম', 'গেহু', দুই চোখ কানা'- এই পাঁচটি গল্প নিয়ে শওকত ওসমানের 'জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থটি সংকলিত।

বস্তুত, পাড়াগাঁয়ের স্বতস্ফুর্ত মেয়ে জুনু আপার জীবনের নানা টানা-পোড়েন আলোচনার অনুষঙ্গে বিধৃত হয়েছে এ গল্পে। জীবনের নানা টানা-পোড়েন আলোচনার অনুসঙ্গ লেখক সমাজের অন্তঃসার শূন্য: রূঢ় বাস্তবতাকেই ফুটিয়ে তুলেছেন এ গল্পে। প্রথম জীবনে অনেক প্রতিকূলতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় তার। এক পর্যায়ে সে বেছে নেয় নির্বাসিত জীবন। "নির্বাসিত জীবন জুনু আপার। এই জানালায় দাঁড়িয়ে জুনু আপা হয়ত কত চোখের পানি ফেলে। কেউ স্বাক্ষী থাকে না তার। বন্ধ্যা, ধূসর মরু জীবন। অথচ এই

Dhaka University Institutional Repository



জীবনে কত কিছু না বিকাশের সম্ভাবনা ছিল। প্রাণদায়িনী সঙ্গিনী, পুত্রবৎসল জননী, স্নেহ-উৎসারিণী ভগিনী, সেবা পরায়ণা রমনী। সব মুছে গেল। সংসারের সামগ্রিক ক্ষতি কেউ উপলব্ধি করে না। মানুষের চেতনায় তার ছায়া পড়ে না।"[১৭] এ গল্পে শওকত ওসমান জীবনের নিরবিচ্ছিন্ন সুখ অন্বেষণের পিছনে জুনু আপার জীবনমূল থেকে উৎসারিত নানা কাহিনী চিত্রিত করেছেন।

'নতুন জন্ম' গল্পটির তাৎপর্য যাই হোক, এতে শওকত ওসমান গোমতী নদীর সঙ্গে ফরাজ আলীর নিবিড় সম্পর্কের যে একটি অনুসঙ্গ সৃষ্টি করেছেন, সেটিই এই গল্পের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয়। মূলত, "বাংলাদেশের নদী ও মানুষের মধ্যে এই যে সম্পর্ক, এটি যুগ যুগ ধরে শিল্প সাহিত্যের প্রধান বিবেচ্য বিষয় রূপে স্রষ্টার মননে ধরা দেয়, প্রেরণা দেয় তাকে নদী ও মানুষের মধ্যকার চিরন্তর স্পর্শের অনন্য চিত্রকল্প নির্মাণের।"[১৮] শিল্পের বিচারে শওকত ওসমানের 'নতুন জন্ম' গল্পটি ভবিষ্যৎ সিদ্ধির এক নজির ইঙ্গিত। নদীমাতৃক বাংলাদেশকে জীবনের তাৎপর্য মণ্ডিত করে এক চমৎকার অভিব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত করেছেন।

শওকত ওসমানের তৃতীয় গল্পগ্রন্থ 'সাবেক কাহিনী' (১৯৫৩)। এ গল্প গ্রন্থের বেশ কয়েকটি গল্পে তিনি কৌতুকের স্পর্শ এনে একটি সামাজিক ভণ্ডামীর চিত্র উদ্ঘাটন করেছেন। সামাজিক অসঙ্গতি ব্যাভিচার আর নির্যাতনের বিষয়গুলোই মুখ্যত এ গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে।

'মোজেজা' শওকত ওসমানের একটি ভিন্ন ধারার গল্প। এদেশের গ্রামাঞ্চলে আগের মত এখন ধর্মের নামে ব্যবসা করার বিষয়টি অব্যাহত আছে। শওকত ওসমান এ জাতীয় একটি ঘটনার জীবন চিত্র উপস্থাপন করেছেন। তবে 'মোজেজা' ব্যঙ্গধর্মী গল্প হলেও এ গল্পের লেখকের ভিন্নধর্মী রূপায়ণ লক্ষণীয়। এ গল্পে ধর্মের আড়ালে মানুষের ভোগসর্বস্ব জান্তব রূপটিই দেখানো হয়েছে। বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মকেন্দ্রিক অন্ধ বিশ্বাস কেন্দ্রিক শিক্ষারও যে জমজমাট ব্যবসা আজও সমাজ-জীবনে প্রচলিত লেখক তার একটি বাস্তব চিত্র এ গল্পে উপস্থাপন করেছেন।

'সাবেক কাহিনী'র 'তিন পাপী', 'খোয়াত', 'দেনা', 'বিবেক' ইত্যাদি গল্পেও শওকত ওসমান গ্রামের বঞ্চিত, নিরন্ন, জীবন ও জীবিকার খেটে খাওয়া মানুষগুলো প্রায় নির্বিচারে এক শ্রেণীর লোকের অত্যাচার সহ্য করে যায়। তাদের না আছে দাবীর জোর, না আছে অধিকারের প্রশ্ন। এরা সমাজের যুপকাষ্ঠে বলি হয় নির্বিবাদে, ধনীর ক্রুর কোপনালে পুড়ে মরে নির্বিচারে। নিষ্ঠুর সমাজ তাদের বাঁচার তাগিদ নিয়ে কখনো এগিয়ে আসে না। অর্ধাহারে অনাহারে জীবন কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুই তাদের জীবনের শেষ পরিণতি। অথচ সমাজের একশ্রেণীর লোভী স্বার্থান্বেষী মানুষ এদের বঞ্চিত করে গড়ে তোলে ধন আর বৃত্তের পাহাড়ঃ অসাম্যের এই সমাজে সাধারণ মানুষ আজীবনই নিষ্পেষিত হয়। 'খোয়ার' গল্পে এক পীর তার এক শিষ্যের স্ত্রীকে চতুর্থ বিয়ে করে। শিষ্য তালাক দেবার পর আবার বিয়ে করতে চাইলে হাদিস মোতাবেক তাকে নায়ক মৌলানার সঙ্গে আবার বিয়ে দিতে হয়। আর বিয়ের পর এই সুন্দরী স্ত্রীকে সে আর ত্যাগ করেননি 'বর্তমানে তিনি মহা ফ্যাসাদে পড়েছেন। আজকাল কেবলা দেখেন।' এই খোয়ার নিয়েই ঝামেলা। শয়তানে

ভয় দেখায়। শেষে দেখা যায়-স্বপ্ন যখন ভাঙল-তার এক হাত তার নিজের গণ্ডদেশে অপর হাত রাবেয়ার শীর্ণ কণ্ঠে...রাবেয়ার জিব বেরিয়ে গেছে।

শওকত ওসমানের 'প্রস্তর ফলকে'র অন্তর্ভুক্ত 'দুই মুসাফির' রূপকধর্মী গল্প। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে লেখক জীবনের নশ্বরতার সঙ্গে অধ্যাত্ম তত্ত্বের একটি সূত্র যোজনা করে তার চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। একজন লোক আর একজন লোকের পেছনে হাটছেন। পরে প্রথম পথিকের সঙ্গ কামনা করে দ্বিতীয় পথিক তার অন্তরঙ্গ হন। প্রথম পথিক দ্বিতীয় পথিকের অনুরোধে তাকে একটি গান শোনান। গানের সুরে মুগ্ধ হন দ্বিতীয় পথিক। এক জায়গায় এসে তিনি প্রথম পথিককে তার বাড়ি-ঘর, বিশাল বাগান দেখান। তখন সোলেমান মল্লিক নামক জনৈক ব্যক্তির সঙ্গে দ্বিতীয় পথিক তার নাম পরে জানা গেল সোবহান জোয়ার্দার বলে। তার তত সব সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে তুমুল ঝগড়া শুরু হয়। দুজনেই সম্পত্তির দাবিদার। ঝগড়া শেষ পর্যন্ত উচ্চ বাক্য বিনিময়ের রূপে পরিগ্রহ করে। প্রথম পথিক তাদের তখন আর একটা গান শোনান। "মানুষের দেখরে ভাই দিব্যজ্ঞানে। পাবিরে অমূল্য নিধি, এই বর্তমানে । মলে পাবো বেহেস্তখানা, তা শুনে আর মন মানে না। লালন কয়, বাকীর লোভে নগদ পাওনা কে ছেড়েছে এই ভুবনে।"[৯৯] তখনই চারিদিকে প্রচার হলো লালন ফকির ফিরে এসেছেন। হাজারে হাজারে জনতা গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে ছুটেছে। গেরুয়া বসন কবির কণ্ঠে গান শুনে তারা মুগ্ধ। এরপর নিরিবিলিতে লালন আর জোয়ার্দারের এক সময় সব কিছু থাকলেও আজ আর তাকে কেউ চেনে না। কিন্তু লালন বলেন "একদিন তোমার কত কি, কত কে ছিল, আমার কিছুই ছিল না। আজ আবার সব আছে অথচ তোমার কিছুই নেই।"[১০০] শওকত ওসমান এ গল্পে সমাজ বাস্তবতায় একমাত্র অর্থ-বিত্তই যে সব কিছু নয় তার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। "ধন দৌলত বিত্ত সম্পত্তি মানুষকে অমরত্ব দিতে পারে না ; কেননা তা অবিনশ্বর নয়। অন্যদিকে মহামানব তার আধ্যাত্মিক সাধনায় যখন জীবনের উৎকর্ষ সাধন করেন, তখন সে জীবন অমরত্বের অধিকার অর্জন করে। লালন ফকির তাঁর গানের জগতে জীবনের সেই সাধনায় জয়ী হয়েছিল, ফলে মৃত্যুর পরেও তার অমরত্ব অক্ষুন্ন থাকে।"[১০১]

'গন্তব্য' গল্পে শওকত ওসমান পেটে ক্ষুধা নিবারণের জন্য মানুষকে যে, তার সুখের বস্তুও হারাতে দ্বিধা করে না, জীবন যাপনই যে মানুষের সবকিছু তারই বর্ণনা করেছেন।

'আজব জীবিকা' গল্পে শওকত ওসমান পঞ্চাশের মন্বন্তরের চিত্রতুলে ধরেছেন। গল্পের শহরগামী কথক দেড় বছরের একটি শিশুসহ এক প্রসূতির আত্মহত্যা করার ব্যর্থ মহড়াও প্রত্যক্ষ করেছেন। পাহারাদার নফিজ তাকে বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিল। অভাব দারিদ্র্য ও বিপর্যস্ত অর্থনীতির ছায়ায় মূহ্যমান মানুষের কাহিনী ফুটে উঠেছে এ গল্পে। নিরাভরণ সংসার জীবনে মানুষ নিত্য অভাবী জীবন যাপন করে। মন্বন্তর সাধারণ মধ্য বিত্ত ও নিম্ন বিত্ত মানুষের জীবনে অভিশাপ হয়ে দেখা দেয়। ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে

না পেরে অনেকে বেছে নেয় আত্মহত্যার পথ। শওকত ওসমান এ গল্পে পাতালের মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে দেশের সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার নির্মম চিত্রটি সুনিপুণ ভাবে বিন্যস্ত করেছে।

## তথ্য নির্দেশক ঃ

১। সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী-১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬০।

২। সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪ - ৫।

৩। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, আবু জাফর, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১১।

৪। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, আবু জাফর, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১১।

৫। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, লালসালু, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৬৭।

৬। শিরীণ আখতার, বাংলাদেশের তিনজন ঔপন্যাসিক, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ১২৮।

৭। শিরীণ আখতার, বাংলাদেশের তিনজন ঔপন্যাসিক, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৪।

৮। নুরুল করিম খসরু, আধুনিকতা ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৯৯।

৯। ডক্টর এস.এম. লুৎফর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ১৩৯।

১০। অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, কালের প্রতিমা, পৃষ্ঠা - ২৬৮।

১১। আহম্মাদ মযহার, চাঁদের অমাবস্যা ঃ ব্যক্তির অন্তর্জগত, মমতাজ উদ্দিন আহমদ সম্পাদিত, লালসালু এবং সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, পৃষ্ঠা-১০৩।

১২। সৈয়দ আবুল মকসুদ ; সৈয়দ ওযালীউল্লাহর জীবন ও সাহিত্য ; প্রথম প্রকাশ ১৯৮১ ; পৃষ্ঠা ১১৭ ।

১৩। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, চাঁদের অমাবস্যা-পৃষ্ঠা-৯৫

১৪। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ; আহমাদ মাযহার ; চাঁদের অমাবস্যা ঃ ব্যক্তির অন্তর্জগত ; পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা -১০৪।

১৫। অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় ; কালের প্রতিমা : পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৩৬৯।

১৬। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, চাঁদের অমাবস্যার ; পৃষ্ঠা-১০২।

১৭। সৈয়দ আকরম হোসেন ; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র উপন্যাস ; প্রসঙ্গভয় ; পৃষ্ঠা-৫০।

১৮। রফিকউল্লাহ খান : বাংলাদেশের উপন্যাস ঃ বিষয় ও শিল্পরূপ ; পৃষ্ঠা- ১১৮।

Dhaka University Institutional Repository


১৯। সৌদা আকতার ; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর লালসালু ও অন্যান্য প্রবন্ধ ; বাংলা একাডেমী; পৃষ্ঠা ২৪ ।

২০। রফিক উল্লাহ খান, বাংলাদেশের উপন্যাস ঃ বিষয় ও শিল্পরূপ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১৯ ।

২১। শিরীণ আখতার, বাংলাদেশের তিনজন ঔপন্যাসিক, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৫ ।

২২। রফিক উল্লাহ খান ; পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৬৫ ।

২৩। শওকত আলী ; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস ; নিরন্তর ; দ্বিতীয় সংখ্যা ; শ্রাবণ ; ১৩৯২ ; পৃষ্ঠা-৪৬ ।

২৪। রফিক উল্লাহ খান ; পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১৬৬ ।

২৫। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ রচনাবলী-১, পূর্বোক্ত; পৃষ্ঠা-২০৯

২৬। রফিকউল্লাহ খান ; পূর্বোক্ত ; পৃষ্ঠা-১৬৬ ।

২৭। শিরিণ আখতার ; বাংলাদেশের তিনজন ঔপন্যাসিক, প্রথম প্রকাশ ; ১৯৯৩ ; বাংলা একাডেমী ; পৃষ্ঠা-১৬৭ ।

২৮। শিরিণ আখতার ; বাংলাদেশের তিনজন ঔপন্যাসিক, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৩৯ ।

২৯। জীনাত ইমতিয়াজ আলী; পূর্বোক্ত, পষ্ঠা-১৪৪ ।

৩০। অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় ; কালের প্রতিমা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৭২ ।

৩১। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ রচনাবলী-১, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২২২-২৬ ।

৩২। রফিকউল্লাহ খান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১৬৮ ।

৩৩। নূরউল করিম খসরু, আধুনিকতা ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৮) ।

৩৪। আবু জাফর, ওয়ালীউল্লাহ্‌র ছোটগল্প, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬৪ ।

৩৫। আজহার ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১২৫-১২৬ ।

৩৬। নুরউল করিম খসরু, আধুনিকতা ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, ঐতিহ্য,ঢাকা, প্রথম প্রকাশ,২০০২,পৃষ্ঠা-৫৭ ।

৩৭। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ রচনাবলী-২ পূর্বোক্ত, খুনী, পৃষ্ঠা–৪৪ ।

৩৮। আজহার ইসলাম, বাংলাদেশের ছোট গল্প,বিষয় ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১২৯ ।

৩৯। আবদুল মান্নান সৈয়দ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ , পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৯ ।

৪০। জীনাত ইমতিয়াজ আলী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৬৫ ।

৪১। ধীরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ, প্রথম খন্ড, ১৩৯১, কলিকাতা,

Dhaka University Institutional Repository



আশা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-৬৬ ।

৪২ । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী 'দুই তীর', পৃষ্ঠা-৭৪ ।

৪৩ । জীনাত ইমতিয়াজ আলী, পূর্বোক্ত,পৃষ্ঠা-৬৭ ।

৪৪ । জীনাত ইমতিয়াজ আলী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬৮ ।

৪৫ । আবু জাফর, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ছোটগল্প, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭৬ ।

৪৬ । নুর উল করিম খসরু, আধুনিকতা ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৭৪ ।

৪৭ । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী-২, কেয়ারা, পৃষ্ঠা-৭৭ ।

৪৮ । নুর উল করিম খসরু, পূর্বোক্ত,পৃষ্ঠা-৭৭ ।

৪৯ । জীনাত ইমতিয়াজ আলী, পূর্বক্তো, পৃষ্ঠা-৭৩ ।

৫০ । রফিকউল্লাহ খান, বাংলাদেশের উপন্যাসের বিষয় ও শিল্পরূপ, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭ , পৃষ্ঠা-১৫৫ ।

৫১ । মনসুর মুসা, পূর্ব বাংলার উপন্যাস, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮৯ ।

৫২ । মুহাম্মদ রেজাউল হক, পূর্বোক্ত , পৃষ্ঠা-২৬০ ।

৫৩ । মোহাম্ম আব্দুল আওয়াল, আলাউদ্দিন আল আজাদ ও তাঁর উপন্যাস, সিকদার আবুল বাশার সম্পাদিত আলাউদ্দিন আল আজাদ জীবন ও সাহিত্য, বাতায়ন প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৩, পৃষ্ঠা- ৫১ ।

৫৪ । সৈয়দ আকরম হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৭ ।

৫৫ । গিয়াস শামীম, বাংলাদেশের আঞ্চলিক উপন্যাস, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ-২০০২, পৃষ্ঠা-৩০ ।

৫৬ । রফিকউল্লাহ খান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২০০ ।

৫৭ । রফিকউল্লাহ খান, পূর্বোক্ত,পৃষ্ঠা-১৭৩ ।

৫৮ । মনসুর মুসা, পূর্ববাংলার উপন্যাস, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৯১ ।

৫৯ । আলাউদ্দিন আল আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৮ ।

৬০ । আলাউদ্দিন আল আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৬৩ ।

৬১ । আলাউদ্দিন আল আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৮১ ।

৬২ । আলাউদ্দিন আল আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৮০ ।

৬৩ । রফিকউল্লাহ খান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২০১ ।

৬৪ । আজহার ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২০০৭ ।

৬৫ । ডক্টর এস.এম.লুৎফর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৬২ ।

৬৬ । সৈয়দ সারোয়ার, আলাউদ্দিন আল আজাদ-এর জেগে থাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৬০ ।

৬৭ । ডক্টর এস. এম. লুৎফর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৪৫ ।

Dhaka University Institutional Repository



৬৮। আলাউদ্দিন আল আজাদ, জেগে আছি, প্রথম প্রকাশ-১৯৫০, পৃষ্ঠা-৪৫।

৬৯। আলাউদ্দিন আল আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮০।

৭০। ডক্টর এস. এম. লুৎফর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৫৬।

৭১। আলাউদ্দিন আল আজাদ, ধানকন্যা, পৃষ্ঠা-৭৯।

৭২। দ্রষ্টব্য, ইলামিত্রের জবানবন্দী, উদ্ধৃত বদরুদ্দিন ওমর, পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা, পৃষ্ঠা-২৯২।

৭৩। আলাউদ্দিন আল আজাদ, ধানকন্যা, পৃষ্ঠা-২৯।

৭৪। খালেদা হানুম, বাংলাদেশের ছোটগল্প, এ্যাডর্ন পাবলিকেশন্স, চট্টগ্রাম, প্রথম প্রকাশ-১৯৭৭, পৃষ্ঠা-২২৮।

৭৫। অরুণ কুমার মুখোপ্যাধায়, কা পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৮১ )

৭৬। ওয়াসিক আল আজাদ, 'জননী' উপন্যাসে গ্রাম জীবন এবং শওকত ওসমানের সমাজবীক্ষা, শৈলী, জানুয়ারী, ১৯৯৮, ঢাকা।

৭৭। আমিনুর রহমান সুলতান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪৮।

৭৮। আমিনুর রহমান সুলতান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪৮।

৭৯। শওকত ওসমান, জননী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২২৯।

৮০। শওকত ওসমান, জননী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫৬-৫৭।

৮১। শওকত ওসমান জননী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৫৭।

৮২। শওকত ওসমান, জননী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৯৯।

৮৩। শিরীণ আখতার, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩২।

৮৪। হাসান আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৮-১৯।

৮৫। শওকত ওসমান, জননী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৯৪।

৮৬। শওকত ওসমান, জননী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৯৮।

৮৭। হাসান আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮।

৮৮। সুপ্রকাশ রায়,ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, ডি.এন.বি.এ ব্রাদার্স কলিকাতা, পৃষ্ঠা-১৩৭।

৮৯। শওকত ওসমান, উপন্যাস সমগ্র-১, সময় প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০০০, পৃষ্ঠা-২১।

৯০। মুস্তফা নূর-উল ইসলাম, বাংলাদেশের উপন্যাস, বাংলা একাডেমী, বাংলাদেশের সাহিত্য, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-৩০।

৯১। শওকত ওসমান, সমুদ্র নদীর সমর্পিত, পৃষ্ঠা-৫।

৯২। শওকত ওসমান, ক্রীতদাসের হাসি, ৭ম সংস্করণ, ঢাকা-১৯৮৩, পৃষ্ঠা-৩।

Dhaka University Institutional Repository



৯৩। শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪।

৯৪। শিরিণ আখতারের কাছে শওকত ওসমানের ব্যক্তিগত পত্র-২, তারিখ, ২২-২-৯০।

৯৫। ফরিদা সুলতানা, বাংলাদেশের উপন্যাসে জীবন চেতনা, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৯২।

৯৬। রফিকউল্লাহ খান, বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২০৬।

৯৭। শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-২৭।

৯৮। আজহার ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১০৯।

৯৯। শওকত ওসমান, প্রস্তর ফলক, দুই মুসাফির, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৪, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৭।

১০০। শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১০।

১০১। আজহার ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১১৩।

Dhaka University Institutional Repository


# উপসংহার

গভীর স্বজাতি নিষ্ঠা, এ-দেশীয় সম্পদ সংগঠন ও সমাজ বিকাশ সম্পর্কিত অখণ্ড ধারণা অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতা সুত্রে অর্জিত পাশ্চাত্য সমাজবোধ এবং ধনবাদী সমাজ শৃঙ্খলে বন্দী মানুষের নৈঃসঙ্গ, শূণ্যতা ও যন্ত্রণাকে আত্মস্থকরণ ও প্রকাশ বৈচিত্র্যের মাঝেই সৈয়দ ওয়ালীউলাহ্‌র প্রাণচঞ্চল শিল্পী সত্তার মৌল পরিচয়। সৈয়দ ওয়ালীউলাহ্‌র সৃষ্টিকর্মে যে সব অনিকেত চরিত্রের সন্ধান মেলে তাদের সেই বিচ্ছিন্ন চেতনার উৎস তাঁর জীবন বাস্তবতা। সৈয়দ ওয়ালীউলাহ্‌র মরে মানুষ মূলন বিচ্ছিন্ন এবং শিল্প বিপব ও মহাযুদ্ধ পরবর্তীকালে মানুষের এই কেন্দ্রবিমুখী অনুভূতি হয়েছে আরো প্রবল। কিন্তু নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিমজ্জিত হওয়ার মধ্যে তিনি সার্থকতা খোঁজেননি। সমাজের জ্ঞানবান ও প্রাজ্ঞ প্রতিনিধি হিসেবে সৈয়দ ওয়ালীউলাহ্‌ সীমাবদ্ধতা অতিক্রমণের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন তার শিল্প-চৈতন্যের সার্থকতা। ইউরোপীয় অস্তিত্ববাদী দর্শন তাঁর এই প্রচেষ্টাকে এক তাত্ত্বিক স্বতন্ত্র প্রেরণা দিয়েছে।

সৈয়দ ওয়ালীউলাহ্‌র সৃষ্টিজগতের মধ্যে প্রথমে গল্পকার এরপর ঔপন্যাসিক হিসেবে আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা লাভ। প্রাক 'নয়নচারা' পর্ব তাঁর প্রতিভার প্রস্তুতি কাল। এ পর্যায়ের অধিকাংশা গল্পের পটভূমি মূলত গ্রাম, গ্রামীণ প্রকৃতি ও কর্মচঞ্চল মানুষ। নাগরিক পরিবেশ থাকলেও তা মুখ্যত গ্রামেরই বর্ধিষ্ণু সংকরণ। তার এ পর্বের পাত্র-পাত্রীরা বিষণ্নতা মগ্ন ও নিঃসঙ্গ। কিন্তু তারা সমকালীন কথা সাহিত্যের লিবিডো চেতনাক্রান্ত ও জৈব-সম্পর্কের পঙ্ক-পলবে নিমজ্জিত মানব মানবীয় উত্তারিধাকর নয়। তারা একাকীত্ববোধ বিপন্ন। অনিকেত চেতনায় আক্রান্ত হয়েও মার্জিত, রুচিবান ও সংস্কৃতিমনস্ক। এ পর্যায়ের গল্পের আভ্যন্তর পরিচর্যায় সৈয়দ ওয়ালীউলাহ্‌ পরীক্ষা প্রবর্ণ বৈচিত্র্য সন্ধানী, সমকাল-অনুগত ও নিজস্ব শৈলী উদ্ভাবনে যত্নশীল। তাঁর গল্পের পট গ্রন্থণ স্বতঃস্ফূর্ত চরিত্র চেতনাবাহী। ঘটনা ও চরিত্রের পরস্পর নির্ভরশীল সহঅবস্থানের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়েছে সৈয়দ ওয়ালীউলাহ্‌র গল্পের তৃতীয় প্রতীতি। সৈয়দ ওয়ালীউলাহ্‌র এ-পর্বের গদ্যশৈলী প্রতিশ্রুতি চিহ্নিত, অন্তর্গত সংবেদনশীল অনুভবী প্রক্রিয়ার বিন্যস্ত চিত্র ও চিত্রফলন এবং প্রতীকী ভাব ব্যঞ্জনায় আভিধামুক্ত।

'নয়নচারাতেই সৈয়দ ওয়ালীউলাহ্‌র ছোটগাল্পিক সত্তা স্পষ্ট ও স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশিত। এ পর্বে তিনি সমকালীন সমাজ ও রাষ্ট্র মানসের ঘটনাতে আলোড়িত এবং নিজস্ব সমাজ ও সমাজ আশ্রিত জীবন জিজ্ঞাসা রূপায়ণে আন্তরিক ও ঘনিষ্ঠ। দৃষ্টি পরিবেশের সুষম ব্যবহার, প্রেক্ষণবিন্দুর অনিবার্য প্রসঙ্গে চরিত্রায়ণ প্রক্রিয়ায় ব্যাপক গুরুত্ব দান এবং ব্যক্তিকে তার চেতন ও অচেতন সত্তা এ পর্যায়ের গল্পসমূহে প্রকাশ পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository


'দুইতীর' পর্যায়ের গল্পগুলির অন্তর্বয়ন ও সংগঠনে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সর্তক, যত্নশীল, পরীক্ষাপ্রবণ ও প্রাগ্রসর। এ পর্বের গল্পের অধিকাংশ চরিত্রই বিবিধ বিচ্ছিন্নতা চেতনায় আছন্ন হওয়ার গল্পের আভ্যন্তর পরিচর্যায় এসেছে উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র এবং স্বতন্ত্র রীতি-বৈশিষ্ট্য। গল্পের অন্তগর্ত পাত্র-পাত্রীদের জীবনাভিজ্ঞতা এবং তাদের জীবনার্থ প্রকাশের জন্যে উপমা-উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প ও চিত্রকল্পময় অনুষঙ্গ-ইমেজ-রূপকে পরিচর্চিত করেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ 'দুইতীর'-এর ভাষা-শৈলী নির্মাণ করেছেন ।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ প্রথম উপন্যাস 'লালসালু' অবক্ষয়িত সমাজের আলেখ্য হিসেবে ব্যাপকভাবে উল্লিখিত ও আলোচিত। মুখ্য চরিত্র, অনিকেত ও উন্মূলিত সত্তা মজিদের মহব্বতনগরে আগমন ও অত্নপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ জাতীয় আপাত সরল বক্তব্যের সমর্থনও মেলে। কিন্তু এই উপরিস্তরের সত্য প্রতিষ্ঠাই কেবল 'লালসালু'-তে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র লক্ষ্য নয়। একটি নির্দিষ্ট সমাজকাঠামো ও আর্থ-সমাজিক পটভূমিতে ব্যক্তির হয়ে-ওঠার প্রকরণ, তার সামগ্রিক জীবন প্যাটার্নের আলোকে মজিদ-চরিত্র সৃষ্টিই ছিল তার শৈল্পিক প্রেরণা।

'লালসালু'তে মোদাচ্ছের পীরের মাজারে জমিলার মেহেদি-রঞ্জিত পদপাত ভিন্ন সত্যের ইংগিতবহ, প্রতীকী ব্যঞ্জনায় তাৎপর্যময়। জমিলার আচরণ সাধারণ, বিপন্নঅস্তিত্ব ও নির্জীত মানুষদের ধর্ম, সমাজ ও পরিণাম ভীতিশূন্য হওয়া জাগরিত হওয়ার ও সংঘবদ্ধ শক্তির সাহায্যে মজিদ-বৃক্ষ উৎপাটন করারই দার্শনিক প্রত্যয় অনিবার্য সুত্র। 'লালসালু'র ঘটনা বিন্যাস বাংলা উপন্যাসের প্রচলিত ও সাধারণভাবে অনুসৃত পদ্ধতি-অনুসারে অর্থাৎ, আদি-মধ্য-অন্ত সম্বলিত হলেও এর প্লট-বিন্যাসরীতির গভীরে আশ্রিত হয়েছে একটি মেধাবী অন্তর্বুনন, দৃষ্টিকোণের সুষম ব্যবহার ও শিল্পমার্জিত পরিচর্যা- কৌশল ।

'চাঁদের অমাবস্যা'র কাহিনী-সংগঠন লালসালু-র মতো প্রথাবদ্ধ নয়। আপাত বিচ্ছিন্ন অনুকাহিনী, সময়ের ক্রম-পরিবর্তনশীলতা, বিকল্প কথা-আরম্ভরীতি, দৃষ্টিকোণ ও প্রেক্ষণবিন্দুর সুচিন্তিত ও শিল্পিত ব্যবহারই এ উপন্যাসের সাংগঠনিক গৌরব, এর অন্তর্বয়নের আধুনিকতা। সর্বজ্ঞ লেখকের সার্বিক প্রাধান্য থাকলেও আরেফ আলীর আতঙ্ক-শিহরিত ও অতিসংবেদনশীল প্রেক্ষণবিন্দু মুখ্য উপস্থিতিতে চাঁদের অমাবস্যা পরীক্ষা-পরিশীলিত। ব্যক্তি মনের আলোড়ন, তার দুঃসহ আত্মনিরীক্ষার বহুপ্রজ প্রান্ত উন্মোচনের প্রয়োজনেই 'চাঁদের অমাবস্যা'র পরিচর্যা ও ভাষারীতি হয়েছে প্রতীকী, অন্তর্নাটকীয়, উপমা-উৎপ্রেক্ষা-রূপক আশ্রিত।

'চাঁদের অমাবস্যা'র আরেফ আলীর সত্য ঘোষণা কেবল তার ব্যক্তিগত মানবিক অস্তিত্বকেই সুদৃঢ় করেছে ; ব্যাপক মানবিক অস্তিত্ব চেতনার সঙ্গে তাকে সংলগ্ন করতে পারেনি। কিন্তু 'কাঁদো নদী কাঁদো'র খতিব মিঞার মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে। বলা যায়, খতিব মিঞার জীবনার্থ ; তার অস্তিত্ব-অভীপ্সার রূপাংকনের

Dhaka University Institutional Repository


মাধ্যমেই ঔপন্যাসিক নিজেকে অতিক্রম করে গেছেন, হয়ে উঠেছেন বৃহৎ মুক্তি-অন্বেষী, ব্যক্তিগত অস্তিত্বরেখা পেরিয়ে বৃহৎ অস্তিত্ব-চেতনার দিগন্তরেখায় সমর্পিত ও সংলগ্ন।

'কাঁদো নদী কাঁদো'র সংগঠন, পরিচর্যা ও দৃষ্টিকোণের ব্যবহার, ভাষা শৈলীর অন্তর্বায়ন পূর্বাপেক্ষা পরিশীলিত।'কাঁদো নদী কাঁদো'তে লেখকের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিকোণ ও তবারক ভূঁইয়ার নিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষণবিন্দুর সম্পূরক ও পরিপূরক ব্যবহার এবং এই দুই রীতি পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট হয়ে নদীর মতো অভিন্ন স্রোতধারায় পরণত হয়েছে। বস্তুত,'লালসাল'র অনেকান্ত নির্বাচন দৃষ্টিকোণ ও ঘটনান্তরগত কতিপয় চরিত্রের প্রেক্ষাণবিন্দুর ব্যবহারের মধ্যদিয়ে যার সূচনা, মাঝখানে 'চাঁদের অমাবস্যা'য় তার বাক-পরিবর্তন, যুবক শিক্ষক আরেফ আলী-দাদাসাবের প্রেক্ষণবিন্দুর প্রয়োগ-সাফল্যের পর 'কাঁদো নদী কাঁদো'তে তারই পরিপূর্ণ বিকাশ, চূড়ান্ত শিল্পসাফল্য।

আলাউদ্দিন আল আজাদ-এর রচনায় শৈল্পিক অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। তিনি অকৃত্রিম প্রজ্ঞা, অন্তর্দৃষ্টি ও ভবিষ্যৎ ভাবনার এক অনুপম সংশ্লেষণে তুলে ধরেছেন। আলাউদ্দিন আল আজাদ বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনায় চিন্তা ও মননশীলতায় নবতর বিক্ষণে তত্ত্বে ও মেধায় উপস্থাপন করেছেন।

আলাউদ্দিন আল আজাদের 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' উপন্যাসের নায়ক চিত্রশিল্পী জাহেদের জীবনের সকল দুঃখ-কষ্ট, বেদনা, প্রবঞ্চনার মধ্য দিয়ে জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছার বাস্তবময় সমাজ চিত্র উপস্থাপন করেছেন। স্ত্রী ছবির মানস সঙ্কটকে আশ্চর্য দৃঢ়তার সঙ্গে অতিক্রম করেছে জাহেদ। এ উপন্যাসে লেখক সমাজের অতি বাস্তব, রূঢ়বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন।

'কর্ণফুলী' উপন্যাসে কর্ণফুলী নদী বিধৌত পাহাড়ী ও সমতলভূমির জীবনাচার পরিদৃষ্ট হয়। এ উপন্যাসে এক জন ইসমাইলের স্বপ্ন, অনেক ত্যাগ তিতিক্ষার পর তা বাস্তবে পরিণত হওয়ার কাহিনী লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন।

'জেগে আছি' গল্পগ্রন্থে আলাউদ্দিন আল আজাদ সমাজ সচেতন শিল্পী হিসেবে সমাজের নিগুঢ় সত্যের প্রকাশ করেছেন। সম্পূর্ণ দেশজ পটভূমিকায় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। গ্রামীণ জীবন ছাড়াও তিনি শহুরে জীবন-যাত্রায় নিম্ন শ্রেণীর পেশাজীবি মানুষের দৈনন্দিন চালচিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন।

'ধানকন্যা' গল্পগ্রন্থে তিনি বিভাগোত্তরকালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষসহ নানাবিধ সামাজিক, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক পটভূমি ফুটিয়ে তুলেছেন। এ গল্পগ্রন্থে তাঁর দেশ-কাল শ্রেণী সচেতন মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এ পর্যায়ের গল্পসমূহে তিনি মানবতার অপরাজেয় গৌরবগাঁথা রচনা করেছেন।

'উজান তরঙ্গে' গল্পগ্রন্থেও তিনি সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন। এ গ্রন্থের গল্পসমূহে মার্কসীয় ও ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষণীয়।

Dhaka University Institutional Repository


শওকত ওসমানের কথা-সাহিত্যে বিষয়বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। বিষয় নির্বাচনে তাঁর বিশেষ প্রবণতা হল তিনি সমকালীন জীবন ও সমাজের বইরে যেতে চাননি এবং এই সমকাল সচেতনতা সাধারণ মানুষের জীবন ও কর্মের ব্যাপ্তিতে রেখায়িত। আমরা 'জননী', 'বনী আদম' ও 'ক্রীতদাসের হাসি'তে দেখেছি সর্বদাই তিনি সমাজের নির্যাতিত মানুষের স্বপক্ষে কথা বলেছেন। ফলে গণজীবনবোধের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল বিষয়কেই তিনি গল্প-উপন্যাসের উপজীব্য হিসেবে প্রাধান্য দিয়েছেন।

সমকালকে কথাসাহিত্যে প্রাধান্য দেয়ার ফলে শওকত কথা-সাহিত্যে বিষয়ের ক্ষেত্রে কোন পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। তাঁর সমকাল সচেতন মানসপ্রবণতা রচনাকে প্রভাবিত করেছিল। লেখকের এ পর্বের রচনার প্রতিটি পর্যায়ে বিষয়বস্তুর বিবর্তন ঘটেছে। আমরা চলিশের দশকের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, পঞ্চাশের দশকের ভাষা আন্দোলন, সামরিক আইন, ষাটের দশকের আন্দোলন, সত্তর দশকের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা আন্দোলন, আশির দশকের সামাজিক অবক্ষয় ও অস্থিরতার কথা স্মরণ করতে পারি। এগুলো সবই তাঁর কথা-সাহিত্যে উপজীব্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

চলিশ ও পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত শওকত ওসমানের কথা-সাহিত্যের সিংহভাগে গ্রামীণ জীবনের চালচিত্র সনির্বন্ধ ছিল বলে এখানকার পাত্র-পাত্রীরাও গ্রামীণ অশিক্ষিত ও নাগরিকতা বর্জিত হয়ে সৃষ্ট হয়। 'জননী', 'বনী আদম', 'ক্রীতদাসের হাসি' প্রভৃতি উপন্যাস ; 'সাবেক কাহিনী', 'জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প' ইত্যাদি গল্পগ্রন্থে কোন শিক্ষিত লোকের সাক্ষাত পাওয়া যায় না। অথচ ষাটের দশকে একদিকে প্রতীকের প্রবণতা যেমন তাঁর কথা-সাহিত্যে বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে নাগরিক জীবনের চালচিত্রও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ সময়ে রচিত 'সমাগম', 'চৌরসন্ধি' প্রভৃতি উপন্যাস এবং 'উভশৃঙ্গ', প্রস্তর ফলক' প্রভৃতি গল্পের বইতে নাগরিক জীবন ও সমস্যার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

শওকত ওসমানের প্রথম দিকের রচনাগুলোর পাত্র-পাত্রীরা বলিষ্ঠতা ও ব্যক্তিত্বশীলতায় যেন স্ফূর্তি পায়নি। অভাব-দারিদ্র্য-এদের পর্যুদস্ত-মুহ্যমান ও নতজানু করেছে। 'জননীর' আলী আজহার, দরিয়া বিবি, 'বনী আদমের' হারেস, আরিফ, 'জুনু আপা' গল্পের জুনু আপা, "গেহু" গল্পের জব্বার ও তার মা প্রভৃতির চেয়ে পরবর্তীকালের চরিত্রগুলো সংগ্রামী, ব্যক্তিত্ব ও বলিষ্ঠতায় উজ্জ্বল মনে হয়। 'ক্রীতদাসের হাসির' তাতারী, 'সমাগমের' সৈয়দ বোরজা, 'রাজা উপখ্যানের' হরমুজ, প্রভৃতি চরিত্রগুলো পূর্বতন পাত্র-পাত্রীদের তুলনায় সর্বদিক থেকেই বলিষ্ঠভাবে চিত্রিত।

কথা-সাহিত্যে নিরীক্ষা ও চিন্তার আধুনিকায়নে শওকত ওসমান আলাদা মাত্রা যোগ করেছেন। জীবন ও বাস্তবতার প্রত্যক্ষ অভিনিবেশ সৃষ্টির জন্য তিনি উপন্যাস ও ছোটগল্পে নাটকীয় রীতির প্রয়োগ করেছেন। 'ক্রীতদাসের হাসি', 'সমাগম' ইত্যাদি উপন্যাস, 'নেত্রপথের' "আপনি ও তুই", 'প্রস্তর ফলকের' "দুই মুসাফির', ইত্যাদি সংলাপধর্মী রচনা।

আলোচনার শেষে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, আলাউদ্দিন আল আজাদ ও শওকত ওসমানের শিল্পজিজ্ঞাসা ও সাহিত্যকৃতির মূল্যায়নে আমরা বলতে পারি, বাংলা কথা-সাহিত্যে তারা তিনজনই স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠিত করেছেন আপন মহিমায়। তাদের এই মহিমার বিচ্ছুরণ দিগন্ত প্রসারী, প্রভাব সঞ্চারী ও কালোত্তীর্ণ সম্ভাবনায় ঋদ্ধ অভিসারী বলা যায়।

Dhaka University Institutional Repository


## আলোচিত গ্রন্থ ঃ

**উপন্যাস ঃ**

**সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ঃ**

লালসালু, কমরেড পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৪৮ ।

চাঁদের অমাবস্যা, নওরোজ কিতাবিস্থান, ঢাকা, ১৯৬৪ ।

কাঁদো নদী কাঁদো, নওরোজ কিতাবিস্থান, ঢাকা, ১৯৬৮ ।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, (সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত) বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩ ।

**আলাউদ্দিন আল আজাদ ঃ**

তেইশ নম্বর তৈলচিত্র, পঞ্চম প্রকাশ, মুক্তধারা, ১৩৯০, ঢাকা ।

কর্ণফুলী, দ্বিতীয় সংস্করণ, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৪ ।

ক্ষুধা ও আশা, দ্বিতীয় প্রকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৪ ।

আলাউদ্দিন আল আজাদ উপন্যাস সমগ্র, কর্ণফুলী, গতিধারা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০১ ।

**শওকত ওসমান ঃ**

জননী, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৮ ।

বনী আদম, আজাদ, ঈদ সংখ্যা, কোলকাতা, ১৯৫৩ ।

ক্রীতদাসের হাসি, মুক্তধারা, ঢাকা, সংশোধিত সংস্করণ, ১৯৮৩ ।

**ছোটগল্প ঃ**

**সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ঃ**

নয়নচারা, পূর্বাশা কলিকাতা, ১৯৪৫ ।

দুই তীর ও অন্যান্য গল্প, নওরোজ কিতাবিস্থান, ঢাকা, ১৯৪৫ ।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, (সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত) বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭ ।

**আলাউদ্দিন আল আজাদ ঃ**

জেগে আছি, ওয়াসী বুক সেন্টার, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৫৫ ।

ধানকন্যা, ক্যাপিটাল পাবলিশার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫১ ।

উজান তরঙ্গে, গতিধারা, ঢাকা, নব সংস্করণ, ২০০১ ।

**শওকত ওসমান ঃ**

জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প, নওরোজ কিতাবিস্থান, ঢাকা, ১৩৫৮ ।

সাবেক কাহিনী, ওয়াসী বুক সেন্টার, ঢাকা, ১৯৫৩ ।

প্রস্তর ফলক, এবি পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৬৪ ।

# সহায়ক গ্রন্থ ঃ

## ইংরেজী গ্রন্থ ঃ

A.M.A. Muhit, Bangladesh : The Imergency of a Nation, 1st Edition 1978, Page-74

Gunnar Myrdal, Asain Drama, Vol-I Random House, New York, Second, 1968.

Kamruddin Ahmed, A soicio Political History of Bengal and the Birth of Bangladesh, Inside Library, Dhaka, Fourth Edition-1975.

R.P.Dutta, India today, Peoples publishing house, Bombay, Second edition, 1949.

S.N. Sen, The City of Calcutta, Bookland private Ltd., Calcutta, First Edition,1960.

## বাংলা গ্রন্থ ঃ

অনীক মাহমুদ, ডক্টর, বাংলা কথা-সাহিত্যে শওকত ওসমান, ইউরেকা বুক এজেন্সী, রাজশাহী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৫ ।

অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় : কালের প্রতিমা : দে'জ পাবলিকেশন্স, কলিকাতা, ১৯৭৮ ।

আজহার ইসলাম, বাংলাদেশের ছোটগল্প ঃ বিষয় ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পরূপ, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৬ ।

আবদুর রহিম ও অন্যান্য সম্পাদিত, বাংলাদেশের ইতিহাস, ঢাকা-১৯৮৭ ।

আবদুল মান্নান সৈয়দ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, মুক্ত ধারা, ঢাকা ।

আমিনুর রহমান সুলতান, ডক্টর, বাংলাদেশের উপন্যাস ঃ নগর জীবন ও নাগরিক চেতনা, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ-২০০৩ ।

আলাউদ্দিন আল আজাদ, ডক্টর, সাহিত্যের আগন্তুক ঋতু , গতিধারা, বাংলাবাজার, ঢাকা,প্রথম প্রকাশ-২০০১ ।

এ.কে.নাজমুল করিম, দি ডাইনামিক অব বাংলাদেশ সোসাইটি, নতুন দিল্লী, প্রথম সংস্করণ ।

এস.এম. লুৎফর রহমান, ডক্টর, বাঙলাদেশী কথা-সাহিত্যের তিন আমল, ধারণী সাহিত্য সংসদ, ঢাকা,প্রথম প্রকাশ-২০০৫ ।

এস.এম. নারায়ণ, পূর্ববাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য (১৯৪৭-৭১) জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-১৯৮৬ ।

কবির উদ্দিন আহমদ, একুশের ইতিহাস, ২১ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩ সম্পাদক হাসান হাফিজুর রহমান, পুঁথিপত্র প্রকাশনী, ঢাকা ।

কামরুদ্দিন আহমদ, পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি, স্টুডেন্টস পাবলিকেশন্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-১৩৭৬ ।

গিয়াস শামীম, বাংলাদেশের আঞ্চলিক উপন্যাস, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ২০০২ ।

জীনাত ইমতিয়াজ আলী, ডক্টর, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ঃ জীবন ধর্ম ও সাহিত্য কর্ম, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা ।

ধীরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ, প্রথম খন্ড, ১৩৯১, কলিকাতা, আশা প্রকাশনী ।

নূর উল করিম খসরু, আধুনিকতা ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, ঐতিহ্য, প্রথম প্রকাশ, ২০০২ ।

ধীরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ, প্রথম খন্ড, ১৩৯১, কলিকাতা, আশা প্রকাশনী ।

ফরিদা সুলতানা, ডক্টর, বাংলাদেশের উপন্যাসে জীবন চেতনা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৯ ।

বদরুদ্দিন উমর, পূর্ব বাংলার ভাষা-আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, প্রথম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৭০ ।

বুলবন ওসমান, কথাসাহিত্যে শওকত ওসমান, সময় প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ২০০৪ ।

বিনয় ঘোষ, কলকাতার সমাজ, মেট্রোপলিটন মন, মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ, ওরিয়েন্ট লংসম্যান লিঃ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৯৭ ।

বিশ্বজিৎ ঘোষ, ডক্টর, বাংলা কথা সাহিত্য পাঠ, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ-২০০২ ।

ভূদেব চৌধুরী, ডক্টর, বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পও গল্পকার, কলিকাতা, ১৯৮৮ ।

মমতাজ উদ্দিন আহমদ সম্পাদিত, লালসালু এবং সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ মনন প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৫ ।

মনসুর মুসা, পূর্ব বাঙলার উপন্যাস, এ্যাডর্ন পাবলিকেশন্স, পরিবেশিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, ২০০৮ ।

মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল, আলাউদ্দিন আল আজাদ ও তাঁর উপন্যাস, সিকদার আবুল বাশার সম্পাদিত

মোহাম্মদ মুর্সালিম চৌধুরী, কৃতদাসের হাসি, প্রসঙ্গ বিচিত্রা, মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-১৯৬৬, পৃষ্ঠা-৭০ ।

মুহম্মদ রেজাউল হক, ডক্টর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা উপন্যাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-১৯৮৯ ।

মুহম্মদ ইদ্‌রিস আলী, ডক্টর, বাংলাদেশের উপন্যাসে মধ্যবিত্ত শ্রেণী, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৫ ।

মুস্তফা নূরউল ইসলাম (সম্পাদিত) বাঙালীর আত্ম পরিচয়ের সন্ধানে, ঢাকা, ১৯৯১ ।

মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম, বাংলাদেশের উপন্যাস-বাংলাদেশের কথা-সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮ ।

রজনী দাস দত্ত, আজিকার ভারত ('India To-day' গ্রন্থের পরিমল চট্টোপাধ্যায়কৃত অনুবাদ)

রণেশ দাস, উপন্যাসের শিল্পরূপ (১৯৫৯), পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ ১৯৭৩, ঢাকা ।

রফিকউল্লাহ খান, ডক্টর, বাংলাদেশের উপন্যাস ঃ বিষয় ও শিল্পরূপ, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ - ১৯৯৭ ।

শঙ্কর ঘোষ, স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ-১৯৭৫ ।

শান্তি রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ব পাকিস্তানের নতুন সাহিত্য, আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য, দীপায়ণ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-১৩৬১ ।

শাহীদা আখতার, ডক্টর, পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার উপন্যাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-১৯৯২ ।

শিবনারায়ণ রায়, নায়কের মৃত্যু, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬০, পৃষ্ঠা-৫৮ ।

শিরীণ আখতার, ডক্টর, বাংলাদেশের তিনজন ঔপন্যাসিক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ।

সরদার ফজলুল করিম, চলিশের দশকের ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৪ ।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গ-সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা,কলিকাতা,১৯৮৮ ।

সাঈদ-উর রহমান, ডক্টর, পূর্ব-বাংলার সমাজ ও রাজনীতি এবং কবিতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৩ ।

সানজিদা আখতার, ডক্টর, বাংলা ছোটগল্পে দেশবিভাগ, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ-২০০২ ।

সেলিম জাহান, অর্থনীতিক কড়চা সাহিত্য, ১৯৯৬, ঢাকা ।

সিকদার আবুল বাশার সম্পাদিত আলাউদ্দিন আল আজাদ জীবন ও সাহিত্য, বাতায়ন প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৩, পৃষ্ঠা- ৫১ ।

সুকুমার বিশ্বাস, বাংলাদেশে নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা,বাংলা একাডেমী,ঢাকা,প্রথম প্রকাশ-১৯৮৮ ।

সুপ্রকাশ রায়,ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, ডি.এন.বি.এ ব্রাদার্স কলিকাতা ।

সৈয়দ আকরম হোসেন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস ঃ প্রসঙ্গ ভয়, বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ,

সৈয়দ আকরম হোসেন, বাংলাদেশের উপন্যাস ঃ চেতনা প্রবাহ ও শিল্প জিজ্ঞাসা প্রসঙ্গ, বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-১৯৮৫ ।

বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫ ।

সৈয়দ আবুল মকসুদ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ ১৯৮১ ।

সৈয়দ সারোয়ার, আলাউদ্দিন আল আজাদ-এর জেগে থাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৬০ ।

সৌদা আকতার, ডক্টর, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র লালসালু ও অন্যান্য প্রবন্ধ, বাংলা একাডেমী ।

হাসান আজিজুল হক, কথা-সাহিত্যের কথকথা , সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৪৪, ঢাকা ।

হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, উদ্বাস্তু, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-১৯৭০ ।

## পত্র-পত্রিকা

ইসমাইল মোহাম্মদ, ক্রীতদাসের হাসি, সমকাল, ঢাকা, ২য় সংখ্যা আশ্বিন, ১৩৬৯, পৃষ্ঠা-১৯৪ ।

ওয়াসিক আল আজাদ, 'জননী' উপন্যাসে গ্রাম জীবন এবং শওকত ওসমানের সমাজবীক্ষা, শৈলী, জানুয়ারী, ১৯৯৮, ঢাকা ।

মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী, কৃতদাসের হাসি, প্রসঙ্গ বিচিত্রা, মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-১৯৬৬ ।

মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, আলাউদ্দিন আল আজাদ ও তাঁর উপন্যাস, জনকণ্ঠ সাময়িকী, ৫ মে, ২০০০ ।

মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী, কৃতদাসের হাসি, প্রসঙ্গ বিচিত্রা, মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-১৯৬৬ ।

রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশ আন্দোলনের সাংস্কৃতিক পর্যায়, ঢা.বি. পত্রিকা, ৪র্থ সংখ্যা, ১৯৭৬ ।

শওকত আলী ; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস : নিরন্তর : দ্বিতীয় সংখ্যা : শ্রাবণ, ১৩৯২ ।